নয়া শিক্ষা

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস, এম. এ.,
ডিপ. ইন. বেসিক এ্যাণ্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
॥ ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা ১২ ॥

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন : ১৩৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ : ১৩৬৩

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট
মোহন প্রেস
২ করিসচার্চ লেন
কলিকাতা ৯

বাঁধিয়েছেন
মডার্ন বাইণ্ডার্স

দাম : তিন টাকা বারো আনা

॥ সূচীপত্র ॥

॥ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ॥

শিক্ষাই সভ্যতার মাপ কাঠি। কোন্ দেশ অগ্রগতির পথে কতদূর এগিয়েছে, সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই তা টের পাওয়া যায়। শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিতের হার যেখানে বেশী—যতই সে-দেশের অতীত ঐতিহ্য থাক না কেন—সভ্যতার বিচারে সে দেশ পিছিয়ে আছে। ভারতবর্ষ আজো সে অপবাদ থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

তাই স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা-সংস্কারটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে; যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে সরকারীভাবে কাজ শুরু হয়েছে। প্রচলিত কেতাব সর্বস্ব পাশ্চাত্য শিক্ষার স্থানে এদেশের উপযোগী দেশীয় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলেছে। গান্ধীজী অবশ্য এ 'নয়া শিক্ষা'র পথ দেখিয়ে ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেবল জ্ঞান আহরণটাই শিক্ষার শেষ কথা নয়, জীবনকে কর্মক্ষম করে তোলা-ই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই তিনি এমন সর্বজনীন জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, যে শিক্ষা জীবনের প্রয়োজন মিটিয়ে আয়োজনকে পূর্ণ করে অর্থনৈতিক দিক থেকেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে। সেই শিল্প-মাধ্যমিক বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ শুরু হয়েছে। অবশ্য তার কিছুটা রদবদল হয়েছে বাঙলার মাটিতে।

সে যা হোক, শিক্ষা আজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। অথচ সেই শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষকরাও তেমন ওয়াকিবহাল নন; নয়া পদ্ধতি সম্বন্ধেও অনেকের মনে সুস্পষ্ট ধারণা নেই,—কাজেই এ শিক্ষার স্বপক্ষে কোন জনমত গড়ে উঠছে না। তাই আজ নয়া শিক্ষা প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই জন্যই এ পুস্তকে সবিস্তারিত ভাবে শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার গোড়া থেকে আরম্ভ করে

তার ক্রমবিকাশ, এমন কি বর্তমান পরিস্থিতি অবধি—শিক্ষার নানা তথ্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, শিক্ষার মনস্তত্ত্ব এবং বিবিধ বিষয় নিয়ে পুংখানুপুংখভাবে নানা তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। কাজেই আশা করা যায় যে, প্রগতিশীল শিক্ষক মাত্র-ই বইখানি পড়ে উপকৃত হবেন।

এই বইয়ের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলিই ইতোমধ্যে 'শিক্ষাব্রতী, 'শিক্ষক' 'শিক্ষা', 'দেশ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সমস্ত প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হলো। প্রবন্ধগুলি অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রন্থস্থ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে হয়তো পুনরুক্তি ঘটেছে, তথাপি কোথাও একঘেয়েমি আসেনি। তার কারণ পুনরুক্তিটা এসেছে নূতন আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ। ফলে সমগ্রভাবে একটা ধারাবাহিকতার-ই সৃষ্টি হয়েছে। বইখানি যদি শিক্ষাব্রতীদের এতটুকু উপকারে আসে, তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে জানবো। বইটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; কাজেই এর মধ্যে যদি কোন অসঙ্গতি বা ভুল ক্রটি থাকে, তার সংশোধনের ভার সহৃদয় পাঠকবর্গের উপর দিয়েই নিশ্চিন্ত রইলাম।

এই পুস্তক প্রকাশ ব্যাপারে প্রহ্লাদবাবু স্বেচ্ছায় যে দায়িত্ব নিয়েছেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমি চির ঋণী। এ ছাড়া আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন অধ্যক্ষ সুধাংশুকুমার সাহা, নানাভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক শ্রীমৃণালকান্তি চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীবলরাম সাহা, অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার বিশ্বাস এবং অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল, এঁদের প্রত্যেককেই জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিশ্বাস-নিকেতন
কৃষ্ণনগর

বিনয়াবনত
লেখক

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥

শিক্ষার কদর বাড়ছে। আগের চেয়ে এ দেশবাসী ঢের শিক্ষানুরাগী হয়েছে। সেটা প্রগতির লক্ষণ, শিক্ষা প্রসারের গুণ। উত্তর-স্বাধীনতার সুফলও বটে।

আজ শিক্ষার চাহিদা সর্বস্তরেই। জাতি শ্রেণী নির্বিশেষে। নিরক্ষর চাইছে সাক্ষর হতে। এটাই প্রত্যেকের অন্তরের দাবী, সকলের জন্মগত অধিকার।

কিন্তু এ অধিকার আপ্‌সে আসে না। আয়াস স্বীকার করে অর্জন করতে হয়। তার জন্য চায় অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং অনুধ্যান।

এটা কিন্তু শিক্ষাবিদদের অজানা নয়। মতবাদের মোড় ঘুরে কি করে শিক্ষার সহজ পথে পৌঁছনো যায়, তা নিয়ে কত-না পরীক্ষা নিরীক্ষা! সেই তত্ত্বের অনেক কথা আছে নয়া শিক্ষায়। অনুসন্ধানী পাঠক তার হদিস পাবেন। আর পাবেন মত থেকে পথে যাওয়ার নয়া রাস্তা।

শিক্ষার বই আর অপাঠ্য নয়। শিক্ষিত লোকে সাগ্রহে পড়ছে, মতবাদ নিয়ে নাড়া চাড়া হচ্ছে, তাতে নয়া শিক্ষার বনেদ সুদৃঢ় হবে। শিক্ষার আলোচনা যত হয়, ততই ভাল। সেই ভরসায় নয়া শিক্ষার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হল। এ সংস্করণে কিছুটা সংশোধন, সংস্কার এবং সংযোজনা করা হয়েছে। সংস্কার বা সংযোজনার প্রয়োজন হয়েছে প্রবন্ধ বিন্যাসের দিক থেকে। আর পূর্ব মুদ্রণের ভুলগুলি যতদূর সম্ভব সংশোধন করা হয়েছে। আশা করি বইটি এবার দোষ মুক্ত হবে।

এ পুস্তক প্রকাশনের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক মহাশয় আমাকে ঋণ জালে আবদ্ধ করেছেন। বইটি যদি শিক্ষার্থীদের কাজে লাগে, তা হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

ভুবরাজপুর
১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৩

বিনীত
লেখক

নয়া শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষার সংজ্ঞা

শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে অজস্র মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর মনীষীরা এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। কারণ, শিক্ষা স্রোতস্বতীর মত অশ্রান্ত ধারায় জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তার উৎস সন্ধান করা দুষ্কর। এইজন্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষার সত্য স্বরূপ জানবার আগ্রহও মানুষের মনে উদয় হয়নি। জীবনকেন্দ্রিক এই শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে স্পেনসার বলছেন যে, বাঁচার প্রস্তুতীকরণের প্রচেষ্টাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এই প্রস্তুতীকরণের মধ্যে যে কি দায়িত্ব নিহিত আছে সে কথাও তিনি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, for complete living we must know in what way to treat our body, in what way to treat our mind, in what way to manage our affairs, in what way to bring up a family, in what way to behave as a citizen, in what way to utilize those sources of happiness what nature supplies—how to use all our faculties to the greatest advantage of ourselves and others. সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা অবশ্য মানুষের চাহিদার দ্বারাও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। একথা গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস্ স্বীকার করে বলেছেন যে, পরিবর্তনশীল জগতে মানুষের মতবাদ যেমন বদলায়, তেমনি তার ধ্যানধারণার ঘটে যথেষ্ট পরিবর্তন।

প্রয়োজনবাদীরা এই কথাই একটু ঘুরিয়ে বলেছেন। সমস্ত কিছুর সৃষ্টির মূলে যে অন্তর্নিগূঢ় প্রয়োজন আছে, একথা তাঁরা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছেন। শিক্ষাব্যাপারের মধ্যেও তাঁরা এই কার্য-কারণ নীতিকে টেনে এনেছেন। এখানে ক্ষণ-বাদীদের সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট মিল আছে। বর্তমানকে বাদ দিয়ে

তাঁরা যেমন ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করতে চান না, প্রয়োজনবাদীরাও তেমনি প্রয়োজনের গণ্ডীর বাইরে পা বাড়াতে নারাজ। প্রয়োজনবাদীরা কিন্তু বর্তমানের দোহাই দিয়েই ক্ষান্ত হননি; তাঁরা বিশ্বকল্যাণের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই দার্শনিক মিলের প্রয়োজনবাদের মধ্যে আমরা এই আপামর জনসাধারণের মঙ্গলের অমোঘবাণী শুনতে পাই: "Greatest good of the greatest number." বর্তমান যুগের প্রগতিবাদীদের মুখে শিক্ষা সম্বন্ধেও এমনতর কথা শোনা যাচ্ছে। বর্তমান জীবনের শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়ে তাই ডিউয়ি বলেছেন যে, "Education is no longer for life in the future, but through life in the present." স্পেনসারের সেই complete living-এর উপর তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার রঙ চড়িয়ে নূতন জ্ঞানের কথা ব্যক্ত করেছেন। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা একান্ত স্বাভাবিক উপায়ে আমাদের কাছে আসবে, সেই হবে ইহ-পরকালের পাথেয়। ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তিত হবার কোন হেতু নেই, কারণ বর্তমানের পরিবেশের সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তার কোন ভাবনা নেই। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে শুধু ফলাকাঙ্ক্ষার সাধনায় সত্যকার শিক্ষালাভ করা যায় না, কারণ মন যেখানে ফলের আশায় লোভাতুর, সেখানে কর্তব্যের প্রতি অবহেলা আসে। এই প্রসঙ্গে ডিউয়ির অভিমতটিকে একটু বিশ্লেষণ করলে দুটি মতবাদকে আবিষ্কার করা যায়। একটি হচ্ছে অধুনাতন বাস্তববাদ, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আশাবাদীর প্রাচীন অভিমত। এই দুটি মতবাদ নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্বেও অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষ এমন একটা ready-made জ্ঞান লাভ করে, যা ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, সেই জ্ঞানের "সিসেমি" মন্ত্রে সে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সমস্ত গুপ্ত দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। কিন্তু বর্তমানের শিক্ষা-পরিগঠিত যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে সে অভিমত বাতিল হয়ে

গিয়েছে। জীবনসংগ্রামের জটিল সমস্যার মধ্যে মানুষ বার বার তার বুদ্ধি বিচারের শক্তি দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করেছে যে, ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে বর্তমানকে হেলায় নষ্ট করার মত মূর্খামি আর নাই। সময়ের সদ্ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, একবার কোন রকমে সরস্বতীর কৃপায় উচ্চশিক্ষার দরবারে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পেলেই যে শিক্ষা সমাধা হল, একথা নিতান্ত ভুল। কারণ, শিক্ষার শেষ নেই : গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলে গিয়েছেন যে, যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি; আজীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে তিল তিল করে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা যে জ্ঞানলাভ করছি, সেই হচ্ছে আসল কার্যকরী শিক্ষা।

দ্বিতীয় মতটি গ্রহণযোগ্য। কারণ, হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করার মধ্যে জীবনকে ভাল করে উপলব্ধি করার সুযোগ মেলে। তাছাড়া জীবনের প্রতিদিনের চাহিদার সমুদ্র-মন্থনে যে অভিজ্ঞতার সুধাভাণ্ড আমরা লাভ করি, তা শিক্ষার অক্ষয় সম্পদ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বয়ে চলেছে জানার দুর্নিবার কৌতূহল। রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে বহির্জগৎ প্রতিনিয়ত আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করছে; আমাদের সৌন্দর্যপিপাসাকে দুর্নিবার করে তুলছে, মন যখন বিশ্বপ্রকৃতির সেই বিচিত্রের আনন্দে অবগাহন করে নিত্য নূতন অনুভূতি লাভ করছে—তখনই শুরু হচ্ছে তার যথার্থ শিক্ষা।

দার্শনিক শিক্ষকেরা কিন্তু আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন যে, সমস্ত সৃষ্টির মূলীভূত কারণই হ'চ্ছে আনন্দ। বন্ধনের মধ্যে আনন্দ সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমস্ত আনন্দ সুখেরই কারণ। উপনিষদেও একথা আছে যে, 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্'। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মানুষের চাহিদা যেখানে তার আটপৌরে ভাষার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে, সেখানে আনন্দের ঐশ্বর্য দীনতার মধ্যে ঢাকা। সেইজন্য শিশুর চাহিদা যেখানে আনন্দের সৈকতে অসীমের পটভূমিকায় লীন হয়ে গিয়েছে, সেইখানেই নব-নব উন্মেষশালিনী শিশুবুদ্ধি অমূল্য সম্পদ লাভ করেছে।

অনেকে বলেছেন যে, অন্তরের ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল আহরণ করেছে। মানুষের চাহিদাই নানাভাবে মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই ছুটাছুটি কর্মব্যস্ততার মূলে আছে সেই আনন্দলাভের স্পৃহা যা মানুষকে বৃহত্তর কর্মপ্রেরণা যোগাচ্ছে যুগে যুগে। এই আনন্দের প্রস্রবণ অবরুদ্ধ হয়ে গেলে যে কি প্রাণের অপচয় ঘটে, মনস্তাত্বিকরা তা বলতে পারেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে "Not all happy experiences are constructively educative and not all activities result in immediate happiness." অর্থাৎ আনন্দ অভিজ্ঞতার মাত্রাভেদ আছে। সমস্ত কিছু আনন্দ-প্রসূত অভিজ্ঞতাতেই যে শিক্ষণীয় বিষয় থাকবে এমন নয়। শিক্ষার মধ্যে যে আনন্দ আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। আবার একথাও সত্য যে, যে কোন কাজ থেকে আপাতঃমধুর ফল লাভ করা অসম্ভব। এখানেই নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের কথা ওঠে। শিক্ষা এবং আনন্দকে লাভ করতে হলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে শুধু কর্মকেন্দ্রিক করে তুললে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করবার মত আনন্দমুখর প্রাণশক্তিকেও জাগ্রত করে তুলতে হবে। শিক্ষা-প্রণালীকে এমন সজীব করে না তুলতে পারলে তার উদ্দেশ্য যে পূর্ণ হবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইজন্য চাই সেই অটুট ধৈর্য আর নিষ্ঠা, যা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি প্রতিটি মুহূর্ত মানুষকে চালিত করবে জ্ঞানের পথে, কল্যাণের পথে। শুধু তাই নয়, জীবনকে এমন দৃঢ় ও ঋজু করে তুলবে যে, It means living in such a way as to striving to fulfil our present wants ; এমন কি ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তিকেও জাগ্রত করে তুলতে হবে, নইলে সমাজচেতনা উদ্‌বুদ্ধ হবে না। শিক্ষাকে এমন ব্যাপক করে প্রাণবন্ত করে না তুলতে পারলে কোন ফলই হবে না। এই বৃহত্তর জীবনের মুসাফিরকে প্রতিদিনের পথ দেখে চলতে হবে সাবধানে। যাত্রাপথের চারিদিকে যে প্রলোভন আছে, তার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আনন্দবর্তিকার আলোকে ভাল করে পথ

চিনে চলতে হবে। এই আনন্দের মত শিশুর প্রিয় সাথী আর কেউ নেই। শিশুকে শিক্ষা দেবার সময় সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, নানা কাজের দেউড়ি পার করে শিশুকে আনন্দের রসলোকে না নিয়ে যেতে পারলে শিশু-শিক্ষায় অসম্পূর্ণতা দোষ থেকে যাবে। জীবনের প্রস্তুতীকরণের অন্য নামই শিক্ষা।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আত্মমর্যাদা বাড়িয়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সুবিধা যেন ছাত্র নির্বিশেষে সকলেই সমভাবে লাভ করে, সেদিকে শিক্ষকের দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার এটাও একটা কর্তব্য। কারণ, The main task of education is to put the education into a position to develop values for himself. এই প্রসঙ্গে শিক্ষা-দর্শনের মর্মবাণীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: "Philosophy of education is not an external application of ready-made ideas to system of practice having a radically different origin and purpose; it is only an explicit formulation of the problems of the formation of right mental and moral habitudes in respect to the difficulties of contemporary social life." শিশু-শিক্ষা কেবল কতকগুলো ছাঁচে ঢালা কথার কথা নয়, এর একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও আছে। বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে যে বিচিত্র জটিল সমস্যা দেখা দেয়, সমাজজীবনের সঙ্গে ভালভাবে মানিয়ে চলার শক্তি, এই সমস্ত প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে যুদ্ধ করবার যে আত্মিক শক্তি শিশুর মধ্যে আছে, তাকে জাগিয়ে তোলার নামই শিক্ষা।

এখানে পরিবেশের কথা ওঠে। পরিবেশের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে যেমন নিত্য নূতন সমস্যা দেখা দেবে, শিশুকেও তেমনি তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলতে হবে। একে একে নির্ভয়ে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে শিশুকে, তবেই তার বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার সাহস, ও কর্মতৎপরতার শক্তি বিকশিত হবে। সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগে, তার পূরণ করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। এখানেই Idealism ও Pragmatism-এর কথা এসে পড়ে।

"Education through persent life." একথার সপক্ষে ওকালতি করার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। কারণ, কার্যকালে সঠিক-ভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করার শক্তি দেয় শিক্ষা।' চলিষ্ণু কালের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে এগিয়ে চলে শিক্ষার গতি। সেইজন্য সত্যকার জ্ঞান বা শিক্ষা বলতে কি বুঝি, সেই কথার উত্তরে রশ বলছেন: Fine knowledge is not the acquiring of a dead culture—it is rather the power to do the right thing in a given situation. এইজন্য অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌রা শিশু-শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কাজের মধ্যে দিয়ে ক্রমবর্ধমান শিশুমন যদি বেড়ে উঠতে থাকে, তবে সে তার বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দিয়ে সহজেই আপন সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবে। কারণ, শিশুর জীবনে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হবার অনেক আগেই, নানা সমস্যা এসে দেখা দেয়, নানা বিষয়ে তার মন কৌতূহলী ও মুখর হয়ে উঠে। সুতরাং কাজের মধ্যে দিয়ে এইগুলিকে জানার সঙ্গে সে তার সমাধানও করতে শিখবে, এটাই বাঞ্ছনীয়।

এইজন্য বর্তমান যুগের শিক্ষাবিশারদরা অনুবন্ধ-প্রণালীর সাহায্যে শিশুকে শিক্ষা দিতে চান। তাঁরা আরও বলেছেন যে, ঘটনাচক্রে শিশু যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা শিশুর জানার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু এইটুকু দেখতে হবে যে, আনন্দ-পরিবেশের মধ্যে শিশু নিজেকে আবিষ্কার করতে পারছে কিনা। এইজন্য অনেকে প্রকল্প (Project) প্রণালী দ্বারা শিশুকে শিক্ষিত করতে চান। কাজ করার মধ্যে শিশু শুধু আত্ম-প্রকাশের আনন্দে বিভোর হয় না, অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপিত হয়। এখানে শিশু-শিক্ষার নূতন অনুভূতির জগৎ গড়ে উঠে। শিশু-শিক্ষার পক্ষে সে আবহাওয়া একান্ত অনুকূল। সে কথা রশও স্বীকার করে বলেছেন যে, A judicious mixture of regular drilling with incidental learning is probably the best.

শিক্ষার অনন্তস্রোতে প্রতিনিয়ত জীবনের রূপ বদলাচ্ছে। প্রবাহের জলধারায় মানবাত্মা অবগাহন করে শুধু বিদগ্ধ হয়ে উঠছে না, পরোক্ষভাবে

ভবিষ্যৎ জীবনের মাল-মশলা সংগ্রহ করছে। নদীর একই স্রোতে যেমন দুবার স্নান করা যায় না, তেমনি প্রতি-মুহূর্তে প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের দ্বারে যে সুযোগ সুবিধা এসে উপস্থিত হচ্ছে, তাকে অবহেলায় ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়, তাতে জীবনের সম্যক বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্য চলতি প্রবাদ আছে যে হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলা উচিত নয়। আজ একথা সকলেই বিশ্বাস করেন। ভারতীয় দর্শনও এই মতবাদে বিশ্বাসী। জীবন যে অখণ্ড কর্মপ্রবাহের উৎস, সে কথা তাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন বলেই সমগ্র জীবনকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছিলেন। এর প্রত্যেক স্তরের আচার-অনুষ্ঠান ও কর্মপদ্ধতিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ছিল একটানা শিক্ষার বিধিব্যবস্থা। জীবনকে জানবার, উপলব্ধি করবার এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ বোধ করি আর অন্য কোন দেশের শাস্ত্রে আছে কিনা সন্দেহ।

বিশ্ববিশ্রুত জ্ঞানী নিউটন মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করেছিলেন যে, জীবনে শিক্ষার শেষ নেই। জ্ঞান সমুদ্রের মত সুদূরপ্রসারী। মানুষের মত সামান্য পরিব্রাজকের পক্ষে তা অতিক্রম করা অসম্ভব। তাই তিনি বলেছিলেন যে, জ্ঞান-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি কেবল উপলখণ্ড সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ জ্ঞানের পরিধি অনন্ত, এক জীবনের সাধনার দ্বারা তাকে আয়ত্ত করা যায় না।

উপসংহারে এই কথা বলা চলে যে, ডিউয়ির মতবাদই প্রণিধানযোগ্য। কারণ, এ রীতি কোন ক্রমে ব্যক্তির বিকাশের পরিপন্থী নয়—বরং সমাজের সঙ্গে পরম ঐক্যবন্ধনে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রচেষ্টাকে তিনি সংযুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। এখানে আশাবাদীর স্বপ্ন পরিকল্পনার মধ্যে অকারণ ব্যর্থতার নির্মম আঘাত জাগ্রত হয়ে ওঠেনি, এখানে বর্তমানের ক্রিয়াকলাপের অমোঘ পাথেয় সঞ্চিত হয়ে উঠেছে ভবিষ্যৎ জীবনের যাত্রাপথের জন্য। পেন্‌সন-ভোগী কর্মচারীর মত এখানে মানুষের কোন উদ্যম ভবিষ্যতের নিশ্চেষ্ট সুখভোগের মুখ চেয়ে বসে নেই; বরং এখানে আজীবনের অফুরন্ত কর্মোদ্দীপনার মধ্যে জীবনকে সংগঠিত করবার যে বিপুল উৎসাহ ও প্রেরণা আছে—তার দ্বারা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যে আপনিই গড়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য

কেবল অনুশীলন অর্থে শিক্ষা বুঝায় না, আরো গভীর ও নিগূঢ় অর্থে শিক্ষা শব্দের প্রয়োগ। শিক্ষা বলতে কি বুঝায়? পরিপূর্ণ জীবনের সার্থক সম্যক উন্মেষ। অর্থাৎ শিক্ষা আমাদের দেহে, মনে এবং চরিত্রের মধ্যে আনে একটা সুসমঞ্জস স্বাভাবিক পরিণতি। সে বিকাশ শুধু সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না, জাগরণোদ্দীপ্ত জীবনে আনে আলোড়ন, প্রকাশের চরম উৎকর্ষ। এই স্বাভাবিক পরিণতি জ্ঞানের সুফল, জানার আশীর্বাদ, শিক্ষার যথাসর্বস্ব। এই শিক্ষার আদর্শ এমন সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক যে, জীবন-বেদের ভাষ্যও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে; কারণ জীবনের জন্যই শিক্ষা, শিক্ষার জন্য জীবন নয়।

তাই শিক্ষার আদর্শ বলতে কি বুঝায়, এক কথায় তা বলা কঠিন। পৃথিবীর এমন কোন স্থান নেই যেখানে বাতাস নেই, অথচ বাতাসের উপাদান কি, জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই তার সদুত্তর দিতে পারবে না। তেমনি শিক্ষার সঙ্গে আমাদের আজীবনের সম্পর্ক হলেও শিক্ষার আদর্শ কি, প্রশ্ন করলে চিন্তা করতে হয়; এক কথায় এর উপযুক্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তাছাড়া, এ নিয়ে অজস্র মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

তবে অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণ বিকাশসাধন করা। তবে এ বিকাশ-সাধন ব্যাপারটা মনুষ্য-জীবনের একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা, শিক্ষাবিদ্‌রা কেবল সেই চিত্তবৃত্তিকে জাগ্রত করে তোলেন, এই মাত্র। তাই অনেকে বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে শক্তি বা সামর্থ্য লুক্কায়িত আছে, তার সার্থক স্ফুরণ করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

প্রথমে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। অনেকে বলেন, শিক্ষা শুধু পথের নির্দেশ দেয় না, পথের অন্ধকারও দূর করে। সে কেবল নির্ভুল কার্যসূচী মানুষের সম্মুখে তুলে ধরে না, সত্যনিষ্ঠ সাধনার আনন্দ উপভোগ

করবার শক্তিকেও জাগ্রত করে। অথবা কেবল পরিশ্রম্ করে না, শ্রমকে ভালবাসতে শেখায়; কেবল শিক্ষা দেয় না, জ্ঞানের পিপাসাকে করে দুর্নিবার। এইজন্য রাশ্‌কিন বলেছেন যে, সেই হবে সত্যকার শিক্ষা, যা শুধু মানুষের মনের অন্ধ মোহ অপসারিত করবে না, মনে-প্রাণে আলোর ধ্যান করতে শেখাবে।

এ ছাড়া, শিক্ষার দৃষ্টি থাকবে মানসিক, নৈতিক এবং দৈহিক স্ফুরণের দিকে। দেহের সঙ্গে মনের যোগ এতই নিবিড় যে, একের অভাবে অন্যটি সম্পূর্ণ অচল। সেইজন্য প্লেটো বলেছিলেন যে, গান যোগাবে মনের খোরাক, আর ব্যায়াম দেহের। এই দ্বিবিধ সাধনার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগ না থাকলে শিক্ষার কোন অর্থ হয় না। জ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে এক জায়গায় একটু পার্থক্য আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষের আয়ত্ত করার শক্তির উপর জ্ঞানের তারতম্য নির্ভর করে; কিন্তু শিক্ষা এমনি জিনিস যে, মানুষের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির অস্থিমজ্জায় তার উপাদান বিজড়িত হয়ে যায়। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সত্যকার সংস্কৃতিকে জাগ্রত করে তোলা। থ্যারিং বলেছেন যে, শিক্ষাকে কেবল জ্ঞানমুখী করলে চলবে না, শিক্ষাকে নিয়ে যেতে হবে অনুশীলনের সাগর-সঙ্গমে। কারণ, নিছক জ্ঞানার্জন হচ্ছে শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুশীলন। এই হবে সত্যকার শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ, দু-ই।

অনেকে আবার বলেন যে, ব্যক্তি-চরিত্রের উন্মেষ-সাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ব্যক্তিগত যোগ্যতা, চাহিদা, প্রয়োজন এবং অনুরাগের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে—যাতে কারও চারিত্রিক বিকাশ ক্ষুণ্ণ না হয়। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষাবিদ্‌রা আরও মনে করেন যে, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই যদি শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তবে সমাজের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কারণ, শিক্ষা ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে অভিযোজন করে দেয়। তাই শিক্ষার নিগূঢ় উদ্দেশ্য এই যে, নৈসর্গিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে জীবনকে সংযুক্ত করে দেওয়া।

বাস্তববাদী শিক্ষাবিদেরা বলেন যে, শিক্ষা জীবন-কেন্দ্রিক। যে জীবনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার আরম্ভ ও শেষ, সেই জীবনের জন্য প্রস্তুতিই হবে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। কেবল ব্যক্তিগত দাবী মেটাতে গেলে শিক্ষার আদর্শচ্যুতি ঘটার আশঙ্কা আছে। শিক্ষার আলো যে গণ-মানসকে আলোকিত করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই আলোকদানের ক্ষমতাও আমাদের অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ গড়ে তুলবে তা নয়, শিক্ষা বাঁচার মতো করে বাঁচতে শেখাবে এবং অপরকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। শিক্ষা যদি বাঁচতে না শেখাল, নূতন সম্ভাবনায় প্রাণকে সঞ্জীবিত করে না তুলল, তবে সে শিক্ষার মূল্য কি? কেতাবের পিরামিডে যে ঐতিহ্যের, জ্ঞানের মমি রইল, তারা প্রাণবন্ত হয়ে বর্তমানকে উদ্‌বুদ্ধ করল কই? দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে যে জ্ঞান রইল নিজের মধ্যে মরে, জীবনের জয়গানে তার সাড়া পৌঁছল কই?

আশাবাদীরা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন শিক্ষার সম্ভাবনার কথা। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর স্বপ্ন তাঁরা দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, ভবিষ্যতের ন্যায়ের উপর, সত্যের উপর, অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে যে সমাজ, সেই সমাজের উপযুক্ত সুস্থ, সবল ও দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলার ভার নেবে শিক্ষা। তাই সেই সমাজের স্বপ্নকে রূপায়িত করবার জন্য এখন থেকেই শিক্ষাপ্রচারের নূতন প্রচেষ্টা শুরু হবে। এক কথায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য দাঁড়ায় এই যে, শিক্ষা ব্যষ্টি, সমষ্টি ও সমাজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে ভবিষ্যতের উপযোগী করে গড়ে তুলবে প্রতিটি মানুষকে—যাতে জীবনসমস্যায় মানুষ কিছুতেই নাজেহাল না হয়।

এখন আদর্শের কথায় আসা যাক। শিক্ষার আদর্শে কোন অনতিক্রমণীয় গণ্ডি টেনে দেওয়া নেই। পরন্তু দেশকালভেদে সমাজের রূপ যেমন বদলায়, শিক্ষার আদর্শও তেমনি যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। তবে একথা সত্য যে, শিক্ষার চিরন্তন আদর্শ সম্বন্ধে কোথাও মতভেদ নেই। অর্থাৎ শিক্ষার

প্রাথমিক উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এর আদর্শ হবে সমাজের অনুবর্তী। প্রাণের দাবীকে, জীবনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে শিক্ষার আদর্শ গড়ে উঠতে পারে না। তাই শিক্ষার আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সেজন্য শিক্ষার আদর্শ কি হবে প্রশ্ন করলেই, জানতে হয় কিরকম সমাজ আমরা গড়তে চাই? অর্থাৎ সমাজের অবস্থা থেকে শিক্ষার আদর্শ উদ্ভূত হবে। এইজন্য যুগে যুগে দেশে দেশে শিক্ষার আদর্শের রূপান্তর ঘটেছে। তাই ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদর্শের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ব্যক্তিপ্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদর্শ হয়ে উঠেছে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত সুখসুবিধা নিয়ে ওঁরা বেশী মাথা ঘামিয়েছেন, সমাজ বা সমষ্টির মঙ্গলের দিকে তেমন নজর দেননি। আত্মশ্রীবৃদ্ধি কাম্য, কিন্তু অন্যকে বঞ্চিত করে আত্মতৃপ্তির উপকরণ সংগ্রহ করা ঠিক নয়। পাশ্চাত্ত্য আদর্শ যে 'অহং'কে সকলের এর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, ভারতীয় আদর্শ সেই 'অহং'কে সকলের দেউলে সেবাইত নিযুক্ত করেছে। ফলে ব্যষ্টি পেয়েছে সমষ্টিকে জানার, সেবা করার সুযোগ। তাই ভারতীয় শিক্ষায় পাশ্চাত্ত্যের অহমিকা নেই, আছে নিরভিমান জ্ঞানপূজারীর সেবার অধিকার। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাভিমান কিন্তু নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারেনি, প্রতিষ্ঠার জন্য, খ্যাতির জন্য চেয়েছে প্রচার, জীবনের সমস্ত কাজকর্মে জাহির করতে চেয়েছে নিজেকে, ভারতীয় সাধনায় কিন্তু 'বাহির দুয়ারে লেগেছে কবাট, ভিতর দুয়ার খোলা।' তাই অহংকারকে বিসর্জন দিয়ে প্রাচ্যের সাধকরা অজ্ঞাত অখ্যাত ভিখারীর মত জীবন যাপন করেছেন। সেইজন্যই পাশ্চাত্ত্য ধর্মযাজকেরা যখন ধর্মের নামে স্বার্থসিদ্ধির অভিযান চালিয়েছেন, তখন ভারতের সাধকরা সাধনার বোধিদ্রুম-তলে ধ্যানমগ্ন! তাই ভারতীয় সাধনায় আত্মপ্রচারের উৎকট হানাহানি নেই, আছে শান্ত সমাহিত স্থৈর্য। অন্য দিকে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ হানাহানি কাটাকাটি থেকে মুক্তি পায়নি; ব্যক্তির উন্মেষ সাধনে তাই তারা সমষ্টিকে নিপীড়ন করেছে।

ভারতবর্ষ কিন্তু এমন এক সমাজ গঠনের প্রয়াস পেয়েছে, যেখানে সমষ্টি বড় হয়ে উঠেছে, ব্যক্তি গিয়েছে ডুবে। অর্থাৎ ভারত শিখিয়েছে সহনশীলতা, সমাজের কল্যাণে সকলের জন্য ত্যাগ স্বীকার এবং সেবা। তাই ভারতীয় শিক্ষা অভিমানশূন্য, অহংকারশূন্য, জ্ঞানের তপস্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই হচ্ছে ভারতীয় শিক্ষাদর্শের বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া গেল। এখন বর্তমান শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি, অর্থাৎ অধুনাতন ভারতীয় সমাজের পট-ভূমিকায় শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার অভ্যুদয় হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে; এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ছাঁচে ভারতের সনাতন শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে ঢালাই করা হয়েছিল। কিন্তু সে শিক্ষা-ব্যবস্থার পিছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, সেদিকেই তদানীন্তন সরকারের সজাগ দৃষ্টি ছিল; ফলে শিক্ষার আদর্শ যে খুন্ন হয়েছে, আজ তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, ইংরেজরা চেয়েছিল তাদের কাজের সুবিধার জন্য কতগুলি বেতনভুক্ কেরাণী তৈরী করতে। প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া তাদের আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে চলতি শিক্ষা-ব্যবস্থা জীবনপ্রস্তুতির দিকে মোটেই দৃষ্টি দেয়নি। এ হচ্ছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মস্ত বড় অসম্পূর্ণতা, দুরপনেয় কলঙ্ক।

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সে অসুবিধা অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। এখন সুযোগ এসেছে মনোবিজ্ঞানসম্মত উন্নত ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হবে এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা যা জাতিধর্মনির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের অজ্ঞতা, মূর্খতা, নিরক্ষরতা দূর করবে এবং তাদের করে তুলবে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত নাগরিক। কাজেই ভারতীয় আদর্শ, তার ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতি, এক কথায় তার অন্তর্নিগূঢ় প্রাণ-

ধর্মকে জানতে হবে সকলের আগে, নইলে যে শিক্ষাব্যবস্থার-ই প্রচলন হোক না কেন, ভারতের নিজস্বতায় তা কোনদিনই ঝলমল করে উঠবে না। টবের গাছের মত বিদেশী শিক্ষা ঘর-সাজানোর বস্তু হয়ে রইবে, ভারতের মাটির নীচে তার শিকড় কোনদিন পৌঁছবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয় স্বকীয়তার ছোঁয়াচ লাগেনি। এখানে ওখানে সামান্য যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে শিক্ষা-ইমারতের উপর সামান্য চূণকাম করা হয়েছে, এই মাত্র। এখনো প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে সেই বইয়ের পাহাড়, আর পরীক্ষার দুস্তর সমুদ্র ! সেখানে জ্ঞানার্জনের উপর মোটেই জোর দেওয়া হয়নি, জোর দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা-পাশের উপর। ফলে, অনুশীলনের দিকটা বাদ পড়েছে। এজন্য শিক্ষকদের ঠিক দায়ী করা চলে না, এ দোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের। বোঝার মত এমন পাঠ্যতালিকা ওঁরা নির্বাচন করেছেন, যার সঙ্গে উত্তর জীবনের কাজকর্মের মোটেই যোগ নেই। এইখানেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে শোচনীয়ভাবে। বিদেশে ছেলেদের কিন্তু শিক্ষা দেওয়া হয় হাতে-কলমে কাজ করতে, যার ফলে উত্তর জীবনে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, জীবিকা অর্জনের জন্য তাকে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় না। শুধু কি তাই ? যার যেদিকে প্রতিভা, সেই পথে তাকে শুধু পরিচালিত করা হয় না, সাধ্যানুযায়ী সমস্ত সুবিধাই তাকে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, সহজাত স্বাভাবিক শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে একেবারেই নেই। সে ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায় আমেরিকা প্রভৃতি দেশে। আমাদের দেশে এখনও ছোট ছেলেদের কাছে শিক্ষা ব্যাপারটা মোটেই লোভনীয় নয়, বরং বিভীষিকা নামতা এবং ধারাপাতের। কিন্তু শিশু-শিক্ষা হওয়া উচিত শিশুর উপযোগী ও একান্ত স্বাভাবিক। অর্থাৎ শিক্ষা শিশুর কাছে আহার নিদ্রার মত একান্ত অপরিহার্য হয়ে আসবে। উড়তে শেখার জন্যে পাখীর যেমন আয়াস স্বীকার করতে হয় না, সাঁতার কাটতে শেখা মাছের কাছে যেমন স্বাভাবিক, শিক্ষার জন্যে শিশুকেও তেমনি মাথা ঘামাতে

হবে না। এই কথাই একজন উল্লেখ করে বলেছেন যে, শিক্ষা-ব্যাপারটা তখনই ফলপ্রদ হবে, যখন একে আরম্ভ করবার জন্যে শিশু সচেষ্ট হবে না।

তাই স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলনের উপযোগিতার কথা উপলব্ধি করেছেন। আজ হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। মামুলী শিক্ষায় ভারতবর্ষ কোনদিনই উপকৃত হবে না। আজ যে আশঙ্কার অন্ধকারে ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রাম সমাচ্ছন্ন, অশিক্ষা কুশিক্ষায় তার আশাহীন ভাষাহীন প্রাণ আর্তনাদ করছে, সেই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা ফুটিয়ে তোলাই বর্তমান শিক্ষার প্রথম কর্তব্য। এই নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হলে বয়স্ক ও শিশু-শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। নিরন্ন দরিদ্র দেশে ব্যয়বহুল কোন বিরাট পরিকল্পনার খসড়া রচনা ক'রে কোন লাভ নেই, তবে প্রাথমিক প্রয়োজন—অন্ন বস্ত্র আবাস—সংস্থানের উপযোগী কার্যকরী শিক্ষার প্রচলন করাই হবে শিক্ষাবিদ্‌দের মুখ্য কর্তব্য।

তাই বর্তমানের সামাজিক পটভূমিকায় মামুলী শিক্ষার পরিবর্তে, আত্ম-নির্ভরশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার দিকে জোর দিতে হবে। ব্যক্তিগত চাহিদা, প্রয়োজন এবং সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষাকে এমন ক'রে সর্বসাধারণ্যে পরিবেশন করতে হবে, যাতে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ আবাল-বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এইজন্য গ্রামসর্বস্ব ভারতবর্ষে গ্রামে গ্রামে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাকে শহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের একচেটিয়া ক'রে রাখলে চলবে না, গ্রামের সকলের গ্রহণ-যোগ্য ক'রে তুলতে হবে। সেখানে পরস্পরের সহযোগিতায় হাতে-কলমে কাজ ক'রে ছেলেরা যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জন করবে, তা তার উত্তর জীবনে জীবিকা অর্জনের শ্রেষ্ঠ পাথেয় হবে। তাই আজ অনেকে মনে করেছেন যে, এমন শিক্ষার প্রয়োজন যা মানুষকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা ক'রে বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে পারবে। এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে হলে শুধু

গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খুললে চলবে না, তাকে গ্রামোপযোগী স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে।

সুতরাং এমন একটা শিক্ষার প্রয়োজন, যা গ্রাম-কেন্দ্রিক এই ভারতের ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা না ক'রে, তার বাস্তব প্রয়োজনকে মেটাতে সহায়তা করবে এবং ব্যক্তির দেহ ও মনের বিকাশ সাধনে সমর্থ হবে—এই হবে শিক্ষার মারফতে জাতীয় মনের বিকাশ।

"ভারতের জাতীয়তার আর একটা মূল সুর আছে। পাশ্চাত্ত্যের কাছে অহংটাই বড়। নিজেকে ছাড়া তারা চিন্তাই করতে পারে না, তাই তাদের দেওয়া শিক্ষাব্যবস্থায় আছে নিজেকে কেন্দ্র ক'রে স্বার্থের সাথে জড়িয়ে পড়া। ভারতের সুর কিন্তু উল্টো। ভোগকে ত্যাগের দ্বারা ভুঞ্জন করাই তাদের প্রথম দর্শন। সত্য ন্যায় ও অহিংসাকে সাক্ষ্য রেখে তাদের চলার পথ। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক তাই শিক্ষিত হয়েও পায় না মনের সাড়া। ভারতের শিক্ষাকে রূপ দিতে হলে তার ঐ প্রথমাদর্শকে উপেক্ষা করা চলবে না। শেষ কথা এই যে, যে ধর্ম ভারতের প্রাণের জিনিস—জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত—শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তাকে নির্বাসিত করলে চলবে না।"*

শেষ কথা এই যে, ভারতীয় শিক্ষাধারায় নূতন প্রাণের সঞ্চার করতে হলে যে প্রচেষ্টা, যে শ্রম, যে পরিকল্পনা, যে অর্থের প্রয়োজন, তার যোগাযোগ বর্তমানে সম্ভব না হলেও, এই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ভারতীয় ঐতিহ্য-অনুসারী এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিক, দৈহিক, মানসিক—এক কথায় মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে পারে যে শিক্ষা, সেই কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার আজ আশু প্রয়োজন।

*রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষার দর্শন

প্রত্যেক আদর্শের পেছনে আছে একটা দর্শন। মতবাদ বা দর্শনকে বাদ দিয়ে কোন আদর্শই টিকতে পারেনা। এইজন্য জীবনের যা কিছু সত্য তত্ত্ব, জ্ঞান ও চিন্তাধারা যখন মহান আদর্শে উন্নীত হয়, তখনই তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় দার্শনিক সত্যের উপর। এই প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে অবশ্য একটা সদানিরপেক্ষ ঔচিত্যবোধ জড়িয়ে আছে। সত্যোপলব্ধি আদর্শ থেকে আদর্শান্তরে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুকে টেনে নিয়ে যায়, যা সত্য ও তত্ত্বের 'কি আছে' বা 'কি হবে'-কেও ইহ বাহ্য জ্ঞান করে, অথচ কি হওয়া উচিত তার নির্দেশ দেয়, সেই চূড়ান্ত পরিণাম পরিমিতিই হচ্ছে দর্শন। অর্থাৎ সকল জিজ্ঞাসার মীমাংসা আছে দর্শনে। বিজ্ঞান যেখানে নিরুত্তর, কাব্য-জিজ্ঞাসা যেখানে অমীমাংসিত, শিক্ষার আদর্শ যেখানে সন্দেহদুষ্ট, মতবাদ যেখানে সমস্যা-বিভ্রান্ত, সেখানে দর্শনই হচ্ছে সংশয়-নিরসনের কষ্টিপাথর। যুগ যুগ ধরে দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে দেশের শিক্ষাদীক্ষা, জীবনাদর্শ এবং মতবাদ।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষাদর্শেরও একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে। কিন্তু সেই জ্ঞান সঞ্চয়ের আদর্শ কি হবে? কোন্ তাত্ত্বিক মতবাদের উপর শিক্ষার দর্শন গড়ে উঠবে? তার উত্তরে দার্শনিক জীন পল চমৎকার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পন্থা নিরূপণের আগে, ঈপ্সিত পরিণামকে জানা উচিত। কারণ, মত থেকেই পথের সৃষ্টি। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে 'আমরা কি চাই', 'কি হওয়া উচিত' এই কথা পরিষ্কার করে জেনে নিলেই শিক্ষার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাই শিক্ষার মতবাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জোর গলায় বলেছেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে আদর্শ মত পোষণ করি, সেই মূলাদর্শ ই হবে শিক্ষাতত্ত্বের প্রথম দর্শন।

দার্শনিক মণ্টাইজিন কিন্তু জীবনাদর্শ নিয়েই সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি, তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান এবং নীতিকে টেনে এনেছেন। তিনি বলেছেন যে আলো

দেখানই যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে শিক্ষা হবে জ্ঞান ও পুণ্যের অনির্বাণ আলোকস্তম্ভ। অর্থাৎ জ্ঞান এবং নীতিই করবে শিক্ষার দিগ্‌দর্শন। কমিনিয়াস ওর সঙ্গে ধর্মকেও জুড়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, জ্ঞান, নীতি এবং ধর্মকে নিয়েই শিক্ষার দর্শন বিরচিত হবে।

ইলিয়ট ও বেকন ধর্ম, নীতি এবং জ্ঞানের দিক দিয়েও যাননি, তাঁরা সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা ও জীবনকে বিচার করে দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, জীবনের প্রধান দিক যে চরিত্র তার সংগঠনই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। কাজেই চারিত্রিক আদর্শই হবে শিক্ষার ভাষ্য, দর্শন সব কিছুই।

দার্শনিক লক কিন্তু আরো জীবন-সংশ্লিষ্ট করে দেখেছিলেন শিক্ষাকে। তাই তিনি শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পাপপুণ্য, সদাচরণের কথা নিয়ে শুধু মাথা ঘামাননি, দৈহিক স্বাস্থ্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দৈহিক ও মানসিক বিকাশই যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য, তখন শিক্ষার তত্ত্বকথায় কেন তার স্থান হবে না? আদর্শ যখন জীবনসম্ভূত, তখন তার মঙ্গলই হবে শিক্ষার দার্শনিক মতবাদ।

পাইন্টিষ্ট এবং স্পেনসার নীতিবাদের শীর্ষ থেকে শিক্ষাদর্শকে বিচার করেছেন। তাঁরা জাগতিক জীবনের কথা নিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি, ভগবৎ-তত্ত্বের ভূমানন্দের ধ্যান করেছেন। তাঁরা ঊর্ধ্বায়নকেই বলেছেন শিক্ষার চূড়ান্ত পরিণাম। অর্থাৎ শিক্ষার কল্যাণে মানুষ শুধু শুদ্ধ বুদ্ধ হয়ে উঠবে না, জ্ঞানের আলোয় তার হৃদয় রূপান্তরিত হবে দেবমন্দিরে। তাই তাঁরা বলেছিলেন যে, প্রত্যেক শিশুর অন্তরে স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার দার্শনিক আদর্শ।

হার্বার্ট স্পেনসার নীতিবাদের ধার দিয়েও যাননি. জীবন-প্রস্তুতির প্রশ্নকে তিনি বড় করে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, যে জীবনের জন্য শিক্ষা, তার প্রস্তুতির যাবতীয় ইন্ধনই যোগাবে শিক্ষা। তাই বলে প্রস্তুতির মহড়ায় শিক্ষাপর্ব শেষ হবে না, পূর্ণাঙ্গ জীবনধারার পথ সৃষ্টি করবে। সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ

জীবনাদর্শই হবে জ্ঞানতত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি, শিক্ষার প্রকৃত দর্শন। অর্থাৎ, প্রাণবন্ত জীবন-দর্শনই শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি।

জার্মাণরাও কিন্তু তাই বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, জীবনের হিত ছাড়া শিক্ষার অন্য কোন সাধনা থাকতে পারে না। জীবনের কল্যাণ বলতে তাঁরা বুঝতেন জীবন-সম্ভাবনার সম্যক বিকাশ। মানুষের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত রয়েছে, যে ক্ষমতা অন্তর্নিহিত হয়ে আছে, তার সম্যক স্ফুরণই হবে শিক্ষার প্রধান কাজ। কাজেই প্রাণশক্তির সুসমঞ্জস সম্যক বিকাশের নির্দেশই হবে শিক্ষার প্রাথমিক দর্শন।

ভারতীয় দর্শনের প্রথম সূত্র যে আত্ম-জিজ্ঞাসা, সেই প্রশ্ন থেকেই শিক্ষাতত্ত্বের উৎপত্তি। আত্মোপলব্ধিই তাই ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ। আত্মিক অনুভূতি থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে যে জানা, সেই জ্ঞানই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা। সেই সর্বব্যাপী যে চেতনা, সেই পরম জ্ঞান আহরণের জন্য যে কৃচ্ছ্র-সাধন, ভারতীয় ঋষিরা তাকেই জ্ঞানচর্চার তপস্যা বলে অভিহিত করেছেন। 'অধ্যয়নং তপঃ' কথাটিতে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাজেই তাঁদের কাছে অনুশীলন ছিল সাধনার এবং শিক্ষা ছিল তপস্যার সামিল। তাই তাঁরা বলতে পেরেছিলেন যে, প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে অন্তরে বাহিরে প্রাণ দিয়ে মনুষ্যত্বের যে আদর্শকে উপলব্ধি করবে, যে সত্যকে আবিষ্কার করবে, তাই হবে শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিভূমি।

এখন প্রশ্ন ওঠে, তবে কি শিক্ষা জীবনাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হবে, না শিক্ষার দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে? তার উত্তরে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, জীবন-দর্শনই যখন শিক্ষার আদর্শ বা দর্শন, তখন সে জীবন শিক্ষার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করবেই। তাই ব'লে কি যে-কোন জীবনের প্রতিফলনই শিক্ষাকে প্রভাবিত করবে? তা কখনই সম্ভব নয়। একথা অবশ্য ঠিক যে, শিক্ষার দ্বারা জীবনযাত্রায় মান উন্নত হয়, জীবন সুনিয়ন্ত্রিত, পরিমার্জিত হয়ে ওঠে। তবেই দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা ও জীবন পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত

করে। শিক্ষা জীবনাদর্শকে অনুসরণ করে, আবার জীবনাদর্শ শিক্ষার দ্বারাই পরিশোধিত হয়ে ওঠে, এমন কি, স্থলবিশেষে শিক্ষার দ্বারাই কোন ব্যক্তি বা জাতি নূতন পথ খুঁজে পায়, যেমন পেয়েছিল ডেনীশ জাতি তার গণ-শিক্ষার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

দার্শনিকরা নৈতিক জীবনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে নৈতিক জীবনের ঐশিক শক্তিই হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত পরিণাম, এমন কি নিয়ামকও বটে। তাই তাঁরা বলেছেন যে, এইজন্য নীতিবাদের প্রতিফলন আছে শিক্ষার দর্শনে। শিক্ষার দর্শনে যখন আদর্শ উধ্বর্ায়নের কথা আছে, তখন শিক্ষা-দর্শন থেকে সুনীতির কথা বাদ পড়েনি। এই কারণে নীতি-নির্ধারণ-পদ্ধতির তাগিদে যে শিক্ষা-পদ্ধতি বিরচিত হবে, একথা তাঁরা জোর গলায় প্রচার করেছেন।

তাঁরা আরো বলেছেন যে, যোগ্যতার মাপকাঠিতে ক্ষমতার বিচার চলে। মানুষের বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতা যেমন নিরূপিত হয় সে কেমন মানুষ তারই নিরিখে, তেমনি নৈতিক উধ্বর্ায়ন-শক্তির উপরই হবে জ্ঞানের বিচার। কে কি বিষয়ে কতটা জ্ঞানার্জন করেছে তা বিবেচ্য নয়, সুশিক্ষার ফলে কে কতখানি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, সেটাই হবে শিক্ষার মাপকাঠি। তা হ'লে প্রকৃত শিক্ষিত বলতে আমরা কি বুঝব? ভাল ইংরাজী বা জার্মান ভাষা জানাকেই কি উচ্চ শিক্ষার মান বলে ধরে নিতে হবে? অথবা কে কার চেয়ে কোন্ ভাষায় কতখানি বুৎপন্ন হ'ল, সেটাই হবে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ? ও দুটোর কোনটাই কিন্তু প্রামাণ্য নয়। দেখতে হবে জ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে কার কতখানি চারিত্রিক উধ্বর্ায়ন ঘটল। কারণ শিক্ষাভিমানে যখন "অহং" মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, জ্ঞান তখন লজ্জায় মাথা হেঁট করে। সেখানে শিক্ষার অহমিকা থাকে, কিন্তু গৌরব নষ্ট হয়। অপর পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা কিন্তু মানুষকে বিনম্র করে, কথায় এবং কাজে আনে একটা গভীর সংহতি।

এ ছাড়া নৈতিক শিক্ষার আর কি সুলক্ষণ আছে? তার উত্তরে নীতিজ্ঞরা

বলেছেন যে, নীতির প্রভাব যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। এক কথায় নৈতিক শিক্ষা, জ্ঞান, চিন্তা, শিক্ষা, সাধনা, জীবন, সমস্ত কিছুর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। মানুষের কাজে, কথায়, চিন্তায়, লেন-দেন, আচার-ব্যবহারেও নৈতিক প্রভাব বিদ্যমান। এমন কি কারিগরী-শিক্ষা থেকেও এ নীতিটুকু বাদ পড়েনি। এইজন্য সুদক্ষ শিল্পীর চারিত্রিক দৃঢ়তাই তার যোগ্যতাকে আরো গৌরবোজ্জ্বল করে তোলে। শিক্ষার গুণে যদি একজন স্বর্ণকার সাধু হয়ে ওঠে, একজন অসাধু ব্যবসায়ী সদাচারী হয়, তবেই জানব যে, শিক্ষার সুফল ফলেছে। নচেৎ শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

অনেকে আবার এখানে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, নীতি-শিক্ষার উদ্দেশ্য তবে কি হবে? তার উত্তরে বলা চলে যে নীতি-শিক্ষা হচ্ছে অন্তর্নিগূঢ় শক্তি-সাধনার শিক্ষা। অর্থাৎ সত্যিকার জীবনসাধনার জন্য প্রস্তুতিই হবে তার প্রধান উদ্দেশ্য। সত্যিকার জীবন বলতে বুঝায়, সেই জীবন, যা মানুষের সমস্ত কিছুকেই প্রভাবিত করে। মানবতাই অবশ্য সে জীবনের পরশমণি। মানুষের জ্ঞানের সাধনা আর কাজের সংকল্প থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ মানুষ কি হ'তে চায়, তার অভিপ্রায় কি এবং সে কি করতে চায়, তা থেকেই তার স্বরূপকে জানতে পারা যায়।

তা হ'লে শিক্ষার দর্শন রচিত হবে—নীতি, জীবনাদর্শ এবং উধ্বর্ায়নের কথা নিয়ে। কারণ শিক্ষা শুধু মানুষের দেহ কিংবা মনের শিক্ষার ব্যবস্থা করছে না, শিক্ষা করছে সমগ্র মানুষের সম্যক অনুশীলনের ব্যবস্থা। সেখানে জাতি, মানুষ এবং চরিত্র সংগঠনের কথাও আছে। স্বামী বিবেকানন্দও এই সামগ্রিক শিক্ষার কথাই বার বার উল্লেখ করেছিলেন। এই সর্বতোমুখী শিক্ষার যে বিরাট আদর্শ পটভূমি বিরচিত হবে, এক কথায় সেই হবে শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি। সেখানে জ্ঞান-সাধনা, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন-নীতি সমস্তই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে থাকবে। তবেই শিক্ষার সেই সর্বব্যাপী শক্তি আর প্রাণদীপ্ত ঐশ্বর্যে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

শিক্ষা ও ধর্ম

রাম জন্মাবার আগেই যেমন রামায়ণের সৃষ্টি, মানুষের আধ্যাত্মিক জাগরণও তেমনি তার শিক্ষা আরম্ভের পূর্বেই হয়েছিল। তার পিছনে অবশ্য ছিল দুর্গতি-মুক্তির একটা আকুল প্রার্থনা। আদিম মানুষ নৈসর্গিক দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পনা করেছে। পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের অনেক আগেই। প্রাচীন যুগে নীতি, কাব্য, ধর্ম, দর্শন সমস্ত কিছুরই উৎসই ছিল ধর্মগ্রন্থগুলি। বেদ-বাইবেল কোরান-ই ছিল যেন মানুষের ইহকাল পরকাল—জীবনাদর্শের যথাসর্বস্ব। ধর্মের এই একাধিপত্যের কথা স্মরণ করে একজন শিক্ষাবিদ বলেছিলেন যে, সৃষ্টির আদিতে যেমন পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল ছিল, সভ্যতার প্রথম কয়েক শতাব্দীতেও তেমনি মানুষের ধ্যান-ধারণার তিন দিকে ছিল ধর্মের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এই অধ্যাত্ম-চেতনার আড়ালে মানুষের অন্য চাহিদার জগৎ যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষ আর একটা প্রাণের ক্ষুধা ছিল মানুষের মনে। সে অনুভব করেছিল যে অন্য একটা চাহিদার জগৎ আছে, যেখানে হাস্যে-লাস্যে-গানে মানুষ নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে; রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ মানুষকে সেই অপ্রয়োজনের লীলাক্ষেত্রে আহ্বান করেছে, কিন্তু ধর্মের চোখ-রাঙানিতে মানুষ তাকে এড়িয়ে গিয়েছে। এক কথায়, অনেক দিন পর্যন্ত ধর্মের আওতায় শিক্ষা দীক্ষা ছিল মোহাচ্ছন্ন।

শিক্ষাটা প্রথমে ছিল ধর্মযাজক বা পুরোহিতদের হাতে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইতিহাসে তার নজির রয়েছে। এককালে আর্ক বিশপেরাই ছিলেন ইউরোপের সর্বময় কর্তা, আর গির্জাগুলিই ছিল ধর্ম-শিক্ষা এবং জনমত প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব-পর্যন্ত ইউরোপে ধর্মশিক্ষার প্রতিপত্তি দেখা যায়। রেনেসাঁস যুগের পর প্রথম শিক্ষার মোড় ফেরে।

তবুও ধর্মপ্রচারের মারফতে শিক্ষার প্রচার হয়েছে বহুদিন। ধর্মকেই কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হয়েছে অজস্র। তাই 'কানু ছাড়া আর গীত নেই', এ ছিল ভারতের সনাতন ধর্মের মূলমন্ত্র। বাইবেলের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে মিলটন 'প্যারাডাইস্ লস্ট' মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল রামায়ণকে অনুসরণ করে রচনা করেছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের আওতা থেকে শিক্ষা-দীক্ষাকে সরিয়ে আনলেও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মই কিন্তু পৌরোহিত্য করেছে। মুসলমান যুগেও দেখা যায় যে, শিক্ষা ব্যাপারটা ছিল মৌলভী মুন্সীদের হাতে মক্তব, মাদ্রাসায় সীমাবদ্ধ। সেখানে ধর্মশিক্ষার স্থান-ই ছিল সর্বাগ্রে।

এই ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সকল দেশে এক একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তাঁরা শুধু নিজ ধর্মের গুণ কীর্তনে তন্ময় হতেন তা নয়, সময় সময় অন্য ধর্মের প্রতি করতেন কটাক্ষপাত। শুধু কি তাই? প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতাও চলতো দেব-দেবীর বিগ্রহমূর্তিকে কেন্দ্র করে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে কত না সাম্প্রদায়িক কলহ। এমন কি, ধর্মগত বিদ্বেষের ফলে বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহ। ইউরোপের দীর্ঘমেয়াদী ধর্মযুদ্ধটা ধর্ম থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন ছাড়া আর কিছু নয়।

নানা আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল থাকা সত্ত্বেও ধর্ম কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম যেমন নিগূঢ় তেমনি সর্বব্যাপী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে কোন না কোন ধর্মের প্রভাব। ধর্মহীন নির্বিকল্প মানুষ যেন কল্পনাতীত! উদার অর্থে প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই তার ধর্ম বলা চলে। মনুষ্যত্ব তাই মানুষের, পশুত্ব পশুর, দেবত্ব দেবতার, ঋষিত্ব ঋষির, ধর্ম; তবে যে ধর্ম এত ব্যাপক, তার সংজ্ঞা কি হবে? আর ধর্মই বা কি? যা ধারণ করে, তাই ধর্ম। মনুষ্য ধর্মের আধার মনুষ্যত্ব, দেবতার দেবত্ব, পশুর পশুত্ব। এই প্রসঙ্গে ধর্মের বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখযোগ্য। ধর্ম নিম্নগামী নয়, উর্ধ্বায়ন-ই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। আর এই উর্ধ্বায়ন বা উন্নতীকরণ বিবেকের নির্দেশ সাপেক্ষ; তাই

বিবেকহীন প্রাণীর কোন উধ্বর্ায়ন নেই, উধ্বর্ায়ন আছে মানুষের। এই পূর্ণ উধ্বর্ায়নকে নির্বাণ বা মুক্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে; আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ধর্মই ধর্মের শেষ। অর্থাৎ আরম্ভ আর পরিণতি, অনুসন্ধান এবং প্রমাণ, দুই-ই আছে ধর্মের মধ্যে। তবে উধ্বর্ায়ন ধর্ম সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তাই ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, ভাল হবার প্রবৃত্তি এবং উদার মহৎ জীবনের আকাজ্ক্ষা থেকেই আধ্যাত্মিকতার জন্ম। অনুসন্ধান থেকেই অনুমান, প্রমাণ, তার পর আসে জ্ঞান। এই জ্ঞান-ই মানুষকে সৎ পথের নির্দেশ দেয়। কাজেই সেই সত্য জ্ঞানই 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমে'র পথ দেখায়। আর 'সত্যম্' যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে 'সুন্দরম্' আছে, 'শিবম্'-ও আছে। তাই সত্যের মধ্য দিয়েই জীবন শুদ্ধ, পবিত্র, প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে। কাজেই এই সুন্দর জীবন লাভের অনুধ্যানই হচ্ছে মানুষের ধর্মপিপাসা। ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাই তিনি বলেছেন, 'Religion is the quest for good life.'

এই তো গেল ধর্মের কথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার যোগ কোথায়? আমরা জানি যে জীবনের জন্যই শিক্ষা এবং ধর্মের প্রয়োজন। জীবনের উধ্বর্ায়ন-ই ও দুটোর লক্ষ্য। কাজেই সেই উধ্বর্ায়নের ক্ষেত্রেই ধর্মের সঙ্গে রয়েছে শিক্ষার যোগ। তা ছাড়া, শিক্ষা ও ধর্ম মানুষের চিত্তবৃত্তির দুটি ভিন্ন দিক মাত্র। মানুষের সহজাত কৌতূহল থেকে অনুভূতির মাধ্যমে এসেছে জ্ঞান বা শিক্ষা, আর বিশ্বাসসঞ্জাত ভক্তি থেকেই জন্মেছে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা। কাজেই জীবনের সঙ্গে ধর্ম ও শিক্ষার অন্তরের যোগ রয়েছে। একজন শিক্ষাবিদ তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শিক্ষাই জীবন—এ কথা যখন স্বীকৃত হয়েছে, তখন ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককেও মেনে নেওয়া হয়েছে। আর এই আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যে ঔচিত্যবোধ প্রচ্ছন্ন আছে, তাই জীবন ও শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে, অন্যায়, অসত্যের গ্লানি থেকে মানুষের সমাজকে রক্ষা করে। কাজেই আজকের

সর্বাত্মক বিপর্যয়ের দিনে শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান করে দিতেই হবে। অবশ্য ধর্ম বলতে যে কোন বিশেষ মতবাদ স্থান পাবে তা নয়। তাই এক জন নীতিজ্ঞ শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, সভ্যতার সংকটের দিনে অকারণ রক্তপাতের হাত থেকে দেশকে, জাতিকে বাঁচাতে হলে জাতীয় শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নির্ভুল দার্শনিক ভিত্তির উপর। কারণ নীতিকে বাদ দিয়ে আর যা হোক, প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। দৈহিক ও মানসিক বিকাশই যে শিক্ষার লক্ষ্য, সে শিক্ষা কখনই আধ্যাত্মিকতাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। তাই জাতীয় সংকটের দিনে শিক্ষার ভিত্তি কি হবে, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, "In a time of total war when everything we value is in danger of being engulfed in a tide of barbarism, there is no need to argue that the education of reconstruction must be based on a sound philosophy."

অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ রুশোর মন্তব্যের মধ্যেও ঠিক ঐ কথারই সমর্থন আছে। তিনি বলেছেন যে, সভ্যতার প্রবাহ যেদিকে চলেছে, তাতে মনে হয় কোন 'ইজিম্' আর 'ইষ্ট্' জগতের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বিষয় সঠিকভাবে কোন কথাই বলতে পারে না। তবে বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য একটা মহান উদার কল্যাণময় আদর্শবাদ যে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর সেই আদর্শ হবে প্রকৃত মানবতার শিক্ষা। বিশ্ব-নিরাপত্তার কথাপ্রসঙ্গে তাই তিনি বলেছিলেন যে, Neither naturalism nor pragmatism is capable of providing the insurance policy that will secure the future of the whole world. কিন্তু কিসের দ্বারা সেই ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হবে? তার উত্তরে তিনি মনুষ্যত্ব অর্জনের পন্থা নির্দেশ করে বলেছেন যে, Humanism must be securely founded on something which supports and sustains it ; cannot of itself endure. অর্থাৎ কেবল মনুষ্যত্বের দোহাই দিলেই নিরাপত্তা রক্ষা হবে না, বরং তাকে এমন নিরংকুশ

করে তুলতে হবে যা মানবতার সংরক্ষক এবং সহায়ক হয়ে উঠবে। উপযুক্ত শিক্ষাই সেই মানবধর্মের বুনিয়াদ গড়ে তুলবে।

মানুষ কোন দিন ধর্মকে ত্যাগ করতে পারবে না। কারণ মানুষ মাত্রই অতিমাত্রায় ধর্মগতপ্রাণ। ধর্ম তার হতাশায় সান্ত্বনা, দুঃখের শান্তি, বিপদের সাক্ষী, দুর্বলতায় শক্তি, ভয়ের পরম নির্ভর স্থল, এক কথায় ধর্ম মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। কাজেই ধর্মের যে দুর্গে পৃথিবীর বিপন্ন দুর্গত আত্মা একদিন আশ্রয় পেয়েছিল, ভবিষ্যতের মানুষ আবার সেই ধর্মের উপরই নির্ভর করবে। স্বার্থপরতা, হানাহানি, রক্তপ্লাবন নূতন করে আবার সেই অধ্যাত্মচেতনার মরা গাঙে আনবে বিশ্বমৈত্রীর আনন্দ জোয়ার। টাইমস্ পত্রিকায় একজন প্রবন্ধকার ধর্ম-শিক্ষার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, প্রাণহীনও বটে। শিক্ষা ধর্ম থেকে তো পৃথক নয়ই, ধর্ম শিক্ষারই একটি অপরিহার্য অংশ। কারণ ধর্ম ও শিক্ষাই মানুষকে গড়ে তোলে, সমগ্র জাতিকে কোন একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। কাজেই Religion must form the very basis of any educa tion worthy of name and that education with religion omitted is not really education at all. অর্থাৎ ধর্মই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে যে শিক্ষা—তা সে যতই ব্যাপক হোক না কেন—সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। আদর্শ নাগরিকত্বের গুণপনার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন যে, চরিত্র ও আত্মবিশ্বাসই হবে সামাজিক, রাষ্ট্রীক এবং নৈতিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মূলধন। আর সে শিক্ষা আসবে কেবল জ্ঞানের মধ্য দিয়ে নয়, বরং সে জ্ঞান আসবে নৈতিক, চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনার মারফতে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষায় ধর্মের স্থান কতটুকু? তার উত্তরে অনেকে বলেছেন যে, সরাসরিভাবে নীতি বা ধর্মশিক্ষা দেওয়াটা ঠিক নয়। উপদেশের ছলে প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম শিক্ষা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ধর্মকে শিক্ষার মুখ্য বিষয় না করে প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেই কিছু কিছু ধর্মোপদেশ শিক্ষা

দেওয়াই উচিত। সর্বধর্ম সহিষ্ণুতাই হবে প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্দেশ্য। কেউ কেউ আবার বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী থেকে ধর্মকে ছেঁটে বাদ দিতে চেয়েছেন; তাঁরা বলেছেন যে, শিক্ষার মধ্যে ধর্মকে টেনে এনে কোন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি না করাই ভাল। কারণ শিক্ষার জন্যই শিক্ষা, সেখানে ধর্মকে নিয়ে অনর্থক মাতামাতি করে লাভ কি? তার উত্তরে নীতিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা বলেছেন যে, জীবনের উধ্বর্ায়নের জন্যে শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, তেমনি আধ্যাত্মিকতা উন্মেষের জন্য প্রয়োজন ধর্মশিক্ষার। কারণ ধর্মের ঐতিহ্য থেকেই মানুষ লাভ করে নৈতিক আদর্শ, চারিত্রিক দৃঢ়তা আর পবিত্র আধ্যাত্মিকতা। তাই শিক্ষা থেকে ধর্মকে কিছুতেই নির্বাসন দেওয়া চলে না। কারণ ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষা কখনো জীবনের আদর্শে উন্নীত হতে পারে না। এই জন্যে দেখা যায় যে, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা, সাধনা আর সিদ্ধি যেখানে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে, সেখানেই শিক্ষা হয়েছে কার্যকরী, সাধনা হয়েছে সার্থক। কিন্তু যেখানে তার অভাব ঘটেছে, সেখানে শিক্ষা বা সাধনা জীবনকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কাজেই শিক্ষার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সংযোগ স্থাপন করতে হবে, নইলে শিক্ষার আদর্শ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই শিক্ষার স্বরূপ কি হওয়া উচিত, তার উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেই শিক্ষাই দিতে হবে, যে শিক্ষায় চরিত্র গড়ে উঠবে, জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হবে এবং মানুষ তৈরী হবে। কিন্তু সেই শিক্ষা ধর্মনীতিকে অস্বীকার করে কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তা ছাড়া ধর্ম মানুষের বহিরঙ্গের জিনিস নয়, ধর্ম মানুষের সমগ্র জীবনের আত্মিক নিগূঢ় শক্তি। তাই একজন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বলেছেন যে, ধর্ম জাতীয় পরিচিতির শীলমোহর নয়, ধর্ম প্রত্যেক মানুষের জীবনদেবতার আত্মদর্শন। কাজেই নানা মতবাদের প্রাচীর তুলে মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করবার জন্য ধর্মের সৃষ্টি নয়, অথবা ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডি নয়। তাই তিনি বলেছিলেন যে, Religion does not mean a special domain by the side of others—its inten-

tion is rather to be the inner most soul and the supreme power to the whole life.

এই জন্যে তিনি ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্মপরিপুষ্ট শিক্ষা প্রচারই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন ধর্মকে। তিনি আরো বলেছিলেন যে, কতকগুলো কেতাব থেকে ধর্মোপদেশ পড়ে শোনালেই হবে না, অথবা ধর্মশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর মধ্যে নির্দিষ্ট সময় রাখলেই চলবে না, বরং ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতাকে এমনভাবে জাগ্রত করে তুলতে হবে যার দ্বারা তার সমগ্র জীবন এবং কাজকর্ম প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই তিনি জোর গলায় বলেছিলেন যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ "Applied to School, this means that religion must be much more than a subject or the time-table although time must be allocated for its special study ; it must be an activity and a spirit pervading the whole of the life and work.

ন্যায়, নিষ্ঠা এবং আধ্যাত্তিকতাই শিশুর চরিত্রকে সুদৃঢ় করে। তা ছাড়া ধর্মের আদর্শকে অনুসরণ করে শিশুরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তুলতে পারে। তাই শিশুর যোগ্যতার মান নির্ণয় করতে গিয়ে Committee on Secondary Education '39-এর রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে যে, বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা যতই শিক্ষালাভ করুক না কেন, তাদের আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত না হলে আমরা তাদের প্রকৃত শিক্ষিত বলতে নারাজ। তাই সেই বিবরণীতে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হয়েছে যে, No boy or girl can be counted as properly educated, unless he or she has been made aware of of the fact of the existence of a religious inter-relation of life. অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে শিশু এবং তার শিক্ষাপর্বেরও যে একটা আত্মিক যোগ রয়েছে, সে বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষককেই অবহিত হতে হবে।

ধর্মের সংজ্ঞা কি, এবং শিক্ষার সঙ্গে তার যোগ কোথায়, সে বিষয়ে কিছুটা ধারণা দেওয়া গেল। এখন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শ ও ঐতিহ্যের বিষয় কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা সকলেই জানি যে, ভারতীয় ধর্ম-সাধনা আত্মকেন্দ্রিক, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ভারতীয় আত্মদর্শনের প্রথম কথা 'আত্মানাম্ বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জানো—মনের মধ্যে ডুব দিয়ে নিজের স্বরূপকে জানাই হচ্ছে মানুষের প্রথম ও প্রধান ধর্ম।

ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল সুর হচ্ছে বৈরাগ্যের। ভোগলিপ্সা ভারতের প্রাণের সাধনাকে কোনোদিনই স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ ভারতবর্ষ কেবল ঐহিকের সুখকে জীবনসর্বস্ব বলে মনে করেনি। তাই 'একের মন্ত্রে বহুরে আহুতি দিয়া' জাতিগত, শ্রেণীগত সমস্ত ভেদাভেদ দূরীভূত করে ভারত-বর্ষই 'একটি বিরাট হিয়া'কে জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে। অর্থাৎ ভারত-মাতা তাঁর নিজস্ব সভ্যতার ছাঁচে, হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, পারসিক, শক, হুন, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি সকল জাতিকেই এক আদর্শে ঢালাই করেছিলেন। সমস্ত জাতিগত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের একত্রীকরণ আর কোথাও দেখা যায় না।

ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এইজন্য ভারতীয় শিক্ষার একটি দিক হচ্ছে পরা বিদ্যা আর অপরটি হচ্ছে অপরা বিদ্যা—একটি চেয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি, আর অন্যটি ইঙ্গিত দিয়েছে জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের, ও দুটোর যে কোন একটির অভাবে জীবন অসম্পূর্ণ। কারণ মানুষ আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধু দেহ নিয়ে বাঁচতে পারে না। তাই জৈবিক প্রয়োজনের পর মেটাতে হয় তার আধ্যাত্মিক, আত্মিক প্রয়োজনকে। এই কারণে জীবনের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য ধর্মের যেমন আবশ্যকতা আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে শিক্ষার।

ভারতবর্ষের গুরুকুল শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রতিদিন অধ্যয়নের পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রকে স্তোত্র পাঠ করতে হোত। অধ্যয়ন ছিল তাঁদের কাছে তপস্যা স্বরূপ। ভগবৎ চিন্তা করে দেবদ্বিজে প্রণাম জানিয়ে,

মনকে শুদ্ধ বুদ্ধ করে তাঁরা লেখাপড়ার কাজ আরম্ভ করতেন। জ্ঞানের পূজায় শিক্ষার সাধনায় এমনি করে তাঁরা মনপ্রাণ নিয়োজিত করতেন।

বর্তমান যুগের শিক্ষাবিদরা বিদ্যালয়ে সামূহিক প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। প্রার্থনা বা বিনম্র ধর্মভাবের প্রভাব শিশু জীবনে বড় কম নয়। তাই প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় সমবেত প্রার্থনার স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ এই সম্মিলিত প্রার্থনার মধ্য দিয়েই ছেলে মেয়েদের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করে তোলা সহজ। তা ছাড়া বিভিন্ন ধর্মের আলোচনার মাধ্যমে মনের উদারতা বৃদ্ধি পায়, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা জাগ্রত হয়ে ওঠে; এবং বিভিন্ন ধর্মের মূলসূত্রের মধ্যে শিশুরা পায় একটা পরম ঐক্যের সন্ধান। ফলে শিশুরা কোন ধর্মকেই আর হেয় জ্ঞান করতে পারে না; তারা আপনা থেকেই উদার মতাবলম্বী হয়ে ওঠে। আর সর্বধর্মপ্রীতির মধ্য দিয়ে শিশুরা উপলব্ধি করতে শেখে বিশ্বপ্রেম আর বিশ্বভ্রাতৃত্বকে। আত্মকেন্দ্রিক শিশুর পক্ষে এর চেয়ে কল্যাণকর মহান উর্ধ্বায়ন আর কি হতে পারে? তাই এই সার্বজনীন অনুভূতি শিশুর ভবিষ্যৎ ধর্মজীবনের সাধনার, কল্যাণের শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। কাজেই সেই আত্মোপলব্ধি থেকে কোনক্রমেই শিশুদের বঞ্চিত করা উচিত নয়।

শিক্ষা ও স্বাবলম্বন

বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা স্বাবলম্বন বা আত্ম-নির্ভরশীলতা। নির্ভরশীলতা থেকেই আত্ম-শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে, নিজের কার্যক্ষমতার উপর বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু ওটার অভাবে সংকল্পে দ্বিধা আসে, কোন প্রচেষ্টাই এগুতে চায় না। যে মানুষ প্রতি পদে, প্রতি কার্যে অসহায়তা অনুভব করে, যার আত্ম-বিশ্বাস নেই, তা'র কাছে কি-ই বা আশা করা যায়? এক কথায় শিক্ষা তার কাছে নিরর্থক। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবের সম্যক বিকাশ সাধন করা। এই বিকাশ সাধনকে আমরা একটু ঘুরিয়ে সর্বাঙ্গীন স্বাবলম্বনশক্তি লাভও বলতে

পারি। শিক্ষা যদি মানুষকে সমস্ত দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ না করে—তা' হ'লে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আর শিক্ষারই প্রয়োজনীয়তা কি? স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থে এই বলা হ'য়েছে যে, নিজের প্রতিদিনের কাজকর্মের জন্য কাউকে যেন পরমুখাপেক্ষী না হ'তে হয়; অর্থাৎ লেখা-পড়া, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি কোন কাজের জন্যই পরের উপর উপর যাতে নির্ভর করতে না হয়। একথা ব্যক্তির ন্যায় সমাজ, জাতি ও দেশের বেলাও সম প্রযোজ্য। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রশ্ন প্রকট হ'য়ে উঠেছে। আজ দেশের গণ-নায়কদের চিন্তা হ'চ্ছে যে, কিরূপে খাদ্যশস্যে, অর্থে শিল্পে, শিক্ষায় দীক্ষায় দেশকে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা যায়।

তাই সেই স্বাবলম্বনের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথমেই। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ-ই হ'বে শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি। শিক্ষার সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য যে সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেই ভাবী সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন গান্ধীজী। তিনি যে শোষণহীন বিকেন্দ্রিত গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা' মুখ্যতঃ হ'বে দেশের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে প্রতিটি মানুষ হ'বে আত্মনির্ভরশীল, নিজের কাজকর্ম, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে পরমুখাপেক্ষী হ'বে না।

এখন প্রশ্ন ওঠে শিক্ষককে যেন স্বাবলম্বী হ'তে হ'বে? তা'র কারণ এই যে, শিক্ষক হ'চ্ছেন ছাত্রসমাজের আদর্শ। ছোটদের শিক্ষার প্রথম হাতে-খড়ি তাঁরই কাছে। কাজেই শিক্ষককে অনুসরণ ও অনুকরণ করেই শিশু লিখতে, পড়তে ও জানতে শিখবে। ফলে শিক্ষকের উপর-ই বহুলাংশে নির্ভর করে শিশুর ভবিষ্যৎ। যে জ্ঞান, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের ছাপ শিক্ষকেরা শিশু-মনে রেখে যান, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন তা'র দ্বারাই অনেকখানি প্রভাবিত হয়। এ ছাড়া চতুর্বিধ দায়িত্বের যোগসূত্রে ছাত্র ও শিক্ষককের সম্পর্ক বাঁধা। প্রথমতঃ শিক্ষকই হচ্ছেন ছেলেদের বিশ্বস্ত উপদেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ, তিনি হ'চ্ছেন

ছাত্রদের পরামর্শদাতা ও প্রশ্নের উত্তরদাতা; তৃতীয়তঃ; তিনি হ'চ্ছেন ছাত্রদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাগিদার; এবং চতুর্থতঃ তিনি হচ্ছেন অনুশীলন দক্ষতার মন্ত্রণাদাতা।

দায়িত্ব ব্যতীত ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে আছে প্রীতির সম্পর্ক। এই মনের মিল, প্রীতির বন্ধন না থাকলে শিক্ষকতার কোন মূল্য থাকে না, পঠন-পাঠনে আসে বিরক্তিকর একঘেয়েমি। ফলে সেই নিদারুণ নিরুৎসাহ ও হতাশা শুধু শিক্ষককে পঙ্গু করে না, ছাত্রদের সর্বনাশের ইন্ধন যোগায়। এবংবিধ কারণে শিক্ষককে হ'তে হ'বে সর্ববিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞানাদর্শের 'মডেল'—ছাত্ররা যাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করে উপকৃত হ'বে। তবে অমন সর্বকুশলী শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর। তাই ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকদের নিয়েই শিক্ষা-সমস্যা জটিল হ'য়ে উঠেছে।

কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে শিক্ষককে একাধারে বহুগুণের অধিকারী হ'তে হবে; এবং সর্বোপরি তাঁকে হ'তে হ'বে স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক ও স্বাবলম্বী। তা' ছাড়া শিক্ষকের জীবন-ই হ'বে তাঁর জীবন্ত বাণী—যেখান থেকে ছাত্ররা অনুপ্রেরণা লাভ করবে। এক কথায় তিনি হ'বেন ছাত্রদের জ্ঞানের, সত্যের, ন্যায়নিষ্ঠার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—গুরু—বন্ধু—অভিভাবক সমস্ত-ই। শিশুর হৃদয় জুড়ে থাকবে শিক্ষকের অভয়বাণী, মনে থাকবে তাঁর আদর্শ; তিনি থাকবেন ছাত্রদের সুখে দুঃখে, আনন্দে হর্ষে; তাঁদের কৈশোরের স্বপ্নে, তা'দের হতাশায় তিনি হ'বেন আশার উৎস; যৌবনের উন্মাদনায় তিনি হ'বেন তা'দের জীবন-রথের সারথি; তাদের বিপদগামী মনে সংযমের রাশ টেনে ধরবেন তিনি।

ছাত্র শিক্ষকদের এই মধুর সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। তাই অনেকে বলেন যে, ভাল শিক্ষককের সাহচর্য লাভ পরম সৌভাগ্যের কথা। যে জীবনের দ্বারা ছাত্রসমাজ নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবান্বিত হচ্ছে, সে জীবনও সর্বাগ্রে সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। কাজেই নিজে আচরণ অর্থাৎ শিক্ষাগুরুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যে গুরুদায়িত্ব আছে, যে কর্তব্য আছে, আদর্শের দিক থেকে শিক্ষক

তা'কে কিছুতেই অবহেলা করতে পারেন না। কারণ যে জীবন্ত প্রাণের গবেষণাগারে শিক্ষকের আজীবনের ধ্যান-ধারণার রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলেছে —সেখানে এতটুকু শৈথিল্য, ত্রুটি, বিচ্যুতি থাকলে, ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার উৎস যাবে শুকিয়ে। সমাজের হ'বে সমূহ ক্ষতি। সুতরাং কোন শিক্ষকই অপরিণত শিশুমন নিয়ে ইচ্ছেমত ছিনিমিনি খেলতে পারেন না—কারণ এ জাতীয় অপচয়ের প্রতিক্রিয়া সমাজ কোন দিন বরদাস্ত করবে না।

তাই সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য দরদী মন নিয়ে, দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে, অকুতোভয়ে জ্ঞানের পথে, সত্যের পথে জীবনের উত্থান পতনে সকলের পথ-প্রদর্শক হ'তে হবে শিক্ষককে। যুদ্ধের সঙ্কট মুহূর্তে সেনাপতি যদি ভয়ে বিচলিত হন, তবে সৈন্যদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা আসবে, তাতে যুদ্ধ জয় অসম্ভব। তেমনি ছাত্রদের অভিভাবকত্ব করতে গিয়ে শিক্ষক যদি নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন, তবে সে শিক্ষার আদর্শ ব্যর্থ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই শিক্ষকতার দুরূহ কার্যে স্বাবলম্বনের বরাভয় নিয়ে আগুয়ান হ'তে হবে শিক্ষককে। তবেই শিক্ষকের পদাঙ্ক অনুসরণে ছাত্র বিদ্যা হ'বে গরিয়সী।

মনস্তাত্বিকরা বলেন যে, শিশুমাত্রই অনুকরণ প্রিয়। শিশু প্রথম তা'র পিতামাতাকেই অনুকরণ করে, পরে তার অভিজ্ঞতার গণ্ডি যখন বাড়ে, সে তখন তার শিক্ষকমশাই কিংবা বয়স্ক গুরুজনদেরই নকল করতে শেখে। চোখের সামনে সে যা' দেখে, যা' শোনে, অনুভব করে কিংবা শিক্ষকের যে আচরণ অথবা বৈশিষ্ট্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সে তখন যুক্তি দিয়ে তা' যাচাই করতে চায় না। ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে সে বরং তা' অন্ধভাবে অনুসরণ করে। প্রয়োজনের জগতে যাকে প্রতিপদে অপরের উপর নির্ভর করতে হয়, সেই পরমুখাপেক্ষী শিশুমনে স্বাবলম্বী শিক্ষকের কার্যকলাপ বিস্ময় জাগায়। সে তখন নিজের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে, পিতামাতার স্নেহের দুর্গে থেকেও সে এতখানি অসহায়, দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, নিজে থেকে আত্মরক্ষার শক্তি পর্যন্ত

তার নেই ; কাজেই সে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজেকে তুলে ধরতে চাইবে, প্রমাণ করতে চাইবে, সে আর দুর্বল অসহায় অপরের অনুকম্পার ভিখারী নয়, নিজের অধিকারের রহস্য সেও ভেদ করেছে, ক্ষমতার সিংহাসনে সেও ব্যক্তিত্বের সম্রাট। এই 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্র সে লাভ করে শিক্ষকের জীবনাদর্শ থেকে। এখান থেকেই আরম্ভ হবে শিশুর প্রকৃত শিক্ষা। কারণ উপদেশ নির্দেশের চেয়ে শিক্ষকের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব ঢের বেশী। তাই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও জীবনই শিশুর কাছে শিক্ষার, সাধনার, জ্ঞানের এবং ধ্যান-ধারণার জীবন্ত উপদেশ।

স্বাবলম্বন শিক্ষকের একটা প্রধান গুণ, সে বিষয়ে সন্দেহই নেই। কিন্তু প্রশ্ন হ'চ্ছে সেই স্বাবলম্বনের মান কি হবে অথবা কতখানি আত্মনির্ভরতা সম্ভব? কারণ সকল ক্ষমতারও একটা সীমা আছে, তার অতিরিক্ত 'সর্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্' কাজেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ অসুবিধার জন্য শিক্ষকেরা কখনও সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন না। তাই স্বাবলম্বীদের দোহাই দিয়ে আত্ম-নির্ভরতা শক্তির সীমা অতিক্রমের চেষ্টা করা ঠিক নয়। কাজেই নানা কারণে শিক্ষকের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণতঃ তিনপ্রকার স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরতার কথাই বলা হয়েছে ; যথা ঃ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। সেই কাজের বিধান লঙ্ঘন ক'রে সমাজ যেমন নিখুঁত হতে পারে না, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও তেমনি সফল হ'তে পারে না। তা ছাড়া স্বহস্তে সমস্ত কিছু করাটাই কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই স্বাবলম্বনের দোহাই দিয়ে কোন পাগলামী করতে গিয়ে নিজের তথা সমাজের উন্নতি ব্যাহত করার কোন মানে হয় না। সেই কারণেই প্রত্যেক শিক্ষককে তার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ওকাকিবহাল হ'য়েই তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে হ'বে। নইলে ক্ষেত্র বিশেষে হিতে বিপরীত হ'তে পারে।

এখন অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করা যাক। আর্থিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা সর্বাগ্রেই শিক্ষককে করতে হবে। আর্থিক দুরবস্থার জন্য যাকে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করতে হয়, অর্থচিন্তা যার চমৎকার,

ঋণের দায়ে যার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গিয়েছে—কেমন ক'রে সে শিক্ষার সমস্তা নিয়ে মাথা ঘামাবে, কোথায় পাবে সে নব নব পরিকল্পনার উদ্ভাবনী শক্তি? দারিদ্র্যের সঙ্গে যে আজীবন সংগ্রাম করলো, অনাহারে যে মুমূর্ষু, পাওনাদারের তাগিদে যে অস্থির, তৈল তণ্ডুলের জন্য যার মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিতে হ'চ্ছে—তার নির্জীব ক্ষীণকণ্ঠে শিক্ষার জয়গান ধ্বনিত হ'তে পারে না। বাঁচার মত যারা বাঁচল না, অনুভব করবার অবসর পেল না, নিরুৎসাহের অন্ধকারে যার জীবন সমাচ্ছন্ন, বিক্ষোভ আর অসন্তোষ যার মনকে বিষিয়ে তুললো—কেমন করে সে জ্ঞানামৃত বিতরণ করবে? শিক্ষকতা তার কাছে দায়িত্বসারা মাত্র। কর্তব্য গুরুভার ছাড়া আর কিছু নয়। ছাত্ররা তার কাছ থেকে কি প্রেরণা লাভ করবে? ফাটা গ্রামোফোনের মত একঘেয়েমির ঘ্যানঘ্যানানি শুনে ছাত্ররাও ঝালাপালা হয়ে উঠবে। সুতরাং আর্থিক অসংগতি দূর করতে না পারলে শিক্ষকতা কার্যে শৈথিল্য আসতে বাধ্য। গান্ধীজী তাই একথা চিন্তা ক'রে তাঁর ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। উৎপাদনাত্মক শিল্পকাজের দ্বারাই তিনি বিদ্যালয় ও শিক্ষককে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী করে তুলতে চেয়েছিলেন। শিল্পের উপর জোর দিয়েই তিনি চেয়েছিলেন অন্ন, বস্ত্র ও আবাসের সংস্থান করতে। শিক্ষকের কর্তৃত্বাধীনে ছাত্রদের সহযোগিতায় উৎপন্ন শিল্পের বিক্রয়-লব্ধ অর্থে বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার এবং শিক্ষকের বেতন সব কিছুর ব্যবস্থা তিনি করতে চেয়েছিলেন। এখানে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে পঠন পাঠনের দিকটা অবহেলিত না হয়; এবং শিক্ষকগণ নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে ছাত্রদের অতিরিক্ত শ্রম করিয়ে না নেন, নয় ত অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের দিকে জোর দিতে গিয়ে বিদ্যালয়গুলি ছোটখাট কারখানায় রূপান্তরিত হ'য়ে উঠবে; নিজের সুখ সুবিধার জন্য অপরকে এমন করে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ক'রে বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা জীবিকানির্বাহ—এই যদি হয় অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, তবে ছেলেরা কামার ছুতোর হ'তে পারে, সুশিক্ষিত মানুষ হবে না।

এখন শিক্ষকের সাংস্কৃতিক স্বাবলনের কথা আলোচনা করা যাক। সাংস্কৃতিক স্বাবলম্বন বলতে এই বুঝায় যে, দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তার শুধু আত্মিক যোগ থাকবে না; তাঁর একটা নিজস্ব সাংস্কৃতিক মতবাদও থাকবে। শুধু কি তাই? ঐতিহ্যের ছাপ থাকবে তাঁর আচার আচরণে, কথাবার্তায়। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা কি, তার ঐতিহ্য কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সাংস্কৃতিক ধারার বৈশিষ্ট্য কি—সে সম্বন্ধে শিক্ষক নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল থাকবেন। অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব একটা সাংস্কৃতিক সুরুচি, পরিমার্জিত রসবোধ, সৌন্দর্যানুভূতি, মানসিক সংহতি, সাহিত্য ললিতকলা-প্রীতি থাকবে। এক কথায় শিক্ষক হবেন রুচিসম্পন্ন রসজ্ঞ মানুষ; অর্থাৎ তিনি হবেন জ্ঞানযজ্ঞের পুরোহিত এবং উদ্গাতা দুই। আর শিশুরা সেই শিক্ষকদের পাদমূলে বসে একাধারে জ্ঞান, সত্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ধারণা লাভ করবে।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত গুণাবলী প্রত্যেক স্বাবলম্বী শিক্ষকের থাকবে।

(১) কল্পনাশক্তির প্রখরতা
(২) সৃজনাত্মক প্রতিভা
(৩) সৌন্দর্য ও রুচিজ্ঞান
(৪) কাব্য ও ললিতকলার অধিকার
(৫) সুন্দর বাচন ভঙ্গি
(৬) দয়া-মায়া সহানুভূতি
(৭) পাঠ বিষয়ে গভীর জ্ঞান
(৮) ছন্দ সংগীতে আগ্রহ
(৯) সুন্দর লেখার ক্ষমতা

শিক্ষার ধারা

মানব-বিবর্তনের যেমন একটা ইতিহাস আছে, শিক্ষা-নীতিরও তেমনি একটা ধারা আছে। আরব্য-উপন্যাসের কাহিনীর মত হঠাৎ একদিনে শিক্ষার রূপান্তর ঘটেনি, বরং যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে শিক্ষার ধারা। সভ্যতার নূতন ভাবধারায় যতই সমাজ-জীবনে চেতনা এসেছে, ততই উন্নতির প্রয়োজন বোধ করেছে মানুষ। সে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ তার বুদ্ধি-বৃত্তিকে নিয়োজিত করেছে নব নব জ্ঞানের সন্ধানে; তারই ফলে মানুষ লাভ করেছে শিক্ষার নূতন প্রজ্ঞা। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, আত্মিক কল্যাণের জন্য মূলত যে জ্ঞানের প্রয়োজন, জীবনকে বাদ দিয়ে সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই; কারণ, শিক্ষা জীবন-কেন্দ্রিক। তাই জীবন-ধারার বিচিত্র গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা ক'রে, অনেক সভ্যতার বাঁক ঘুরে, শিক্ষা আজ এমন এক যুগ-সন্ধি-ক্ষণে এসে উপনীত হয়েছে—যার পূর্বাশায় ভবিষ্যতের নূতন সম্ভাবনা। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হ'য়ে বিবর্তনের ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে শিক্ষার আদর্শ। এ ছাড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শের দ্বারাও বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছে শিক্ষার পরিকল্পনা এবং তার ভাবধারা। বিশেষ ক'রে মনীষীদের ব্যক্তিগত মতবাদের সোনার কাঠির স্পর্শে কেমন ক'রে যে ঝিমিয়ে-আসা শিক্ষার প্রাণ-শক্তি সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন যুগের চিন্তা-নায়কদের বিষয় একটু আলোচনা করলেই তা টের পাওয়া যাবে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিষয় কিছু আলোচনা করতে গেলেই সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল-এর কথা এসে পড়ে। এঁদের নিয়েই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রাচীন ইতিহাস গড়ে উঠেছে। সক্রেটিসের মতবাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিক্ষার সমন্বয় করার বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়। রাজ্য-শাসন ব্যাপারে প্লেটো ব্যক্তি-প্রাধান্যকে অস্বীকার করলেও, শিক্ষা বিষয়ে কিন্তু তিনি সক্রেটিসের

প্রতিধ্বনি ক'রেই বলেছেন : 'Co-ordination of individual and social education.' ফ্রান্সের কলুনিসের প্রচেষ্টায় ঐ শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলনের প্রথম সূত্রপাত দেখা যায়। এক্ষেত্রে মিলটন ও লকের নামও উল্লেখযোগ্য। এঁদের আদর্শবাদী বললেই ভাল হয়। লকের ধারণা ছিল যে, শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র দায়ী নয়, সে দায়িত্ব অভিভাবকদের।

শিশুশিক্ষার পথপ্রদর্শক হিসাবে কমেনিয়াস্-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বয়স অনুসারেই শিশুশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে তিনি মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছেন : যথা, ৬—১২ বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা, ১২—১৮ মাধ্যমিক শিক্ষা, ১৮—২৪ উচ্চতর শিক্ষা। তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্র-প্রভাব মুক্ত ক'রে শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সর্বসাধারণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তিনি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, প্রতি গ্রামে শিশুকেন্দ্রিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, জেলায় জেলায় থাকবে উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রদেশে প্রদেশে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর শিক্ষা-প্রণালীকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা চলে : যথা, (১) পারিপার্শ্বিক বিষয়ে শিক্ষাদান অর্থাৎ পরিবেশ-পরিচিতির সঙ্গে শিশু যে জ্ঞান লাভ করে, সেখান থেকেই আরম্ভ হবে শিশুর শিক্ষা ; (২) শ্রম শিক্ষা ; (৩) কথা ও গল্প বলতে বলতে শেখাতে হবে শিশুদের ; (৪) নীতিজ্ঞান শিক্ষা ; (৫) স্বাস্থ্যসংরক্ষণ শিক্ষা। এমনি ক'রে সর্ববিষয়ে শিক্ষা দিয়ে happy child গড়ে তোলার দায়িত্বই হচ্ছে প্রত্যেক জননীর অবশ্যকর্তব্য। এখানেই তাঁর মতবাদের মধ্যে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রচ্ছন্ন আভাস মেলে। তিনি বলতেন যে, লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিশুকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, তবে শিশুর কোন অসৎ অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হলে শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে।

কমেনিয়াসের পর রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) নাম উল্লেখযোগ্য। শিশু-শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর বিশেষ স্থান আছে। তিনি শুধু শিক্ষাকে জীবন-কেন্দ্রিক করতে চান নি, জীবন-সমস্যার সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র রচনা করতে

চেয়েছিলেন। মিসেস্ ফ্রেডিকা ম্যাগ্ডোনাল Rights of Children-এ শিশুর ন্যায্য দাবীর কথা পেশ করেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থাকে রুশো কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'এমিলি' গ্রন্থে ধনীদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা আলোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি তুরকম শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন—(১) অসামাজিক (anti-social or negative education), (২) সামাজিক শিক্ষা। তিনি আরো বলেছেন যে, প্রকৃতির কাছ থেকে বস্তুজ্ঞানের অভিজ্ঞতায় শিশু শিক্ষা লাভ করবে। ধনীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলেই চলবে। কারণ, সমাজের উচ্চ স্তর থেকে শিক্ষার আলো এসে দরিদ্রদের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর ক'রে দেবে। আর একটি পুস্তকে তিনি বলেছেন, শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, শিশু যেন ভবিষ্যতে আনন্দ পায়। "দি নিউ হেলিশ" পুস্তকে তিনি মার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, শিশু যে শিশুই, এই মনোভাব যেন শিশুর মনে জাগরূক থাকে।

উক্ত তুরকম শিক্ষা ছাড়াও তিনি প্রতিশোধক শিক্ষারও উল্লেখ করেছেন। শিশু হবে বস্তু-প্রয়োজনের অধীন, অভিজ্ঞতাই হবে তার শিক্ষার উপায়। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিক্ষার প্রচলনের পক্ষপাতী নন; এমন কি তিনি এ শিক্ষাকে শিশু-মনের উপর জোর ক'রে চাপাতে চান নি। এক কথায় তিনি ছিলেন নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-পদ্ধতির বিরোধী। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই তিনি শিক্ষার মুক্ত-বাতায়ন বলে স্বীকার করেছেন। সর্ব বিষয়ে, বিশেষ করে শিক্ষায় শিশুর অগাধ স্বাধীনতা দেওযার কথা তিনি বলে গিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতা মানে যে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, সে বিষয়েও তিনি সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

রুশোর পর পেষ্টালথ্সির নাম উল্লেখযোগ্য। রুশোর মত তিনি প্রকৃতির অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করেন নি। শিক্ষা ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষকদের সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন নেপথ্যে। তাঁর শিক্ষার মধ্যে

নূতনত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও শিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) জন্য তাঁর শিক্ষা-প্রণালী সফল হয় নি। তিনি বলেছেন যে, ছেলেদের দ্বারাই শিক্ষাকার্য চলবে, শিক্ষক কেবল উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষা দেবেন। পেষ্টালথ্‌সির শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার ভিতর দিয়ে প্রকৃত মানুষ গড়ে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে দেহ, মন আর আত্মার মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য। তিনি আরও বলেছেন যে, জীবনের ভবিষ্যৎ-প্রস্তুতির জন্যই শিক্ষা। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার শুরু হবে। এখানে অযথা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে; ফলে কল্পনার বিকাশের কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেছেন যে, অভিজ্ঞতা থেকেই শিশুরা বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি নাম ও সংখ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করবে। তিনি object lesson-এর পরে formal teaching-এর স্থান নির্দেশ করেছেন। রুশোর মত তিনি প্রকৃতির অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করেন নি, কিন্তু নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েই তিনি বলেছেন যে, 'Education must be spiritual rather than being guided by blind nature."

এর পর আসেন জন ফ্রেডেরিক হারবার্ট (১৭৭৬-১৮৪১)। তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে শিক্ষার বাহন ব'লে মনে করতেন। আত্মা ছিল তাঁর কাছে এক অখণ্ড বস্তুরূপে। তিনি বলতেন, বস্তুলব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই পরিবেশের জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হবে। উপস্থাপিত বিচিত্র বস্তুজ্ঞান থেকেই শিশুরা সাধারণীকরণ (generalisation) শিক্ষা করবে। অথচ শিক্ষা বিষয়ে তিনি শিশুর চেয়ে শিক্ষকের প্রাধান্যই দিয়েছেন বেশী। শিক্ষাকে তিনি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন: যথা, (১) প্রস্তুতীকরণ, (২) উপস্থাপন, (৩) যোগাযোগ স্থাপন বা পরিচিতি, (৪) সাধারণীকরণ, এবং (৫) প্রয়োগ।

ফ্রেড্রিক ফ্রয়েবেলই (১৭৮২-১৮৫২) সর্বপ্রথম শিশু-প্রাধান্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন শিক্ষার ভিত্তি। তদানীন্তন প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে এ যেন শিক্ষা-সংস্কারের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা। তাঁর কর্মকেন্দ্রিক কিন্ডার-

গার্টেন শিক্ষা সভ্য জগতে যুগান্তর এনেছে। তিনি মনে করতেন যে, খেলাধূলা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে যে শিক্ষায় শিশুর অনুরাগ বৃদ্ধি হবে, সেই হবে শিশুর সত্যিকার শিক্ষা। মনীষী কাণ্ট, হেগেল, রুশো প্রভৃতির প্রভাব তাঁর শিক্ষা-দর্শনের মধ্যে বিদ্যমান। তিনিই কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রবর্তক। কিন্ডারগার্টেন অর্থাৎ শিশুদের আনন্দ-উদ্যান, যেখানে শিশু অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে, খেলার মধ্যে নিত্য নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে। তিনি আরও বলেছেন যে, বস্তুমাত্রের উৎস হচ্ছে সেই পরম ভগবান ; কাজেই, সমস্ত কিছুর মধ্যেই সেই অন্তর্নিহিত সদ্‌বৃত্তি প্রভাব বিস্তার করবে। তাই তিনি বলেছেন যে, শিশু-শিক্ষার স্বাধীনতা থাকলেও, মাঝে মাঝে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার মত পরিচালকের প্রয়োজন। জীবনব্যাপী যে ভাঙ্গাগড়া চলছে, তার মধ্যেই রয়েছে অনুশীলনের তিনটি স্তর। যথা—স্বাভাবিক স্তর (natural stage), (২) শিক্ষার স্তর (educational stage) এবং নির্দেশের স্তর (instruction stage)। এ ছাড়া তিনি পাঁচটি অবদানের কথা বলেছেন :—

প্রথম অবদান	—	৩টি উলের বিভিন্ন রং-এর বল
২য়	„	৬টি ছোট উলের বল
৩য়	„	১ কাঠের গোলা বা কিউব
৪র্থ	„	„ „ এবং সিলিন্ডার
৫ম	„	২ „ কিউবের ৮টা ভাগ

এই অবদানগুলি দিয়ে যে কাজ হয় তাকে occupation wall অর্থাৎ বাড়িঘর প্রভৃতি তৈরী করাকে প্রস্তুতীকরণের কাজ বলা চলে। এছাড়া কাদার কাজ, চিত্রাঙ্কন, কাগজের কাজ প্রভৃতির সুযোগও আছে এই শিক্ষা-ব্যবস্থায়। এই ধরনের খেলা হবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। কারণ স্বেচ্ছিক খেলা থেকেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাই শিশুর খেলা সম্বন্ধে তিনি বড় গলায় প্রশংসা করে বলেছেন—"Play is the highest achievement in the child's development."

এর পরেই মন্তেসরির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁর আবির্ভাব-কাল হচ্ছে ১৮৭০। তিনি ইতালীর বিভিন্ন বস্তির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বিদ্যালয় খোলেন। ফ্রয়েবেলের চেয়ে তিনি শিশুদের স্বাধীনতা দিয়েছেন অনেক বেশী। ব্যক্তি-শিক্ষার উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। তাঁর বিদ্যালয়ের নাম ছিল শিশু-সদন। তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বলত ডিরেক্টর। তিনি বলেছেন যে, অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে এলে আপনা থেকেই কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা আসে। শৃঙ্খলার জন্য বিধি-বিধানের বিশেষ প্রয়োজন নেই। তিনি শিক্ষার কতকগুলি উপকরণের কথাও উল্লেখ করেছেন; যথা—কাঠের সিলিণ্ডার, বোতামের ঘর, উলের বল, রঙিন পুতুল প্রভৃতি। বস্তু-জগৎ শিশুর কাছে অনির্বচনীয় বিস্ময় আর অব্যক্ত আনন্দে ভরা। তাঁর শিক্ষাদান রীতিটি এমন স্বাভাবিক যে, সে পদ্ধতিতে three R's-এর জ্ঞান দেওয়া সহজ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর জোর দেওয়ার ফলে তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কল্পনার স্থান নেই।

ডিউয়ি কিন্তু হাতে-কলমে শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, প্র্যাগ্‌মেটিক চিন্তাধারা ইচ্ছাশক্তির আনুগত্য স্বীকার করবে। এক কথায়, তাঁর শিক্ষা-দর্শন হচ্ছে Pragmatism, instrumentalism. এই নীতি সত্য, সততা প্রভৃতিকে অস্বীকার করেছে। তাঁর মতে দীর্ঘ কর্ম-প্রবাহের মধ্যে জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। মনুষ্যের মধ্যে চিন্তাশক্তি আছে বলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারাই মানুষ জ্ঞানার্জন করে। এঁর অনুচরেরা project methodকে অনুসরণ করেছেন শিক্ষার মূল ভিত্তিরূপে। তাঁদের চূড়ান্ত অভিমত এই যে, বাস্তব অভিজ্ঞতাই জ্ঞানার্জনের প্রথম সোপান, কল্পনা সেখানে অবান্তর; কিন্তু অনেকে বলেন যে, শিক্ষাকে এমন ক'রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ফলে এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় কল্পনার প্রসার ব্যাহত হয়েছে। এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় আর যা-ই থাক, শিশুর ভাবাবেগ প্রকাশের স্থান নেই। তিনি আরও বলেছেন যে, শিক্ষার মধ্যে থাকবে উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা,

বিচারশক্তি এবং সম্পাদনা। এ ছাড়া তিনি মনের ধীশক্তি, আত্মবিশ্বাস, সহযোগিতা, আত্মবিচার, নির্ভুল চিন্তা, সৌন্দর্য-তত্ত্ব-জ্ঞান, বস্তুসমতা ও স্থৈর্য প্রভৃতি ১৮টি গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। হস্তশিল্পের মধ্যে তিনি চারুশিল্পের কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হাতেকলমে কাজ করার ফলে যে পর্যবেক্ষণশক্তি, বিচার ও বিবেচনা-শক্তি, সৌন্দর্য-জ্ঞান, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে শুধু নির্ভুল জ্ঞান জন্মে না, আত্মশক্তিও বিকশিত হয়ে ওঠে।

ষোড়শ শতাব্দীতে কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। টোল বা মক্তবের সেই গতানুগতিক শিক্ষার ক্ষীণ দীপ-শিখা তখন অশিক্ষার গাঢ় তমিস্রা দূর করতে পারে নি। আকবরের আমলে অবশ্য কিছুটা শিক্ষার চর্চা দেখা যায়, কিন্তু শিক্ষা প্রসারের কোন ব্যাপক প্রচেষ্টা হয়নি। তবে সে যুগে যে বিদ্যা-চর্চার রেওয়াজ ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে জমি জরিপ শিক্ষা, ধর্মচর্চা, পাঠাভ্যাস ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল—আকবরের রাজসভা-ই তার নিদর্শন। ঔরঙ্গজেবের আমলে কিন্তু হিন্দু-প্রতিভার শ্বাসরোধ করা হয়েছিল। তখন অবশ্য উর্দু ভাষাই ছিল শিক্ষার বাহন। টোল এবং চতুষ্পাঠীর শিক্ষা তখন প্রায় সীমাবদ্ধ হয়েছিল মক্তবে, মসজিদে ও মাদ্রাসায়। এর মধ্যে অবশ্য পর্তুগীজ ধর্মযাজকগণ এ দেশের লোকের মধ্যে ধর্মপ্রচারের নামে কিছুটা শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে জেভিয়া, ডিমোবেলি প্রভৃতির নাম করা চলে। এই প্রসঙ্গে সেণ্ট মেরীর দাতব্য বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। টমাস মণ্টোর চেষ্টায় দেশী বিদ্যালয়গুলির তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল। মাদ্রাজ, বম্বে প্রভৃতি অঞ্চলেও কিছুটা শিক্ষা প্রচলনের উদ্যম দেখা যায়। এর পরবর্তী যুগে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যুগ-সংস্কারকগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই তার প্রধান উদ্যোক্তা। সিভিলিয়ান কর্মচারীদের বাংলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মিশনারী কেরী সাহেবের প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। তাঁদের প্রভাবে এ দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাবধারা বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। এই শিক্ষার ফলস্বরূপ আমরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীদের সাক্ষাৎ পাই। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দানও বড় কম নয়। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে রবীন্দ্রনাথ শুধু কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেননি, সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন—শ্রীনিকেতনের কর্ম-পরিকল্পনায়। আশ্রম-আশ্রয়ী বৈদিক শিক্ষার আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন শান্তিনিকেতনের। সরকারী প্রচেষ্টায় কবিগুরুর সেই দ্বৈত আদর্শের সমন্বয় দেখা দিয়েছিল বিনয়-ভবনে।*

ভারতবর্ষে যে উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও, শিক্ষার আদর্শ কিন্তু সফল হয়নি। তাই সে অসম্পূর্ণ পুঁথিগত শিক্ষা মনের খোরাক কিছুটা যুগিয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের কোন প্রয়োজন মেটাতে পারেনি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, অশিক্ষায়, কুশিক্ষায় কী নিদারুণ অর্থনৈতিক সমস্যায় জাতীয় জীবন কত দুর্বল, অসহায় হয়ে পড়েছে, তা গান্ধীজী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই আজীবন রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও, তিনি শুধু ভারতীয় শিক্ষার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান নি, এদেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছেন। দেশের পরিস্থিতি এবং জীবন-সমস্যার কথা চিন্তা ক'রে, জাতীয় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে

* অবশ্য এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে। বিনয়-ভবন এখন পুরাপুরি বি-টি কলেজে রূপান্তরিত হ'য়েছে।

শিক্ষা-পর্বকে তিনি এমন সহজ এবং কার্যকরী ক'রে তুলতে চেয়েছেন যে, শিক্ষা আপনা থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। তবেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হবে ; এবং ভবিষ্যতে তার মনের ও প্রাণের চাহিদা মিটবে। সে শিক্ষা হবে হাতে-কলমে অর্থাৎ শিল্পকেন্দ্রিক। তাই শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, "By education I mean an all-round drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit......Literacy in itself is no education, I would, therefore. begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training." কাজের মাধ্যমে এবং মাতৃভাষার সাহায্যে এই শিক্ষা দেওয়া হবে। তাঁর এই শিক্ষা-পদ্ধতি ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা নামে অভিহিত। ১৯৩৭ সালে তাঁর সভাপতিত্বে ওয়ার্ধা শিক্ষা-সম্মেলনে বিশিষ্ট শিক্ষা-বিদ্‌দের এক সভায় এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ওয়ার্ধার শিক্ষা-সম্মেলনের ভিতর দিয়েই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়। সেই সম্মেলনে শিক্ষাবিদ্‌রা এই শিক্ষার মূলনীতিকে স্বীকার ক'রে নেন এবং অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌ ডাঃ জাকির হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন ক'রে তারই উপর এর পরিকল্পনা রচনার ভার দেন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সেবাগ্রামে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিহার, বম্বে, আসাম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেন্টের তরফ থেকেও বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা চলতে থাকে। ১৯৩৮ সালে ডাঃ জাকির হোসেন প্রণীত পাঠ্যক্রম কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মারফতে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ সংগঠিত হয়। সেই অবধি উক্ত প্রতিষ্ঠান বুনিয়াদী বিদ্যালয়-স্থাপন এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কার্যে নিযুক্ত রয়েছে।

এই শিক্ষা-পদ্ধতি শীঘ্রই দেশের প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের হিড়িকের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা কিছুদিনের মত মুলতুবী থাকে। যুদ্ধের পর সমাজের অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষারও যে আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, তা সকলেই উপলব্ধি করেন। তখন ভারত-গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন সার জন সার্জেণ্ট। তাঁরই নেতৃত্বে দেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে এই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতিকে গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-ব্যবস্থায় কি ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হবে, তার একটা পরিকল্পনা তৈরী করেন। ১৯৪৪ সালে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়—এরই নাম সার্জেণ্ট পরিকল্পনা। কাজের মাধ্যমে শিশুমনের চাহিদা অনুসারে শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থার কথাও এখানে বলা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা-পর্বকে এখানে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা—প্রাক্‌-প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদী, আর উচ্চ বুনিয়াদী। এ ছাড়া কারিগরী বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কথাও বলা হ'য়েছে। তবে এই বিশেষ শিক্ষা কেবলমাত্র কারিগরী বিদ্যালয়ের দক্ষ ছাত্রদেরই দেওয়া হ'বে। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা আরম্ভ হ'বে; এই হচ্ছে বর্তমানের নব-পরিকল্পিত কর্মকেন্দ্রিক শিশু-বিদ্যালয়ের কাঠামো।

আজ অবশ্য এই দুটি পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষিত মহলে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। তবে প্রথমেই এ কথা স্বীকার্য যে, সার্জেণ্ট পরিকল্পনা একেবারে নূতন পরিকল্পনা নয়, বরং ওয়ার্ধার মূল আদর্শ নিয়েই রচিত; কাজেই, সার্জেণ্ট পরিকল্পনা ওয়ার্ধা পরিকল্পনার নিকট ঋণী। তবে দুটি পরিকল্পনার মধ্যে মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে শিক্ষার ব্যয়ভার নিয়ে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় গোড়া থেকেই উৎপাদনাত্মক কাজের উপর জোর দেওয়া হয়েছে; সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় কিন্তু বলা হয়েছে যে, সৃজনাত্মক কাজের আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু-শিক্ষা আরম্ভ হবে; তা'তে শিশু যদি কিছু উৎপাদন করতে পারে ভাল, না পারলেও ক্ষতি নেই; কারণ, শিশু-

শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে কাজের প্রয়োজন, তাকে বড় ক'রে দেখলে, শিক্ষার দিকটা অবহেলিত হবার আশঙ্কা আছে ; তাই প্রথম থেকেই উৎপাদনের দিকে জোর না দিয়ে সৃজনাত্মক কাজকে এখানে বড় ক'রে দেখা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষাকাল আর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ দুটি পরিকল্পনার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় সমগ্র বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা এক এবং অবিভাজ্য, সার্জেণ্ট পরিকল্পনানুসারে কিন্তু তা নয়। দুই পরিকল্পনার মধ্যে আর একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে ইংরাজী শিক্ষা নিয়ে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় সমগ্র শিক্ষার মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই, কিন্তু সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ইচ্ছে করলে ইংরাজী শেখানো যেতে পারে, এই রকম একটা ব্যবস্থা আছে। সে যা-ই থাক, পরিশেষে এই কথা বলা চলে যে, আপাততঃ পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে উভয় পরিকল্পনাকেই গ্রহণ করা উচিত ; সম্ভব হলে অনেক স্থলে উভয় পরিকল্পনার মধ্যে যে সামঞ্জস্য হওয়া উচিত—প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্ মাত্রই তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

যে শিক্ষার মন্ত্রে জীবনের প্রথম দীক্ষা, মানুষের কাজকর্মে প্রতিনিয়তই প্রকটিত হচ্ছে, সেই শিক্ষার প্রভাব। তাই জীবনের প্রয়োজন যেমন বদলাচ্ছে, মানুষের মনোভাব যেমন রূপান্তরিত হচ্ছে শিক্ষা এবং তা'র আদর্শও তেমনি বদলাচ্ছে। যুগে যুগে শুধু যে শিক্ষার মোড় ফিরছে তা নয়, যুগের চাহিদাকে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কালজয়ী ক'রে রাখবার চেষ্টা করছে শিক্ষা। তাই যুগ-বিপ্লবে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শিক্ষা-বিবর্তনের ধারা। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন যুগের চিন্তানায়কদের মতবাদ নিয়ে একটু আলোচনা করলেই তা টের পাওয়া যাবে।

অনেকেই মনে করেন যে, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা নাকি অধুনাতন যুগের অভিনব পরিকল্পনা। এ অনুমান কিন্তু ঠিক নয়। ইউরোপের সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, রেনেসাঁস যুগ পর্যন্ত যে শিক্ষার ধারা চলে আসছিল, তা মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। ধর্মযাজকরাই তখন ছিলেন দেশের জনসাধারণের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক শিক্ষার একমেবাদ্বিতীয় গুরু। এক কথায়, গির্জার বাইরে শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিবর্তনের ছোঁয়াচ আনলেন মণ্টেন্। তিনিই প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সেই কর্মমুখর চঞ্চল জীবন্ত রূপটিকে। তাই তিনি শিক্ষা-পরিকল্পনার আলোচনা করতে গিয়ে বল্লেন যে, জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম ক'রে কাজকে অনুসরণ করতে হবে; কাজের মধ্য দিয়েই আহৃত জ্ঞানকে সহজে আয়ত্ত করা যায়। তা' ছাড়া আচার, আচরণ এবং অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে শিক্ষার ভাবধারাকে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার স্বপ্ন তাঁকে এতই অনুপ্রাণিত করেছিল যে, শিক্ষার এই প্রয়োজনীয় দিকটা তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন নি,

বরং তিনি জোর গলায় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচার করেছেন। বলেছেন: "Knowledge is to be assimilated, action is to be imitated, ideas are to be realised in conduct." তিনি আরো বলেছিলেন যে, পুঁথিগত বিদ্যাটাকে কণ্ঠস্থ ক'রে লাভ কি, যদি তা জীবনের কাজেই না লাগল? কাজের মধ্য দিয়ে-ই আয়ত্ত করতে হবে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে। তাই তাঁর মন্তব্যের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল—"A boy should not so much memorise his lesson or practice it, let him repeat it in his actions." এখান থেকেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সূত্রপাত এবং শিক্ষা ধর্মের আবেষ্টনী থেকে নেমে আসে বাস্তব জীবনের এলাকায়। ফলে, এখান থেকেই শিক্ষা-ব্যবস্থা বাস্তবাভিমুখী হ'তে আরম্ভ করে।

তারপর বেকন, কমেনিয়াস প্রভৃতি মনীষীরা প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা তুললেন। তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির উপর জোর দিয়ে বললেন যে, প্রত্যক্ষ স্পর্শানুভূতির দ্বারা আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, সেই জ্ঞানই হচ্ছে মানুষের আজীবনের চরম শিক্ষা। তাই তাঁরা মুক্তকণ্ঠে মন্তব্য করলেন যে, অনুভূতির অনুশীলনের দ্বারাই আয়ত্ত করতে হবে জ্ঞানকে। কারণ, "Knowledge comes through the senses, so education should be formulated on a training of sense perception rather than on pure memory activities. Education should be by observation, investigation and experimentation." অর্থাৎ অনুধাবন, অনুসরণ এবং পরীক্ষা নিয়েই শুরু হ'বে শিক্ষা।

এর পর যুগপ্রভাবী শক্তি নিয়ে এলেন মনীষী রুশো। তাঁর প্রকৃতি-কেন্দ্রিক (Nature-centred) শিক্ষা পরিণতি লাভ করে মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায়। শিক্ষাকে তিনি শিশুমনের বাইরের বস্তু ক'রে রাখেন নি, তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন শিক্ষা আর শিশুমনের মধ্যে মৈত্রীর সম্বন্ধ। শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে তাই তিনি বলেছিলেন, "Education should

not aim to instruct, but, simply, to allow natural tendencies to work out their natural results. Natural instincts and interests should control and establish close contact with nature, should furnish the occasion and means of education." রুশোর শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির মধ্যেই বর্তমান মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাধারার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি-ই প্রথম বলেছিলেন যে, শিক্ষাটা বাইরে থেকে আসে না, মনের মাঝেই প্রচ্ছন্ন আছে শিক্ষার বীজ। সুতরাং শিক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ছাঁচে ঢালাই করতে যাওয়াটা ঠিক নয়। তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, "Education is natural and not an artificial process. It is a development from within and not an accretion from without. It comes through the working of natural instincts and interests and not through response to external force."

পেষ্টালৎসি কিন্তু শিক্ষাকে জীবনের সংগে অবিচ্ছিন্ন করে দেখেছিলেন। শিক্ষার দ্বারা মানুষের জীবন যে কিভাবে প্রভাবিত হতে পারে, তিনি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে তাঁর কাছ থেকেই সর্বপ্রথম জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষার ইংগিত আসে। তিনি-ই বলেছিলেন যে, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সাধন-ই হবে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রত্যেকের মধ্যে যে শক্তি ঘুমিয়ে আছে, তাকে শিক্ষার যাদুস্পর্শে উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত করে তুলতে হবে। কাজের মাধ্যমে-ই এই ত্রিবিধ বিকাশ সম্ভব ; কাজেই, ছেলেদের হাতেকলমে শিক্ষানবিশী করবার সুযোগ দিতে হবে—এ সুযোগ মিলবে বিদ্যালয়ে। এখান থেকেই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা জন্মলাভ করে। এক্ষেত্রে তাঁর অভিমতই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন যে, "Education is but an organic development of the individual—mental, moral and physical. This development comes in each of these phase

through activities initiated by spontaneous desire for action." কাজের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিচালিত করতে পারলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে। তিনি আরো বলেছিলেন যে, উত্তম এবং প্রচেষ্টা থেকেই হবে জ্ঞানের প্রথম সূত্রপাত। কারণ, "Being and doing come before knowing." কাজেই, শিশুর শিক্ষার জন্য অফুরন্ত কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন যে, নব-পরিকল্পিত শিক্ষায়তনগুলি হবে কারখানা-সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়।

কাজের কথা অস্বীকার না করলেও হারবার্ট কিন্তু শিশুর আগ্রহের উপরই জোর দিয়েছিলেন বেশী। শিশুর কৌতূহল এবং আগ্রহ-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষেই তিনি ওকালতি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, শিশুর আগ্রহকে অনুধাবন করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেই শিক্ষা আপনা থেকেই ফলপ্রসূ হবে। তাই তিনি জোর গলায় জাহির করেছিলেন—"Instruction can be made educative through interest." অর্থাৎ কোন রকমে শিশুর আগ্রহকে জাগাতে না পারলে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাই তিনি বার বার এই কথাই বলেছিলেন যে, শিশুকে যদি শিক্ষা দিতে চাও, তবে তার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত, অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত কর। কারণ, ঐ প্রবৃত্তি-ই হচ্ছে শিশু-শিক্ষার ভিত্তিভূমি। আর শিক্ষার জন্য প্রথম প্রয়োজন কি, তার উত্তরে বলেছিলেন, "The arousal of interest is the primary factor in education." শুধু ইন্দ্রিয় জাগরণের কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, তিনি সর্বপ্রথম অনুবদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার কথাও উত্থাপন করেছিলেন।

ফ্রেডিক ফ্রোয়েবেল-ই শিশুদের নিয়ে এলেন শিক্ষার পুরোভাগে। তিনিই সর্বপ্রথম শিশুর প্রাধান্যের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন শিক্ষার ভিত্তি। তদানীন্তন শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ যেন শিক্ষা-সংস্কারের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা। শিশুর শিক্ষার জন্য গোড়া থেকে মাথা ঘামাতে হবে না; শিশুর যখন অনুরাগ উন্মুখ হয়ে উঠবে, তখন-ই শুরু হবে তার সত্যিকার শিক্ষা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের এমন অবাধ স্বাধীনতা আর কেউ দেন নি। তিনি-ই 'কিন্ডারগার্টেন' শিক্ষার প্রবর্তক। কিনডারগার্টেন অর্থাৎ শিশুদের আনন্দ উদ্যান—যেখানে শিশুরা অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে, খেলার মধ্যে নিত্য নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, বস্তু মাত্রের-ই উৎস হচ্ছে সেই পরম শক্তি ভগবান—কাজেই সমস্ত কিছুর মধ্যেই সেই অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তি প্রভাব বিস্তার করবে। যদিও তিনি শিশুদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার জন্ম ওকালতি করেছেন, তথাপি তিনি একথাও বলেছেন যে, শিশু-শিক্ষায় স্বাধীনতা থাকলেও, মাঝে মাঝে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার মত পরিচালকের প্রয়োজন। মানুষের জীবনব্যাপী যে ভাংগাগড়া চলেছে, তার মধ্যেই রয়েছে শিক্ষার তিনটি স্তর—যথা প্রাকৃতিক (natural), উপদেশক (instructional) ও শিক্ষণাত্মক (educational)। তিনি আরো বলেছেন যে, বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজ-কর্মই হবে স্বতঃপ্রণোদিত এবং শিশুর জ্ঞান ও পরিকল্পনা এক একটি কাজের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ, "The work of the school must be based upon selfactivity and must be culminated in the expression or use of the ideas or knowledge acquired in the process of activity." এক কথায় বলা চলে যে, অধুনাতন যুগের কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষা তাঁর আমল থেকে যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে।

অনেকে তাই মনে করেন যে, রুশো থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু শিক্ষাবিদের মতবাদের সমন্বয় বিধান করেই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের উৎপত্তি। উনবিংশ শতাব্দীতেই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মন্তেসরি-শিক্ষা-পদ্ধতির প্রথম প্রচলন দেখা যায়। ফ্রোয়েবেলের সেই শিক্ষা-স্বপ্নকে তিনি বাস্তব রূপ দান করেন। শিশু-শিক্ষায় তিনিই নূতন ভাবধারার সৃষ্টি করে যুগান্তর আন্‌লেন। তিনি শিশুদের ইচ্ছামত কাজের উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, "Freedom in education is a necessary condition of growth and development."

এই স্বাধীনতা এবং বিচিত্র কাজকর্মই শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সহায়তা করে। তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে নজর রেখে-ই শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর স্বৈচ্ছিক কাজের মধ্যে সূচনা হবে তার প্রাথমিক শিক্ষা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই শিশুরা সরাসরি জ্ঞানলাভ করবে আর পরিবেশ-পরিচিতিও হবে শিশু-শিক্ষার অংগ। তা ছাড়া শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে শিশুর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে হবে। শুধু এ দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে না, প্রতিনিয়ত শিশুর আচার-আচরণ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ভালভাবে জানতে হবে শিশুদের। এই স্বভাবসিদ্ধ-পদ্ধতির উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অবশ্য ডিউয়ির দানে-ই সমধিক পরিপুষ্ট। এই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার যা কিছু উন্নতি হয়েছে তাঁরই আমলে। তিনি মনে করতেন যে, শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিপুষ্টির মধ্য দিয়ে-ই শিশুর ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধিত হয় সহজে। সুতরাং শিশুর অনুরাগ, শিশুর আগ্রহকে উপেক্ষা করাটা কখন-ই উচিত নয়। নানা প্রকার প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে হাসি-গল্পের ছলে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে যে, সে জানতেই পারবে না, তাকে কিছু শেখান হচ্ছে। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন যে, প্রীতিকর সংকেত থেকেই শুরু হবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা। অর্থাৎ "It is only through the satisfaction of child's natural interest that personality will be harmoniously developed. Let the children be free, ask questions, investigate with a variety of tools to build, dig, sew and so on."

কাজেই শিশু-শিক্ষা আরম্ভ হবে কোন একটা কাজকে কেন্দ্র করে। শিশুরাই শিক্ষার জীবন্ত বিষয়বস্তু। শিক্ষা-যজ্ঞের সমস্ত আয়োজনই হবে শিশুকে কেন্দ্র করে—তারাই হবে যজ্ঞের প্রধান হোতা এবং পুরোহিত—শিক্ষকেরা শুধু পরিবেশ সৃষ্টি করে সেই প্রয়োজনের আয়োজন করবেন, এই

মাত্র। তাঁদের কর্তব্য হবে…"to direct the interest of the children to a higher plane of intellectual development." অর্থাৎ শিশুর কৌতূহল, তার আগ্রহ আর অনুরাগ, যাতে নানা অভিজ্ঞতার দেউড়ি পার হয়ে মননশীলতার রাজ-দরবারে গিয়ে পৌছতে পারে, সেই দৌবারিকের কাজ করবেন শিক্ষকরা।

এখন পাশ্চাত্ত্য থেকে প্রাচ্যের শিক্ষাজগতে ফিরে আসা যাক। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন বৈদিক যুগে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার-ই রেওয়াজ ছিল। ছাত্ররা তখন গুরুগৃহে থেকেই শিক্ষা করত; পঠন-পাঠনের সংগে সংগে নিজের হাতেই তাদের সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম-ই করতে হতো। লেখাপড়া শিক্ষার সংগে তারা স্বাবলম্বী ও শ্রম-সহিষ্ণু হয়ে উঠতো। অন্ন-বস্ত্র ও আবাসের উপযোগী সমস্ত শ্রম এবং শিল্প-কাজ-ই তাদের করতে হতো। এক কথায় চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত সকল বিদ্যায় তারা পারদর্শী হয়ে উঠতো। পঠন-পাঠন ছাড়াও তাদের দৈনন্দিন কার্যস্থচীর অংগীভূত ছিল শরীরচর্চা ও দৈহিক শ্রমের কাজ। অর্থাৎ তখন দৈহিক ও মানসিক দুটো শিক্ষা-ই চলতো পাশাপাশি।

ভারতীয় সাধনার এই ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রচেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বোলপুরে ভারতীয় আদর্শে দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তিনিই প্রথম অধ্যাপনার কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি শ্রেণী-কক্ষের পাষাণ দুর্গ থেকে ছাত্রদের মুক্তি দিয়েছিলেন গাছের ছায়াতলে। তিনি শিক্ষার বাঙ্ময় ও কর্মময় ধারাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তাই তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনের বীণার ঝংকার তুলেছিলেন বেদের ওঙ্কার ধ্বনিতে, আর শ্রীনিকেতনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বিশ্বকর্মার হাতুড়ী। শিশু-শিক্ষার দিকেও তিনি সজাগ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। শিশু-শিক্ষার সংস্কারের জন্য সকলকে আহ্বান করে বলেছিলেন যে, শিশু-শিক্ষার জন্য নূতন করে আয়োজন করতে হবে। দেশে যে শিক্ষা

চলছে, সে মামুলী শিক্ষার জগদ্দল পাষাণ ভার চাপিয়ে অবুঝ শিশুদের শ্বাসরোধ করো না। বিদ্যালয়কে খেলার মাঠে রূপান্তরিত করো। "খেলার জগৎ হতে শিশুকে বিদ্যালয়ের কঠিন কোণে নির্বাসিত করো না; তা হলে তার জীবন-সংগীতে ছন্দপতন হয়ে যাবে।"

গান্ধীজীও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছিলেন। তাই তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ভারতীয় আদর্শে গ্রাম উন্নয়ন ও বিদ্যালয় সংগঠন করতে চেয়েছিলেন। সেবাগ্রামে তাঁর সে প্রচেষ্টার সাক্ষ্য আজও বিদ্যমান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অর্থকরী শিল্প-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ই হবে দুঃস্থ দরিদ্র ভারতবাসীর জীবন-সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত শিক্ষা। অন্ন, বস্ত্র ও আবাস সংস্থানের জন্য এমন কতকগুলি অপরিহার্য হস্ত-শিল্পের প্রচলন করতে হবে, যাতে দেহ, মন ও প্রাণের ক্ষুধা মেটে। শৈশব থেকেই শিশুদের হাতে-কলমে কাজ করবার সুযোগ দিলে, শিশু যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। এবং সেই শিক্ষা-ই হবে শিশুর অন্তরের শিক্ষা। তাই শিশু-শিক্ষার এই কাজের দিকটার উপর জোর দিয়ে-ই তিনি বলেছিলেন যে, "শিশু-শিক্ষা চলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায়; তাই তার শিক্ষা হওয়া উচিত—কোন একটি হস্তশিল্পের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়-লব্ধ শিক্ষায় অভিজ্ঞতা মিশ্রিত থাকে বলে এ শিক্ষা শিশুর পক্ষে হয় জীবন্ত।" শুধু তাই নয়, যখন থেকে শিশু উৎপাদন করতে শিখবে, তখন থেকেই শুরু হবে তার শিক্ষা। তার আগে নয়।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার কয়েক বছর পরেই সার্জেণ্ট পরিকল্পনার উদ্ভব। তবে এ পরিকল্পনাটি মৌলিক নয়, ওয়ার্ধা পরিকল্পনার-ই নামান্তর মাত্র। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষে পাঁচ বছরের মেয়াদে যে শিক্ষা পরিকল্পনার খসড়া রচিত হয়েছিল, তা সার্জেণ্ট সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাই এই শিক্ষা-পরিকল্পনা সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা নামে অভিহিত।

এই পরিকল্পনায় একাধিক কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে মনোবিজ্ঞানসম্মত অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ওয়ার্ধা ও সার্জেণ্ট পরিকল্পনার যা কিছু ভাল, তার সারাংশ নিয়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কর্ম-কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন—তা প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষা নামে অভিহিত। এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের প্রয়োজন। সেইজন্য গত ছয় বৎসর পূর্বে বাণীপুরে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় খোলা হয়েছে। কর্ম-কেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের এই হচ্ছে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার তিনটি দিক

শিক্ষার দুটি দিক আছে—একটি জ্ঞান, অপরটি বিজ্ঞান। জ্ঞান সংগ্রহ করে, বিজ্ঞান করে প্রয়োগ। জানার ভাণ্ডার পূর্ণ করে জ্ঞান যখন কেবলি সঞ্চয়ের চাবি আঁটে, বিজ্ঞান তখন তারি ব্যবহারিক জ্ঞানকে কাজে লাগায়। এই প্রয়োগ বা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, কেতাবী শিক্ষার মধ্যে কিন্তু তেমন করে শিশুর মন সাড়া দেয় না; কাজেই সেখানে শিশুর জানার মধ্যে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। কারণ শিশুমন যখন নানা পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখে, তার সমস্ত অংগপ্রত্যংগ যখন কাজের জন্যে আগ্রহোন্মুখ, তখন তাকে নীরস বইয়ের পাতার মধ্যে আটকে রাখলে তার স্বাভাবিক বিকাশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এই জন্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষার ব্যবহারিক বা বৈজ্ঞানিক দিকটার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিশু-শিক্ষায় কাজ অপরিহার্য। শিশু

মাত্রই যে কাজের জন্ম পাগল, তা নয়, পৈশিক অনুভূতি থেকেই তাদের প্রথম বস্তুজ্ঞান জন্মে। কাজেই শিক্ষার বিষয়গুলিকে যতদূর সম্ভব বস্তুগ্রাহ্য অনুভূতির মধ্যে দিয়ে শিশুর কাছে এমন লোভনীয়ভাবে পরিবেশন করতে হবে, যাতে জানার জন্যে শিশুর কৌতূহল ও প্রেরণা দুই-ই সজাগ হয়ে উঠে। শিশুর এই মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলির উদ্ভব হয়েছে। কর্ম-কেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য কাজের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া— যাতে একান্ত স্বাভাবিক উপায়ে প্রত্যেকটি শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে, শিশুর সম্যক্ বিকাশ সাধন করা। শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্মেষ বলতে বুঝায় শিশুর (১) দৈহিক, (২) মানসিক ও (৩) সামাজিক পরিণতি। কাজেই মানব জীবনের ঐ তিনটি স্তরের উপরই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে।

॥ সামাজিক ভিত্তি ॥

প্রথমেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সামাজিক ভিত্তির কথা আলোচনা করা যাক। কাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলি। এখানে কাজের অফুরন্ত সুযোগের মধ্যে শিশু যে শুধু কাজের আনন্দে বিভোর হয়ে উঠে তা নয়, সে কারিগরী বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করে। সে শ্রমবিমুখ হতে পারে না, কাজের প্রতি তার আপনা থেকেই অনুরাগ জন্মে। সে আরও বুঝতে পারে যে, সমাজের প্রতিটি কাজ পরস্পরের সহযোগিতা ভিন্ন সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে না। স্পর্শানুভূতির মাধ্যমে শিশু-শিক্ষার গোড়া পত্তন হওয়া উচিত; কারণ, প্রীতিকর যে অনুভূতি শিশুর মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে, সেই অভিজ্ঞতাই শিশু-শিক্ষার আদিম প্রেরণা। শিশু-শিক্ষার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তাই ডিউয়ি বলেছেন যে, "Children learns through a series of satisfying experiences. Individuality develops through

experiencing.” কাজেই সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ না মিললে শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল ক্ষুণ্ণ হতে পারে। শিশুর সেই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যাতে তার শিক্ষার কাজে লাগতে পারে, সেইজন্য কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশু-প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে চপলমতি চঞ্চল শিশু তার অনেক চাহিদা-ই মেটাতে পারে, আর একটি কথা এই যে, কর্মমধুর এই সামাজিক পরিবেষ্টনী শিশুকে আকর্ষণ করে সব চেয়ে বেশী।

তা ছাড়া সেখানে হাতে কলমে শিশুরা যা অতি সহজেই শিক্ষা লাভ করে, তা প্রত্যেক শিশুর মনেই গভীরভাবে রেখাপাত করে। উপরন্তু, শিশুরা সমাজ, জীবনের বিচিত্র আচার, আচরণ এবং নানা প্রকার সদভ্যাস গঠনের অফুরন্ত সুযোগ পায়। সহযোগিতা, সহনশীলতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা শিশুদের জীবনকে সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। ফলে শিশুদের মধ্যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়ে উঠে—যেমন, পরস্পর মিলেমিশে কাজ করার অভ্যাস, অধৈর্য না হয়ে পালাক্রমে কাজ করতে শেখা, ঔচিত্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান এবং সামাজিক চেতনা সমস্ত দিকেই শিশু সক্রিয় সজীবতা লাভ করে। তাই এই আবাসিক ছাত্রসমাজে বাস করে শিশুমাত্রই উপলব্ধি করে যে, কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমন-ই যে, সেখানে কিছুতেই নিষ্ক্রিয় থাকা যায় না। যেখানে হাতুড়ির ঠকাঠক্ আওয়াজ চলেছে, ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করাতের শব্দ হচ্ছে, সেখানে আর যে-ই চুপ করে থাক না কেন, শিশুরা সেখানে কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। কাজ করার দুর্নিবার তাগিদে আপনা থেকেই শিশুরা কাজে মেতে ওঠে। এই কাজ করার স্পৃহাটাই শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তি। এ না হলে শিশুর জৈবিক ক্ষুধা মেটে না, তার পুঞ্জীভূত প্রক্ষোভও মুক্তির পথ খুঁজে পায় না, শিশুর পক্ষে সেই নিরলস, নির্জীব অবস্থাটা শুধু অভাবনীয় ও অবাঞ্ছিত নয়, অস্বাভাবিকও বটে। তাই সুসান আইজ্যাক বলেছেন যে, অংগসঞ্চালনটাই সুস্থ সবল শিশুর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক; কারণ, “Their muscles cry out for exercies their senses for experience.”

এ ছাড়া সমাজ-জীবনের ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে শিশুর মনে আসে অর্থ নৈতিক ধারণা। নিত্যনৈমিত্তিক লেন-দেনের মধ্যে শিশুরা আপনা থেকেই মিতাচারী ও মিতব্যয়ী হয়ে উঠে। তারা বুঝতে শেখে যে, উৎপাদনাত্মক কাজের দ্বারা সামর্থানুযায়ী সকলেই সমাজের কিছু না কিছু উপকার করতে পারে। তাই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের আদর্শ এই যে, এখানে বয়সানুসারে প্রত্যেকেই কাজ করবে। কেউ অলস ভাবে বসে কাটাতে পারবে না। কাজেই নিত্য নূতন অবদানে সমাজকে স্বাবলম্বী এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলা-ই ছাত্রদের প্রাথমিক দায়িত্ব। এই জন্যে প্রত্যেকটি শিশু-ই যেমন সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কঠোর শ্রম করবে, সমাজও তেমনি শিশুদের সুখসুবিধা, অভাব-অভিযোগ মেটাবার জন্য করবে চেষ্টা। তবেই সমাজ উন্নত হবে এবং ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির আত্মিক মিলন ঘটবে কাজের যোগসূত্রে। তাই বর্তমানকে অবলম্বন করে কাজ করতে হবে, ভবিষ্যতের আশায় বসে থাকলে চলবে না।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বুনিয়াদই হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। শিশুর মানসিক ও নৈতিক বিকাশ-ও মনস্তত্ত্বের আওতায় এসে পড়ে। এই কারণে বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলিই শিশু-শিক্ষার উপযোগী ; কারণ, শিশুর প্রাথমিক প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে-ই এগুলি পরিকল্পিত—এবং এগুলি সম্পূর্ণরূপে শিশুকেন্দ্রিক।

(১) এখন কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার নৈতিক ভিত্তির কথা আলোচনা করা যাক। শ্রমের মর্যাদাবোধ-ই কর্ম-কেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের নৈতিক ভিত্তি। এখানে শিশুরা শিক্ষা লাভ করবে যে, জগতের কোন কাজই ছোট নয়। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের তারতম্য থাকলেও প্রত্যেক কাজের মূল্য একই। ছোট বড় কাজে কোন মান-অপমান নেই। স্বহস্তে কাজ করার মধ্যে গৌরব এবং আনন্দ দু-ই আছে ; তা ছাড়া, কোন পেশা-ই ঘৃণ্য নয়। কারণ, নঈ তালিম সাফাইসে সুরু হোতী হ্যায়। অর্থাৎ সাফাইয়ের কাজ থেকে সুরু হবে নূতন শিক্ষা। আর এই নয়া শিক্ষায় সমাজ-ব্যবস্থা দেবে যথাযোগ্য শ্রমের মর্যাদা।

তা ছাড়া শ্রমকে ভালবাসতে শেখাবে, পারস্পারিক লেন-দেনের ভিত্তিতে বহুর মঙ্গলের জন্য একের আহুতিতে প্রতিষ্ঠিত করবে সার্বজনীন আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থাকে,—সেখানে অকারণ হানাহানি থাকবে না; একের লিপ্সা অন্যকে কলুষিত করবে না, স্পর্ধা বা অহঙ্কার কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করবে না; কারণ, সেখানে সকলের জন্য সমাজ, সমাজের জন্য সকলে।

(২) শিশুর মানসিক বিকাশই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, কাজগুলি তার গৌণ উপকরণ মাত্র। তাই প্রত্যেক কাজের অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে শিশুদের আত্মিক বিকাশের অজস্র সুযোগ দেওয়া হয়। যে-কাজ বা যে-পরিকল্পনা নিয়েই শিশু মেতে উঠুক না কেন, সব সময়ই শিক্ষকদের দেখতে হবে, কেমন করে কৌশলে শিশুদের সেই কর্মপ্রবাহকে তাদের লিখন, পঠন ও গণিত শিক্ষার এলাকায় নিয়ে যেতে পারা যায়া, অর্থাৎ শিশুদের লিখন ও পঠন ও গণিত শিক্ষার এলাকায় নিয়ে যেতে পারা যায়, অর্থাৎ শিশুদের লিখন ও পঠন শিক্ষা দেওয়া-ই হবে শিক্ষকদের প্রধান লক্ষ্য; পাঠদান পদ্ধতি অবশ্য হবে একটু স্বতন্ত্র ধরণের অর্থাৎ কর্মকেন্দ্রিক। শুধু কি তাই? বিধিনিষেধের কড়া শাসনে এখানে প্রতিপদে শিশুকে থামতে হবে না, শিক্ষকের কণ্ঠস্বর এখানে শিশুদের কণ্ঠরোধ করবে না—শিশু এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে আপন খেয়াল-খুশি অনুযায়ী নানা প্রকার খেলাধূলা আর কাজকর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, আনন্দের মধ্যে ডুব দিয়ে ভাবাবেগকে উন্মুক্ত করে দেবার পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। ফলে, এখানে শিশুর দেহ ও মন আপনা থেকেই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে।

দেহ এবং মনের সুসমঞ্জস বিকাশ সাধন-ই প্রকৃত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। কাজেই মানসিক উৎকর্ষের জন্য যেমন জ্ঞান ও ধ্যানধারণার প্রয়োজন, তেমনি দৈহিক পরিপূর্ণতার জন্য অংগ-সঞ্চালনও একান্ত অপরিহার্য। কর্মকেন্দ্রিক-শিক্ষা-পদ্ধতি এই সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাবৈজ্ঞানিকরা তাই বলেছেন যে, জৈবিক প্রয়োজনে শিশু মাত্র-ই কাজ ভালবাসে। প্রতি মুহূর্তের নিরুদ্ধ

হৃদয়াবেগ শিশু-মনের স্থৈর্যের বন্যা মুক্ত করে দিচ্ছে, বাইরের জগৎ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, তার ক্রমবর্ধনশীল অংগপ্রত্যংগ কাজের জন্য অস্থির হয়ে উঠছে—অফুরন্ত কৌতূহল এবং অদম্য অনুসন্ধিৎসা তাকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—এমতাবস্থায় শিশুকে কাজের পর কাজ দিতে না পারলে শিশু যে শুধু হাঁপিয়ে উঠবে তা নয়, তার আবেগের ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ই শিশুর সেই বিচিত্র চাহিদার খোরাক যোগাতে পারে। কাজেই, এই বয়সের ধর্মকে অস্বীকার করে যে শিক্ষাই দেওয়া হোক না কেন, তা কিন্তু শিশুরা কিছুতেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারবে না। তাই সুসান আইজ্যাক মন্তব্য করেছেন যে, "The end of education in these years is that the children should grow and develop and to this activity of one sort or another is the only key" অর্থাৎ শিশুর কর্মপ্রাণ মনকে মেনে নিয়েই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠেছে।

এ ছাড়া কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ, কর্মবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান-ই শিশু-শিক্ষার প্রথম সোপান। শিশুকে জানা থেকে অজানায় নিয়ে যাওয়া সহজ। অজানার অন্ধকারে শিশুমন এমন-ই দিশেহারা হয়ে পড়ে যে, তাকে জ্ঞানের সত্য পথের সন্ধান দেওয়া কঠিন। স্পর্শ করে, অনুভব করে, ফেলে, ভেঙেচুরে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে শিশুরা এই পৃথিবীকে জানতে চায়। পাওয়ার আনন্দ-ই শিশুকে পেয়ে বসে, তাই সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জিনিষের চেয়ে একান্ত কাছের পরিবেশ থেকেই প্রথম জানতে, বুঝতে, অনুভব করতে শেখে। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়েই শিশুরা সে সুযোগ লাভ করে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান শিশুর মনে দাগ কাটে,—তার আত্মতুষ্টি বিধান করে। তাই প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে, বিচিত্র ঘটনাপরম্পরায় শিশু যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা শুধু শিশুর কাছে চিত্তাকর্ষক নয়, সেই পরিবেশ-পরিচিতি-ই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অফুরন্ত

ভাণ্ডার। সেইজন্যে ডিউই বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি-ই শিশু-শিক্ষার চরম পন্থা। অর্থাৎ "Children learns through a series of satisfying experiences." প্রীতিকর যে-কোন অভিজ্ঞতাই শিশু-মনে অফুরন্ত প্রেরণা যোগায়।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সব চেয়ে বড় সুবিধা এই যে, এখানে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি শিশুর প্রতি-ই লক্ষ্য রাখা হয়। শিশুমাত্র-ই যে পৃথক, একজনের সঙ্গে অপরের কোন মিল নেই,—সুতরাং তাদের মনোভাবও যে আলাদা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শিশুর সে বিচিত্র চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে-ই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য নানা ধরণের খেলাধূলা, কাজকর্মের ব্যবস্থা করেছে। এখানে শিশুরা আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী কাজ ও খেলাধূলার সুযোগ পায়। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলি মেনে নিয়েছে যে, No two children are alike. সুতরাং শিশু-মনের বিচিত্র খেয়াল ও চাহিদার কথা চিন্তা করে-ই শিশু-মনস্তত্ত্বের এই বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত শিশু-শিক্ষার নিখুঁত কর্মপন্থা। গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার তুলনা করতে গিয়ে একজন বলেছেন যে, যে-শিক্ষা মনের কোন খোঁজ রাখল না, প্রাণের চাহিদা মেটাল না, দেহ-মনকে অস্বীকার করে জ্ঞান বিতরণ করল, রোগ নির্ণয় না করেই পথ্যের ব্যবস্থা করল, কেবল গুটি কয়েক মনে আলো জ্বাল্‌ল—কাজকে বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীর হাতে কেবল লেখনী তুলে দিল—সে শিক্ষা কিছু পরিমাণে নিরক্ষরতা দূর করল বটে, কিন্তু সে প্রায়শ অশিক্ষাই হয়ে রইলো। কারণ, যে শিক্ষায় জীবন উপকৃত হলো না, প্রাণের ক্ষুধা তৃপ্তি হলো না—সে শিক্ষা শিক্ষা-ই নয়।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষাই দেশোন্নতির মাপকাঠি। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় শিক্ষাসংস্কারের কথাটাই সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে। বিপ্লবের মধ্যেই মানুষ বুঝতে পারে যে, তার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোথায় যেন অসম্পূর্ণতা রয়েছে, তা না হলে দেশ জুড়ে এত অশান্তি কেন? এই জন্মেই দেখা যায় যে, নেপোলিয়ানিক মহাযুদ্ধের পর সমস্ত ইউরোপের পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ—এই দুই দেশেই শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আজ আমাদের দেশের অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্ মাত্রই উপলব্ধি করেছেন যে, এ জাতটাকে আর অশিক্ষার কুশিক্ষার নরককুণ্ডের মধ্যে তিলে তিলে মরতে দেওয়া চলবে না। গোটা জাতটাকে শিক্ষার ভিতর দিয়েই জীবনের অমরাবতীতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যার যেদিকে শক্তি, তাকে সেই দিকেই পরিচালিত করলে শিক্ষার সুফল পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই পরিচালনার জন্য সুপরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই ভারতের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির উপর শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার ন্যস্ত হয়। ফলে সমিতির প্রচেষ্টায় গান্ধীজীর প্রবর্তিত ওয়ার্ধা পরিকল্পনার আদর্শে একটি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতির নাম অনুসারেই পরিকল্পনাটির নাম করা হয় সার্জেণ্ট পরিকল্পনা। বস্তুতঃ এ পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ডের মনীষী ও শিক্ষাবিদ্‌গণের; পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষার অধ্যায়টি বিশেষভাবে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার নিকট ঋণী; শুধু তাই নয়, ওয়ার্ধার মূল আদর্শে-ই রচিত। সার্জেণ্ট সাহেব ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন, এ পরিকল্পনা প্রণয়নে তাঁর হাতও ছিল যথেষ্ট। তবে ভারতের অন্যান্য শিক্ষা বিভাগের বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে এই ব্যাপক রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভবপর হত না।

শিক্ষা-সংস্কারের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা নয়। এর আগে ভারতবর্ষে যে শিক্ষা-সংস্কারের কোন চেষ্টা হয় নি তা নয়, কিন্তু সে আন্দোলনে জাতীয়

চেতনার টনক নড়ে নি। তার কারণ শিক্ষার চারিদিকে ছিল একটা সংরক্ষণশীলতার গণ্ডি। ফলে পদে পদে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে ছিল। জাতীয় জীবনের পটভূমিকায় শিক্ষার কল্যাণময় মূর্তিটি আমাদের চোখে পড়ে নি। তাই শিক্ষার আলোয় গণ-মানস উদ্ভাসিত করবার এমন ব্যাপক প্রচেষ্টা আর কখনো হয় নি। সার্জেণ্ট পরিকল্পনা-ই কিন্তু সর্বপ্রথম সে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রাক্ পঠন অবস্থার শিশু-বিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্ব শ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থা-সম্বলিত সর্বাংগসুন্দর শিক্ষা-পরিকল্পনার এই প্রথম দলিল বলে, আজ সার্জেণ্ট পরিকল্পনার এত সমাদর।

শিশু মনস্তত্ত্বের উপরেই এ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কেমন করে শিক্ষাকে জীবনের সম্যক বিকাশের কাজে লাগানো যায়, বিচিত্র পরিবেশের সংগে কেমন করে প্রাণের যোগসূত্র রচনা করা চলে,—বিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক কৃত্রিমতাকে অপসারিত করে যে কি আনন্দের শিশু-জগৎ সৃষ্টি করা যায়—এ পরিকল্পনার মধ্যে আছে সেই সম্ভাবনার স্বপ্ন। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু যাতে অবহেলিত না হয়, যাতে তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধিত হয়, সে দিকে দৃষ্টি রেখেই সার্জেণ্ট পরিকল্পনা রচিত হয়েছে এবং শিশুর জন্য-ই শিক্ষা, শিক্ষার জন্য শিশু নয়—এই কথাটার উপর-ই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মোটামুটি প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে নিম্ন প্রাথমিক আর দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে উচ্চ বুনিয়াদী বা প্রাথমিক। শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছু একটা করতে পেলেই শিশুরা খুশী হয়, কাজেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাটাই হবে শিশু-শিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যে বয়সে তারা হাত পা নেড়ে চেড়ে কাজ করতে পেলে আনন্দে বিভোর হয়ে উঠে, সে বয়সে কেবল বইয়ের নীরস পাতার মধ্যে তাদের মনকে আটক রাখা কিছুতেই উচিত নয়। তাতে

শিশুর মানসিক বিকাশ সাধিত হলেও দৈহিক বিকাশ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এই জন্য শিশুর বয়স, আগ্রহ এবং মননশীলতা অনুসারেই শুধু যে বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগ হবে তা নয়, সংগে সংগে কার্যসূচীও বদলাবে। কাজেই বয়স অনুসারেই কর্ম-মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠ পরিকল্পনা বিরচিত হবে।

এখন সার্জেণ্ট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ব্যাপক শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনার সৃষ্টি। দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান-ই হবে শিক্ষা বিস্তারের প্রথম প্রচেষ্টা। কাজেই, শিক্ষাকে এমন ব্যাপক করে তুলতে হবে যে, তমসা থেকে আলোক তীর্থে আসবে অশিক্ষিত জনসাধারণ। এই প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে ৬-১৪ বৎসর পর্যন্ত আট বছর অবধি বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। প্রথম পাঁচ বছর অর্থাৎ ৬—১১ পর্যন্ত নানা রকম হাতের কাজের মাধ্যমে চলবে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা। ওয়ার্ধা শিক্ষা প্রণালীর সংগে সার্জেণ্ট পরিকল্পনার পার্থক্য এখানে। উৎপাদনাত্মক শিল্প ভিন্ন অন্য কোন শিল্পের স্থান নেই ওয়ার্ধা পরিকল্পনায়; কিন্তু সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, সৃজনাত্মক যে-কোন শিল্পই শিশু-শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে; শিশুর সব কাজ-ই যে উৎপাদনাত্মক হবে এমন কোন কথা নেই। তা ছাড়া সেখানে শিশুকে বিশ্লেষণ করে জানবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। নানা রকম হাতের কাজের ভিতর দিয়ে সহজেই যাতে শিশুর হাত, পা, কাণ, চোখ, মনের সংগে সমতা রেখে সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথম তিন বছর তার শিক্ষা চলবে বিশেষ করে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মারফতে, শেষের তিন বছর কিন্তু তাকে তার পছন্দ মত যে-কোন একটি বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। ওয়ার্ধা শিক্ষা-প্রণালীর মূল ভিত্তি কিন্তু শিল্পাদর্শ শিক্ষা। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় আদর্শ স্বীকৃত হলেও সেখানে উৎপাদনের উপর কোন জোর দেওয়া হয় নি। বরং সেখানে বলা হয়েছে যে, বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়াতেই কিন্তু শিল্পকেন্দ্রিক ও অর্থগামী শিক্ষার উপর তেমন জোর দেওয়া

হ'বে না, ওটা শুরু হবে উচ্চ বুনিয়াদীতে। তবে একথা ঠিক যে, কেবল অর্থাগমের দিকে দৃষ্টি দিলে কিন্তু শিশু-প্রতিভার উপর অবিচার করা হবে। অবশ্য অভিজ্ঞতা ও মনস্তত্বের নির্দেশ অনুসারে শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশু-মনের সংযোগ স্থাপন করতে পারলে, আপনা থেকেই শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অনেকেই বলেছেন যে, ভারতবর্ষের মত দেশে সার্জেণ্ট এবং ওয়ার্ধা পরিকল্পনার সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রণালী অনুসরণ করাই শ্রেয়, তা সম্ভব না হলে ও দুটো শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও চালু করা যেতে পারে।

শিক্ষার দিকটা ছাড়াও শিল্প-নৈপুণ্য অর্জনের বিশেষ ব্যবস্থার কথাও আছে সার্জেণ্ট পরিকল্পনায়। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার পর ১৪-১৬ বছর পর্যন্ত নিম্ন টেক্‌নিক্যাল বা শিল্পবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবুদ্ধ নবজাগ্রত জ্ঞান ও ধারণা বিষয়েও উভয় পদ্ধতির মধ্যেও বেশ একটা মিল দেখা যায়। কেবল লিখন-পঠন গণিত শিক্ষার মত নিছক কেতাবী শিক্ষা যে আজকের যুগে অচল, শিক্ষাবিদ্ মাত্রই আজ তা স্বীকার করেছেন। কাজেই তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে যে, হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে, বিশেষ করে যাতে তার সমাজবোধ ও সুকুমার বৃত্তিগুলি সম্যকভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই নানা প্রকার কাজের সঙ্গে খেলাধূলা, বিতর্ক সভা, গান, ছবি আঁকা, সমাজ সেবা ও স্বাবলম্বন ইত্যাদি শিক্ষারও সুব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট কথা, হাতে কলমে শিক্ষাই হচ্ছে সার্জেণ্ট পরিকল্পনার প্রধান কথা।

বুনিয়াদী শিক্ষাই এদেশের উপযোগী। একথা যাঁরা স্বীকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে, কোন ভাষার মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষা চালু হবে? এ-শিক্ষা ব্যবস্থা কি পুরোমাত্রায় দেশীয় হবে, ইংরাজীর নামগন্ধও থাকবে না? তার জবাবে পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, মাতৃভাষাই

হবে শিক্ষার বাহন; দেশ কাল ভেদে পৃথক পৃথক মাতৃভাষা হতে পারে। দ্বিতীয় কথা এই যে, নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরাজী থাকবে না, কিন্তু স্থানীয় চাহিদা অনুসারে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা চালু করা যেতে পারে। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় শুধু এই কথাই বলা হয়েছে, ওর স্বপক্ষে কোন ওকালতি-ই করা হয় নি। সার্জেণ্ট কমিটির প্রথম উপসমিতি অবশ্য বরাবরই মাতৃভাষাকে বহাল রেখেছেন; অবশ্য রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দু ও হিন্দী হরফে লেখা হিন্দুস্থানী ভাষারই অনুমোদন করেছেন,—ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় কিন্তু ইংরেজী ভাষাকে একেবারে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যাপারে সার্জেণ্ট পরিকল্পনা সর্বতোভাবে ওয়াধা প্রণালীর কাছে ঋণী। এ শিক্ষা-পরিকল্পনা এত ব্যাপক যে, একে রূপ দিতে বেশ কিছু সময় লাগবে। অন্ততঃ পক্ষে ৪০ বছরের আগে উপযুক্ত শিক্ষিত শিক্ষক মিলবে না এবং আনুমানিক বাৎসরিক খরচ পড়বে কুড়ি কোটি টাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়নেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। এখানেও চৌদ্দ বছর পর্যন্ত আবাসিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সার্জেণ্ট পরিকল্পায় এ ব্যবস্থা আছে যে, ১১ বছর বয়সে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে যারা হাই স্কুলের উপযোগী হবে, (অর্থাৎ শতকরা কুড়ি জন) তারা-ই নেবে উচ্চ শিক্ষা। ১১-১৭ এই ছ বছর পর্যন্ত তারা আই-এ ক্লাসের প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করবে। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এখানে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে জ্ঞানমুখী অর্থাৎ Academic আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে শিল্পমুখী বা Technical, শিল্পমুখী শিক্ষার উপর-ই সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। অযান্ত্রিক বিদ্যালয়গুলিতে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং দ্বিতীয় ভাষা রূপে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া চারুকলা, শরীর-চর্চা, কৃষি প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। আর যান্ত্রিক বিদ্যায়তনে ব্যবস্থা থাকবে নানারূপ শিল্প, সওদাগরী, দারু ও

ধাতুশিল্প, চিত্রাঙ্কন, শর্টহ্যাণ্ড, খাতাপত্র হিসাব রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার। মাধ্যমিক শিক্ষার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনার কোন অবকাশ নেই। তবে সার্জেণ্ট পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামোটি এখানে দেওয়া গেল :—

নার্সারি বা শিশু বিদ্যালয়	...	...	৩-৫ বছর
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	...	...	৬-১১ বছর
উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	...	...	১১-১৪ বছর
নিম্ন টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয় (শিল্প, যান্ত্রিক ও সওদাগরী)	...	...	১৪-১৬ বছর
জ্ঞানমুখী হাইস্কুল	...	...	১১-১৭ বছর
শিল্পমুখী বিদ্যালয়	...	...	১১-১৭ বছর
উচ্চ টেক্‌নিক্যাল প্রতিষ্ঠান (ডিপ্লোমা)		...	১৭-২০ বছর
উচ্চতর টেক্‌নিক্যাল (উচ্চ ডিপ্লোমা)		...	২০-২২ বছর
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা		...	১৭-২০ বছর

এবার সার্জেণ্ট পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষার কথায় আসা যাক। সার্জেণ্ট প্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন অনুসারেই পাঠ্যক্রম নির্বাচিত হয়েছে। সদা চঞ্চল শিশু-মনের বিচিত্র আগ্রহকে এখানে কাজের সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত করে দেবার সুযোগ আছে যে, আত্মবিকাশের আনন্দে শিশু সেখানে মশ্‌গুল। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে শিশু কেবল তার অনুকরণ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার অবকাশ পায় নি, ব্যক্তিত্ব বিকাশের অজস্র সুযোগ ভোগ করেছে। শিক্ষা-সাধনার এর চেয়ে চরম ফল আর কি হতে পারে। দেহ ও মন যাতে আপনা থেকেই গড়ে উঠতে পারে এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি আছে। কাজেই, মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এ শিক্ষা সত্যই বাঞ্ছনীয়; কারণ এ শিক্ষা স্বভাবতঃই কাজের জন্য উৎসুক ছেলেমেয়েদের

কেতাবী শিক্ষার অকারণ অত্যাচার থেকে রক্ষা করে তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সহায়তা করে। অনুবন্ধ প্রণালীতে ছেলেমেয়েরা এখানে শুধু আক্ষরিক জ্ঞানার্জনই করে না, হাত এবং বুদ্ধিকে তারা কাজে লাগাতে শেখে। এই যে অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক পরিণতি—একেই বলা চলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের শিক্ষা।

শ্রমের মর্যাদাবোধকে জাগ্রত করে সামাজিক বৈষম্য দূর করাই এ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কোন কাজ-ই হেয় নয়, জীবনের প্রয়োজনে যার সৃষ্টি, সে কাজ তো জীবনেরই অংশ। আর শ্রমবিমুখতা মানেই জীবনকে অবহেলা করা। কাজেই, ছেলেবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের মনে শ্রমের মর্যাদাবোধকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। শিক্ষায়তনে সকল জাতির ছেলেমেয়েরাই উৎপাদনক্ষম বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারলে,—বর্তমানে দৈহিক ও মানসিক শ্রমকারীর মধ্যে যে মর্যাদা-বৈষম্যবোধ বিদ্যমান রয়েছে—তা সহজেই দূর হয়ে যাবে।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাই মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা। শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে বলা চলে যে, শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা লাভ করে এবং জানা পরিবেশ থেকেই তাকে শিক্ষার অজানা ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া যায়। কাজেই, বুঝা যাচ্ছে যে, শিল্পমুখী শিক্ষা নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এমন ভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় যে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলিও পরস্পরের সহিত গ্রথিত হয়ে সহজেই শিশুর কাছে ধরা দেয়। অবশ্য একটু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিক্ষা প্রণালীটি যেন অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক হয়, কোন কারণে তা যেন বোঝা হয়ে শিশু-মনকে ভারাক্রান্ত না করে। তা ছাড়া বৃত্তি নির্বাচনের সময়ও দেখতে হবে যে, তার মধ্যে শিক্ষা-সম্ভাবনার অবকাশ আছে কি না। এক কথায় এ শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য এই নয় যে, ছাত্ররা উত্তর জীবনে সক্ষম শিল্প-মজুর হয়ে উঠবে, এর লক্ষ্য হচ্ছে হাতের কাজের মধ্যে সার্থক

শিক্ষা দানের যে সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, তারই সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ এ শিক্ষার লক্ষ্য হবে exploitation for educative purposes of the resources implicit in craft.

শিক্ষায় হাতের কাজ আছে বলেই যে, একটি মাত্র শিল্প কাজের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ হবে এমন নয়। বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা-ই ভাল। তাতে বৈচিত্র্য এবং আনন্দ দুই-ই বজায় থাকবে। এজন্য শিল্পকে শুধু পাঠ্য তালিকা-ভুক্ত করলেই চলবে না, শিল্পের দ্বারা শিক্ষাদান-প্রণালীকেও আনন্দময়, সহজ সুন্দর করে তুলতে হবে। কাজের আনন্দে সাগ্রহে শিশু যাতে শিখতে পারে, সেদিকে প্রথম থেকেই নজর রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, সম্মিলিত কাজ, পরিকল্পনা, নিভু‍র্ল ভাবে কাজ সম্পাদন, নূতনত্ব প্রবর্তনের চেষ্টা ও ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপর জোর দিতে হবে। গান্ধীজীও সে কথা সমর্থন করে বলে-ছিলেন যে, যদি শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয় পূর্বের মত-ই গতানুগতিক ভাবে শেখানো হতে থাকে, তবে সূতা কাটা, বয়ন অথবা কাঠের কাজ জুড়ে দিলে শুধু ও-গুলির গৌণভাবে সমন্বয় সাধনেই উৎসাহ দেওয়া হবে এবং শিক্ষার বিষয়গুলিকে পৃথক করে দেখলে এ পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিল্পকাজ এবং শিক্ষার মধ্যে কোন ভেদ-রেখা থাকবে না। একটার প্রসঙ্গে থেকে অন্যটি আসবে স্বাভাবিকভাবে। ইতিহাস, ভূগোল, এবং মাতৃভাষার সঙ্গে ছাত্ররা শিল্পকলাও শিক্ষা করবে; তবে ও-গুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে নয়, শিল্প শিক্ষার অনুসঙ্গ হিসাবে।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ৬-১৪ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক প্রবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষাকে মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে: যথা (১) নার্সারি বা শিশু বিদ্যালয় (৩-৫ বছর), (২) নিম্নবুনিয়াদী (৬-১১), উচ্চ বুনিয়াদী (১১-১৪)। অতি শৈশব থেকেই শুরু হবে শিশু-শিক্ষার প্রস্তুতি। ৩-৫ বছরের মধ্যে শিশুনিকেতন শুরু হবে শিশু-শিক্ষার মহড়া। খেলাধূলার

মাধ্যমে শিশুমনকে আনন্দময় একান্ত স্বাভাবিক গতিতে শিক্ষামুখী করে তুলতে হবে। শিশুকে জানতেই দেওয়া হবে না যে, দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে সে শিক্ষা জগতে প্রবেশ করছে।

কাজের অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে বিদ্যালয় হয়ে উঠবে শিশুর লোভনীয় খেলাঘর। সেখানে সে পরবর্তী জীবনের অক্ষয় পাথেয় সংগ্রহ করবে। ছ বছরেই বর্ণ পরিচয়ের সিঁড়িগুলো পার হয়ে সে লেখাপড়ার বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। সেখানে তথাকথিত গুরু মহাশয়ের বিধিনিষেধের বেড়াজাল থাকবে না, সে হবে শিশুর খেয়ালে পরিপূর্ণ কৌতূহলের রাজ্য। শিশুর জানার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ হবে কোলাহলমুখর। অনুবন্ধ প্রণালীতে চলবে শিক্ষা, অবিভাজ্য হবে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু। পরিবেশের ছাঁচে ঢালাই করা হবে পাঠ-পরিকল্পনাকে। নানাপ্রকার কাজ ও শিল্প প্রণালীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা। ৬-১১ বছর পর্যন্ত নানা রকম হাতের কাজের ভিতর দিয়েই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করবে। শেষের তিন বছর তাকে তার মনোমত যে কোন একটি বৃত্তি শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলতে হবে, যাতে সে ভবিষ্যতে জীবিকার্জনে সক্ষম হয়। শিল্প শিক্ষাকে নিখুঁত করবার জন্যে সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার পর ১৪-১৬ বছর পর্যন্ত নিম্ন টেক্‌নিক্যাল শিল্প-বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা এই, সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিভূমি বলে স্বীকার করা হয়েছে। জাতি গঠনের কাজে এ শিক্ষাকে লাগাতে হলে আদর্শ, শ্রম এবং উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। গুণী শিক্ষক না হলে শুধু শিক্ষা-পরিকল্পনাই যে ব্যর্থ হবে তা নয়, জাতীয় জীবনের উন্নতিও প্রতিহত হতে পারে। গতানুগতিকতার ছাঁচে ঢালাই করা পড়ুয়া ছেলেমেয়ের দল—কেতাবের বাইরে যাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, জীবিকার্জনটা যাদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা—তারা জাতীয় চরিত্রের

উন্নতি করবে কোথা থেকে? ফলে সে শিক্ষা—তা সে যতই বাইরের চাকচিক্যকে বাড়াক না কেন—কখনই জাতীয় প্রগতি আনতে পারে না। তাই এই পরিকল্পনার সার্থকতার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকের উপযুক্ত বেতনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ শিক্ষা-প্রণালীকে কার্যকরী করতে হলে আনুমানিক ৩৫ বছর লাগবে এবং খরচও হবে ৪,৫৭ লক্ষ টাকা।

এখন সার্জেণ্ট পরিকল্পনার গুণাগুণ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। আলোচনার প্রথমেই বলা চলে যে, এত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে অশিক্ষার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলানো সম্ভব কি? যে দেশে চৌদ্দ কোটি ছিয়াশী লক্ষের মধ্যে বারো কোটি সত্তর লক্ষ লোক নিরক্ষর, সেখানে এমন ধীর মন্থর শিক্ষা-প্রণালী কি ফলপ্রসূ হবে? হিসাবে করে দেখা গেছে যে প্রতি বৎসর ৬৭ লক্ষ লোককে লেখা পড়া শেখালে ২০ বছরে হয়ত নিরক্ষরতা দূর হতে পারে। কিন্তু এমন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে না আছে দেশ-প্রেমিকের আশাবাদের অনুপ্রেরণা, না আছে স্বাধীনতা উপলব্ধির উন্মাদনা! দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পরিকল্পনাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, ওর মধ্যে যে অপূর্ণতা আর অসঙ্গতি আছে তা উপেক্ষা করা যায় না। তুরস্ক, রুশ দেশের মত স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করলে বোধ হয় ঐ পরিকল্পনা আরও কার্যকরী হত। ১১ বৎসর বয়সে হাইস্কুলে ভর্তি হবার কথাটা অনেকে সমর্থন করেন নি। শুধু তাই নয়, দূর দৃষ্টির অভাব বশতঃ পরিকল্পনাটিতে পিছিয়ে পড়া এবং বিলম্বিত-বুদ্ধিদের (late bloomens) কথা চিন্তা করা হয়নি। আর একটা কথা, পাঠ্যসূচী সর্বত্র এক হবে কিনা বা খেলাধূলা ও ব্যায়ামের পাঠ্যক্রম কি হবে তার কোন নির্দেশ নেই। শিক্ষক-শিক্ষণের কার্যকাল স্বল্প; কাজেই, অনেকের মনে এই সন্দেহ জেগেছে যে পরিকল্পনাটি পূর্ণাঙ্গ নয়।

উপসংহারে এই কথা বলা চলে যে, সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় আর যা দোষ থাক না কেন, এ পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষা-সম্ভাবনার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

আছে। প্রতীচ্য সভ্যতার উপযোগী এমন ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কখনও রচিত হয় নি। ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিদারুণ প্রতিযোগিতার স্থান নেই এ শিক্ষা-ব্যবস্থায়, বরং অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ আছে। শুধু তাই নয়, জীবনের বিচিত্র কর্মকুশলতার খাতে জ্ঞানকে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞতার সাগর-সঙ্গমে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'আমাদের আশা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, 'ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল ও মহত্ত্বের মূলে আছে আধ্যাত্মিক শক্তি।' সেই আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের জন্য সর্ব-ধর্ম-সহিষ্ণুতা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে এই নব পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায়।

আর একটা কথা, সার্জেণ্ট পরিকল্পনা এদেশেরই জাতীয় সম্পদ। ভারতের ঐতিহ্যে গড়া ভারতীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট সার্জেণ্ট নামধেয় শিক্ষা-প্রণালীকে বিদেশীর আমদানী বলে বর্জন করলে শুধু ভুল করা হবে না, ভবিষ্যৎকে অবরুদ্ধ করা হবে। কাজেই, এ পরিকল্পনা নিয়ে নবোদ্যমে কাজ করতে হবে। সে দায়িত্ব অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষকদের। আজ জাতীয় জীবনের এই অভ্যুদয়ে যদি ভারতের প্রতিটি শিক্ষক মনেপ্রাণে নয়া শিক্ষা প্রচারের জন্য সচেষ্ট হন, তা হলে—আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক সম্ভাবনার যে স্বপ্ন কামনা করছে ভারতের ঘুমন্ত আত্মা—আশা করা যায় অদূর-ভবিষ্যতে সার্জেণ্ট পরিকল্পনার যাদুস্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে ভারতের সেই আদর্শ।

মন্তেসরি-পদ্ধতিতে পাঠদানরীতি

দান্তে বলেছিলেন, মেপে কথা বলো। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ও-কথাটা যে কি মূল্যবান মন্তেসরি তা উপলব্ধি করেছিলেন। পাঠদানের সময় ও বিষয়ে শিক্ষয়িত্রীদের তিনি বিশেষ সতর্ক করে দিয়েছিলেন; কিন্তু 'মেপে কথা বলা'র আইন শিশুদের উপর তিনি জারি করেন নি। বরং অবাধ সুযোগ দিয়ে একান্ত

মুখচোরা শিশুকেও তিনি কথার তুবড়ি করে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিশুমাত্রই কথা কইতে ভালবাসে। অর্থহীন নানা কথার মারফতে শিশু-কল্পনায় জোয়ার আসে। তখন কথার পৃষ্ঠে কথা উত্থাপন করে শিশুকে অনেক কিছু শেখান যায়। এইজন্য মন্তেসরি-শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুদের কথা বলার অফুরন্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে নানা জিজ্ঞাসা থেকেই শিশুরা সেখানে নিত্য নূতন জ্ঞানলাভের সুযোগ পায়।

শিশুর এই অবাধ স্বাধীনতাই মন্তেসরি-শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা। প্রত্যেকটি শিশুই যাতে স্বাধীনভাবে নিজের খেয়ালখুসিমত কিছু করতে, শিখতে, জানতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিশু-বিদ্যালয়ের পরিবেশকে শুধু গড়ে তোলা হয়নি, শিশুর প্রয়োজনের তাগিদেও সৃষ্টি করা হয়েছে বিচিত্র খেলার সামগ্রী। ফলে যখন খেলার আনন্দে শিশুরা আপনা থেকেই তন্ময় হয়ে উঠবে, তখনই শিক্ষকের পরোক্ষ কর্তব্য শুরু হবে। শিক্ষককে সতর্ক হয়ে দেখতে হবে, যাতে শিশুর সেই হৃদয়-উজাড় করা আনন্দ,—উচ্ছ্বাস-মুখর কল্পনা কেবল বাহ্য পর্যবেক্ষণেই নিঃশেষিত হয়ে না যায়; এবং চেষ্টা করতে হবে শিশুরা যাতে সেই অদম্য কৌতূহলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লাগাতে পারে। কারণ প্রত্যেক শিশুর মনে পরখ করে দেখার যে অদম্য কৌতূহল আছে, সেটাই শিশু-মনের গবেষণাপ্রবণ মনস্তত্ত্ব। সেই মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করেই মন্তেসরি-পদ্ধতিতে পাঠদান করতে হবে, অন্যথায় শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে শিশুদের নিয়ে হাতে কলমে কাজ করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। কারণ ব্যবহারিক প্রয়োগের সাফল্য ভিন্ন পদ্ধতির কোন মূল্য নেই। এইজন্য মন্তেসরি-পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কিন্তু শিশু-শিক্ষায় এতখানি স্বাধীনতা দিতে অনেকেই শঙ্কিত হয়েছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে, অবাধ স্বাধীনতার শৈথিল্যে পাঠদানের সময় বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার পদ্ধতি কি হবে? তার উত্তরে

মন্তেসরি বলেছেন যে, শিশুর স্বভাবসুলভ চাপল্যকে উচ্ছৃঙ্খল দুরন্তপনা মনে করে মিথ্যা ভয় পেলে চলবে না; নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে যে শিশুর কোন ধারণাই নেই, অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে থেকেই একটু একটু করে তার মনে শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। হঠাৎ শৃঙ্খলা প্রয়োগ করার নামে শিশুদের উত্যক্ত না করাই ভাল। খেলাধূলা অথবা নিয়মানুবর্তী ব্যায়াম থেকে শিশুর মনে যখন ভাল-মন্দের ধারণা জাগবে, তখনই আপনা থেকে তার মনে শৃঙ্খলাবোধ জাগবে। খেলার মাঠে সঙ্গীদের তালভঙ্গ হলে শিশু যখন মনক্ষুণ্ণ হবে, তখন শ্রেণীকক্ষে কোন অসঙ্গতি দেখলে শিশুরা আর স্থির থাকতে পারবে না। তৎক্ষণাৎ প্রতিকারের চেষ্টা করবে। ধরা যাক, শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে বুলু আর টুলু ঘরের মেঝেয় রঙ তুলি ছড়িয়ে বিশ্রী নোংরা করে ফেলেছে, এমন সময় পিছনের দরজা দিয়ে শিক্ষককে সেই কক্ষে ঢুকতে দেখে মণ্টু হয়তো একটু লজ্জিত হয়ে পড়বে। যদিও এই কুকীর্তিটা করেছে তার বন্ধুরা, তথাপি এই নোংরামিকে শ্রেণীগত বিশৃঙ্খলা ভেবে সে বিচলিত হয়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার করার কাজে সে লেগে যাবে; তার দেখাদেখি অন্যেরাও তাকে সাহায্য করবে। এইভাবে রুচিগত পারিপাট্য-বোধের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলাবোধ জাগবে। এই ধরণের অতি স্বাভাবিক ঘটনার মারফতে শৃঙ্খলার প্রকৃত অর্থ যখন শিশুদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে, তখন তার শ্রেণীশৃঙ্খলার জন্য কোন আইনকানুনের প্রয়োজন হবে না।

অবশ্য শ্রেণীশৃঙ্খলাটা বহুলাংশে নির্ভর করে পাঠদানের উপর। পঠন-পাঠনে শিক্ষকের দিক থেকে কোন ত্রুটি ঘটলেই শিশুদের মধ্যে হৈ-চৈ শুরু হয়। সেই কোলাহলটা শুধু কোলাহল নয়, সেটা শিক্ষাগত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিশুদের সমবেত প্রতিবাদ। মারিয়া মন্তেসরিও তাই বিশ্বাস করতেন। এইজন্য তিনি বলতেন যে, ভাল-মন্দ-বোধ জাগবার আগে শিশুদের উপর কোন হুকুম জারি করতে যাওয়াটা ঠিক নয়; তখন সমস্ত হুকুম-মকুব করে মায়ের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে প্রথমেই শিশুর মন জয় করতে হবে; মিতা হয়ে শিশুর

মনের কথা জানতে না পারলে, তার মনোরঞ্জন করা সম্ভবপর হবে না। এইজন্য শিশুশিক্ষার প্রথম দিকে ব্যক্তিগত স্নেহ যত্ন দিয়ে প্রত্যেকটি শিশুকে আপনার করে নিতে হয়। শিশুদের সঙ্গে কথা কয়ে, গল্প করে, তাদের মনের সঙ্কোচ দূর করে দিতে হবে, তা না হলে তাদের মনের জড়তা সহজে ঘুচবে না। স্বচ্ছন্দ-চেতনা-বোধ থেকে শিশুর মনে যখন অজস্র কৌতূহল জাগে, তখন শেখার অনুরাগে সে মেতে ওঠে।

মন্তেসরি তাই শিশুশিক্ষার প্রথম দিকে ব্যক্তিগত শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত আবেদন শিশুর কাছে যথেষ্ট মূল্যবান। প্রত্যেকটি শিশুই যখন বুঝতে পারে যে, শিক্ষক তাকে লক্ষ্য করেই কিছু বলছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন, কিছু করতে বলছেন, শিশুরা তথনই কাজের প্রেরণায় আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ থেকে শিশুরা যা শেখে, তার তুলনা নেই। তাই শিশুশিক্ষার প্রথম স্তরে তিনি সমষ্টিগত পাঠদানের পক্ষপাতী কোন দিন ছিলেন না। তিনি বলতেন, যে শিশু ঠিকমত ধৈর্য ধরে নিজ নিজ আসনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারে না, নিজেকে নিয়েই যে শিশু ব্যস্ত, আপন মনে পুতুলের সঙ্গেই কথা বলছে, অপরের কথা শোনার মত একনিষ্ঠ মনোযোগ কিছুতেই তার আসতে পারে না। কোন কাজেই যে দুদণ্ড স্থির হতে পারে না, ঘণ্টা বাজিয়ে ক্রমাগত তাকে নির্দেশ দিতে গেলে, সে শুনবে কেন? শিশু আগে তার দেহ ও মনের ভারসাম্য লাভ করুক, ভাল করে গুছিয়ে কথা কইতে শিখুক, বড়দের অনুকরণ করে কিছু করুক, তবেই না সে শ্রেণী-গত নির্দেশ মানতে শিখবে। তার আগে শিশুর কাছে সমষ্টি-গত-পাঠের (collective lesson) কোন মূল্য নেই। কারণ প্রথম দিনের স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতায় কোন শিশুর মনে সমবেত নির্দেশের ধারণা আসতে পারে না। নিয়মিত অঙ্গ সঞ্চালন ও ব্যায়ামের মধ্যে দিয়েই শিশুর মনে ক্রমে ক্রমে সামঞ্জস্য-বোধ জাগে, ভাল-মন্দের ধারণা আসে। কাজেই তার মন তৈরি হবার আগে তার কাছ থেকে কোন মননশীলতা আশা করা যায় কি? এইজন্ম

শিশুশিক্ষার গোড়াতে তিনি কিছুতেই সমষ্টিগত শিক্ষা প্রবর্তন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ক্ষেত্রবিশেষে যে তার প্রয়োজন নেই, এমন কথা তিনি অবশ্য বলেননি। তবে ও-ধরণের শিক্ষা কখন সম্ভব তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বয়সের কথা তুলেছেন। বলেছেন যে, একটু বয়স হলে শিশু যখন নিজ নিজ জায়গায় চুপটি করে বসে স্থির হয়ে কিছু দেখতে শেখে, তখনই সমবেতভাবে শিশুদের কিছু শেখান সম্ভব। অবশ্য সমবেত পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার কৌশলটা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে গৌণ, কাজেই ওকে পরিহার করলে কোন ক্ষতি নেই।

এ প্রসঙ্গেই তিনি ব্যক্তিগত পাঠদানের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাক্-পঠন-প্রস্তুতির সময় ব্যক্তিগত যত্নের একান্ত প্রয়োজন। তখন ব্যক্তিগত-ভাবে শিক্ষককে প্রত্যেক শিশুর জন্য মাথা ঘামাতে হবে। শিশুর মন গড়ে উঠবার এই বিশেষ সময়টিতে, শিক্ষককে অতিমাত্রায় সজাগ হতে হবে। এ সময় গল্প-কথা-কাজ যাই হোক না কেন—প্রয়োজনের নিক্তিতে মেপে তা বলতে বা করাতে হবে; আর লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অবান্তর কিছু যেন শিশুর মনের উপর বিরক্তির বোঝা চাপিয়ে না দেয়। তা হলে শিশুর অনুরাগ বিরাগে রূপান্তরিত হতে পারে। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ও-ধরণের প্রতিক্রিয়া অতিশয় মারাত্মক।

তাই তিনি পাঠপরিকল্পনার জন্য তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। সুষ্ঠু পাঠ প্রণয়নের সেগুলি হচ্ছে অপরিহার্য অঙ্গ। প্রথমটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত-করণ (concisenes-), দ্বিতীয়টি হচ্ছে সারল্য (simplicity), আর তৃতীয়টি হচ্ছে বস্তু-মুখিতা (objectivity).

অল্প অথচ সহজ সরল কথায় কিছু বলা খুবই কঠিন, কোন বিষয়ে সম্যক এবং গভীর জ্ঞান না থাকলে তা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যাঁরা তা পারেন, তাদের পণ্ডিতের পর্যায়ে ফেলা চলে। শিশুশিক্ষা-বিদ্‌দের প্রত্যেকের যে, সে মুন্সিয়ানা থাকা উচিত, এমন কথা মারিয়া মন্তেসরি বলেননি। তিনি

বলেছিলেন যে, সংক্ষিপ্তকরণ অর্থাৎ অল্প কথায় শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করার কৌশলটাই হচ্ছে শিশুশিক্ষার একটা প্রধান দিক। তাই পাঠপরিকল্পনার কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, সংক্ষিপ্তকরণটাই হবে ব্যক্তিগত পাঠদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ; কারণ ভূরি ভূরি উদাহরণ আর রাশি রাশি কথা শোনার মত অবকাশ থাকলেও ধৈর্য বা মনোযোগ শিশুদের কখনই থাকতে পারে না। তা ছাড়া শিশুরা অপরের কথা শোনার চেয়ে নিজের কথা বলতে পেলে খুসি হয় বেশি। কাজেই দু-এক কথার ইঙ্গিতেই শিশুর আপন কথায় শিশুকে কথা বলতে হবে, তার ভাবেই তাকে অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে, নইলে শিশুর আগ্রহকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে কিছু শেখান যাবে না। তা না হলে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে শিশুর প্রতি অবিচার করা হবে। কাজেই কি হাতের কাজ, কি লিখন-পঠন শিক্ষা, যে কোন কাজই হোক না—স্বল্প কথায় শিশুর কাছে তা অতি সুকৌশলে অবতারণা করতে হবে। এমন কি গল্পের বেলাতেও তাই। অর্থাৎ শিশুর কাছে গল্প হবে : যত কথা অল্প, তত খাসা গল্প। শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় অনর্থক অবান্তর কথা না বলে, খুব হিসাব করে কথা বলতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সরলতা। সহজ ও স্পষ্ট কথা হলে শিশুরা তা বুঝতে পারে। অস্পষ্ট হেঁয়ালী ধরণের কথা অনুধাবন করতে শিশুদের এত বেগ পেতে হয় যে, শিশুরা একটুতেই নাজেহাল হয়ে হাল ছেড়ে দেয় ; তখন অন্য কোন কথায় সহজে শিশুর মনোরঞ্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভাষার পাষাণ-প্রাচীরে বাধা পেয়ে সে তার ভাবের রহস্য দুর্গ ভেদ করতে পারে না। ফলে শিশু-মন এমন বেঁকে বসে যে তখন আর কিছুতেই তাকে সোজা করা যায় না। কাজই পাঠটীকার প্রত্যেকটি কথা যে, কেবল সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্বাচিত হবে তা নয়, শিশুদের পরিচিতও হবে। অর্থাৎ শিশুদের চেনা পরিবেশ থেকে তাদের জানা শব্দ আহরণ করতে হবে। তা না হলে জানা থেকে একটু একটু করে শিশুদের অজানার বিচিত্র লোকে নিয়ে যাওয়া

সম্ভবপর হবে না। সেটা না হলে কিন্তু শিশুর সীমাবদ্ধ জ্ঞান সীমাবদ্ধই থেকে যাবে।

তৃতীয় কথা হচ্ছে বস্তুমুখিতা। অর্থাৎ বস্তু থেকেই শিশুর মনে বিষয়ের ধারণা আসে। বস্তু-নিরপেক্ষ বিষয় সম্বন্ধে শিশুরা চিন্তাই করতে পারে না। কেবল 'কোমল' কথাটি বললে অনেক শিশুই হয়তো অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, কিন্তু 'ফুলের মত কোমল' বললে কথাটার অর্থ বুঝতে শিশুদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তেমনি গল্প শুনতে শুনতে শিশুর মনটা যখন গল্পের বর্ণিত ব্যক্তির সঙ্গে মিশে যায়, তখনই গল্পের বিষয়বস্তু শিশুর কাছে সত্য হয়ে উঠে। অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে শিশুরা যা যাচাই করে নিতে পারে, যা সে দেখে শুনে ঠেকে শেখে সেটাই শিশুর সত্যকার শেখা হয়। এজন্য অবশ্য চাই—পর্যবেক্ষণ, বস্তু এবং স্বাভাবিক পরিবেশ। শিশুশিক্ষার পক্ষে এগুলি একান্ত অপরিহার্য। স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে নানা জিনিসের আকৃতি, প্রকৃতি দেখে পরখ করে শিশুর মনে যে ধারণা জন্মে, সেই স্বভাব-শিক্ষা (auto-education) গুণে শিশু যা শিখতে পারে, অনেকগুলো বই পড়েও শিশু তা শিখতে পারত কিনা সন্দেহ। মন্তেসরি তাই বলেছিলেন যে, পাঠদানের সময় শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য হবে শিশুদের পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে ঠিক মত কাজে লাগান, বিষয়ের সঙ্গে বস্তুর অবতারণা করা, এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে একান্ত স্বাভাবিক করে তোলা। তা হলে শিশুশিক্ষা একটা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করবে।

পরিবেশ স্বাভাবিক হলে, শিক্ষণীয় বিষয়ে শিশুদের যথেষ্ট প্রেরণা আসবে। সেই তাগিদে শিশুরা আপনা থেকেই কথা কইবে, প্রশ্ন করে অনেক কিছু জেনে নিতে চাইবে। সেই সময় শ্রেণীকক্ষের কোন একটা ছবির দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে, বল তো ছেলেটা কি করছে? কান্নারত ছেলেটির ছবি দেখে হয়তো শিশুরা বলবে, ও কাঁদছে। তখন কিন্তু বলতে হবে, ওঃ কাঁদছে বুঝি! কিন্তু কেন কাঁদছে বল তো?

—দুঃখ হয়েছে।

—কিসের দুঃখ বল তো ?

—ওর ঘুড়ি ছিঁড়ে গিয়েছে যে !

—কেমন করে ছিঁড়ল বল তো ?

এমন করে প্রশ্নের ছলে শিশুদের আগ্রহকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। উত্তর-প্রত্যুত্তরের সময় শিশুরা যদি ভুলও করে, তবু কিছুতেই তাকে জানতে দেওয়া হবে না। কৌশলে প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে আবার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে শিশুদের মনে সঠিক ধারণা দেবার চেষ্টা করতে হবে। 'উঁহু হলো না', 'মনু ঠিক পেরেছে' এই ধরণের হতাশার কথা উচ্চারণ করে শিশুদের নিরুৎসাহ করা কখনই উচিত নয়। তখন বরং ছবিটা দেখিয়ে আবার বলা যেতে পারে যে, আচ্ছা, তোমরা আর একবার ছবিটা ভাল করে দেখ দেখি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ছবিটা।

—দেখছ ?

—হ্যাঁ।

—কি দেখলে ?

—দাঁড়কাকের ছবি। ইত্যাদি প্রশ্নের অবতারণা করতে হবে।

বর্ণবৈচিত্র্য শিশুদের আনন্দ দেয়। রঙের জৌলুস শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, সব রঙ শিশুরা ঠিক মত চিনতে পারে না। পরিবেশের বর্ণবিন্যাস থেকে রঙ সম্বন্ধে শিশুদের মনে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। ধরা যাক, নীল রঙ সম্বন্ধে ছেলেদের কিছু বলতে হবে, অথচ রঙ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাও নেই। সে ক্ষেত্রে ছোট ছোট প্রশ্নের আশ্রয় নিতে হবে। বলতে হবে ; আচ্ছা, তোমরা আকাশ দেখেছ কি ? নিশ্চয় দেখেছ। এখন আর একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখ। রাতের আকাশ দেখনি ? জ্বল-জ্বলে তারায় ভরা আকাশ। ওঃ, কি সুন্দর, না ? কিন্তু আকাশের রঙ কেমন

বল তো? আমার এই জামাটার মত না? এর রঙ নীল। নীল রঙের কত ফুল আছে—যেমন, অপরাজিতা, নীল জবা; আর কি ফুল আছে বল তো? আচ্ছা হয়েছে। আগুনের রঙ কেমন কে বলতে পার? কে বললে কৃষ্ণচূড়ার মত? হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এইভাবে আকাশ, জামা, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি পরিবেশ থেকে শিশুরা ক্রমে ক্রমে রঙ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে। এমনিতর চমৎকার উপায়ে শিশুদের রঙ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য রঙ নির্বাচন করাটা শিশুদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

এখন সংখ্যা গণনা শেখানর কথায় আসা যাক, সংখ্যার ধারণা শিশু-মনে দানা বাঁধতে সময় লাগে। সংখ্যা গণনা করতে বললেই শিশুরা কেমন যেন গোলমালে পড়ে যায়। এক দুই করে আরম্ভ করে মাঝ পথে সংখ্যার খেই হারিয়ে ছয় পাঁচ বলতে কসুর করে না। কাজেই এমত অবস্থায় উপকরণের সাহায্যে শিশুদের গণনা শিক্ষা দিতে পারলে ভাল হয়। সংখ্যা গণনার জন্য মন্তেসরি নানারকম খেলার উদ্ভাবন করেছেন। তা ছাড়া বিনা উপকরণেও যে কেমন করে সংখ্যার ধারণা দেওয়া যেতে পারে, সে সম্বন্ধেও মন্তেসরি কয়েকটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন ধরা যাক, প্রথম শ্রেণীর প্রথম দুটি সারিতে পাঁচ পাঁচ করে দশ জন ছেলেমেয়ে বসে আছে। তখন কোন একজনকে ডেকে বলতে হবে: মিনু, দেখ তো প্রথম দুটি সারিতে তোমরা কজন আছ? চট করে গুণে ফেল দেখি। শিক্ষকের নির্দেশ মত মিনু ছেলেমেয়েদের মাথা স্পর্শ করে এক দুই করে গুণে বলবে: দশজন। ঠিক না হলে, আবার গুণতে বলা হবে। এছাড়া অঙ্ক শিক্ষার কয়েকটি চমকপ্রদ খেলাও আছে। যেমন, মাছ ধরা খেলা। লোহার আংটা-লাগান অনেকগুলো কাঠের মাছ একটি টবের জলে ছেড়ে দেওয়া হল। প্রত্যেকটি মাছের গায়ে নানা সংখ্যা লেখা আছে। ছেলেদের কয়েকটা ছিপ দিতে হবে। ছিপ ফেলতেই চুম্বকের বঁড়শিতে মাছের দেহ-সংলগ্ন আংটাটা আটকে যাবে। এক দুই থেকে দশ সংখ্যার মধ্যে যে সংখ্যার মাছ যার ছিপে গেঁথে যাবে, তাকে

মেঝের উপর পর পর সেই সংখ্যাগুলো সাজিয়ে রাখতে বলা হবে। তারপর মাছ ধরা হয়ে গেলে, ঠিক মত পর পর সংখ্যাগুলিকে সাজিয়ে ফেলতে বলতে হবে। এইভাবে খেলার ছলে ছেলেমেয়েরা দশ পর্যন্ত গুণতে শিখে ফেলবে।

এমনিভাবে বস্তুর জ্যামিতিক আকার সম্বন্ধে শিশুদের মনে নিখুঁত ধারণা দেওয়া সম্ভব। ধরা যাক, বৃত্ত, ত্রিভুজ এবং চতুষ্কোণ বিষয়ে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হবে। বোর্ড বা খাতায় এঁকে ও-সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বলার চেয়ে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করাই ভাল। কাজেই ছেলেদের একটা কাঠের বাক্স দেওয়া গেল। বাক্সের উপরকার ঢাকনায় গোল, চৌকা ও তেকোণা ছিদ্র আছে; আর সেই মাপের গোল, চৌকা ও তেকোণা কাঠ কাটা আছে। ছেলেদের সেই কাঠ-গুলো দিয়ে বাক্সের উপরকার ডালার ছিদ্রে লাগাতে দিতে হবে। বার বার চেষ্টা করে তারা শুধু সফলকাম হবে না, জ্যামিতিক আকার সম্বন্ধেও তাদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

মন্তেসরি-শিক্ষাপদ্ধতি যে কত প্রাণবন্ত, এখন তা বোঝা যাচ্ছে। প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে এখন জীবনও যেন ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে। কাজেই এ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবনকে অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ করা খুবই সহজ। সেজন্য অবশ্য চাই স্বাভাবিক পরিবেশ, natural setting. এ হলে আপনা থেকেই একটা জীবন্ত পদ্ধতি গজিয়ে উঠবে। তখনই শিশুর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। কারণ মন্তেসরি-শিক্ষাপ্রণালী ব্যবহারিক-প্রয়োগ-সম্ভূত, ভূয়ো আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কাজেই এই বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষাপ্রণালী যে শিশু-শিক্ষার এক এবং অদ্বিতীয় পথ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

বুনিয়াদী শিক্ষা কি ?

বুনিয়াদী শব্দটি এসেছে ফার্সি কথা বুনিয়াদ থেকে। বুনিয়াদ মানে ভিত্তি বা ভিত। কাজেই বুনিয়াদী-শিক্ষাকে আভিজাত্যের শিক্ষা বলে ভুল করার কিছু নেই, ওটা হচ্ছে জীবন-প্রস্তুতির বুনিয়াদ। অর্থাৎ জীবনের একান্ত প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই এই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যে প্রয়োজনের জন্য জীবনের প্রস্তুতি, সেই অন্ন-বস্ত্র-আবাস-সংস্থানের কথাটাই বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়াতে স্থান পেয়েছে। কাজেই, বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে জীবনের প্রয়োজন এবং আয়োজন দুটো কথাই আছে। প্রয়োজনটা অবশ্য প্রত্যক্ষ, আয়োজনটা একান্তভাবে পরোক্ষ। জাগতিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন উৎপাদনের, আর আয়োজনটা হচ্ছে মানসিক ; কাজেই, সেখানে চাই সাধনার উৎকর্ষ। তা হলে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপক পরিধির মধ্যে কাজ, মন এবং সাধনার কথা এসে পড়েছে। কাজটা এখানে অবশ্য শিক্ষার উপকরণ মাত্র নয়, মাধ্যম। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কাজের আনন্দের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে শিশু লেখাপড়া শিখছে। লেখাপড়ার জন্য তাকে আয়াস স্বীকার করতে হচ্ছে না, ওটা আসছে আপনা থেকেই।

অনেকে আবার মনে করেন যে, বুনিয়াদী শব্দটা ইংরাজী 'বেসিক' কথারই বঙ্গানুবাদ। কাজেই, তাঁদের মতে বুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা, যা ইমারতের বুনিয়াদের মতই শিক্ষা-সৌধের সুদৃঢ় ভিত—যেটা না হলে উচ্চ শিক্ষার প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভবপর নয়। এটাই কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ নয়। বেসিক শব্দের আরও গভীর অর্থ আছে ; সেটি হচ্ছে সামাজিক ও নাগরিক জীবনের আটপৌরে শিক্ষা। অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজন মেটানো, কাজ চালানো স্বল্পমেয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা। কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার করে বললে দাঁড়ায় এই যে, চোস্ত ইংরেজী না শিখেও যেমন স্বল্প শ্রমে

এবং অনায়াসে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকলপ্রকার ভাবের আদান-প্রদান সম্ভবপর হয়, তেমনি জ্ঞান-রাজ্যের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের জন্য সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা না করেও স্বল্প অনুশীলনের দ্বারাই জীবনের অনেক কর্তব্য কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়। সামাজিক ও নাগরিক জীবনের এই যোগ্যতা অর্জন করবার মত জ্ঞানলাভের জন্য অল্প সময়ে যে অবশ্যগ্রহণীয় শিক্ষা, তাকেই বেসিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা বলা চলে। এ শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মামুলী শিক্ষার মত এ শিক্ষা কেতাব-সর্বস্ব নয়, এ শিক্ষা একান্তভাবে কর্মকেন্দ্রিক। অর্থাৎ বইয়ের পাহাড় ডিঙিয়ে মন এখানে জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করে না, কাজের ধূলি-ধূসর রাজপথ দিয়ে শিক্ষা এখানে এগিয়ে চলে অভিনব সম্ভাবনার দিকে। কাজেই, এ শিক্ষা পরীক্ষা-বৈতরণী পারের নৌকা মাত্র নয়, বরং জীবন-প্রস্তুতির হাতে-কলমে শিক্ষা। অর্থাৎ এখানকার সময় নিয়মের প্রকোষ্ঠে বাঁধা নয়, খেয়ালের দিগন্তে উন্মুক্ত। ফলে এখানে পরিপূর্ণ বিকাশের উন্মুক্ত আকাশতলে দেহ-মন নূতন আলোয় সঞ্জীবিত হবার অবকাশ পায়। কাজেই, আপনা থেকেই এখানে চলে দেহ ও মনের প্রস্তুতি। শিশু-মনের কৌতূহল আর অনুভূতির মধ্যে তথাকথিত মাষ্টারের শাসনের অত্যাচার থাকে না, ছাত্রকেন্দ্রিক এক অভিনব শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে উঠে। ফলে সে আবহাওয়ায় শিশু প্রলুব্ধ হয়, ভয় পায় না মোটেই। সার্জেন্ট-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর এই মনস্তত্ত্বের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ যাতে সমতা রক্ষা করে চলে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে ; এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এখানে শিশুর প্রাধান্যের কথা স্বীকার করা হয়েছে। মেনে নেওয়া হয়েছে যে, শিশুর জন্য শিক্ষা, শিক্ষার জন্য শিশু নয়।

এখানেই শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। জ্ঞানমুখী শিক্ষা হয়েছে কর্মমুখী। ফলে, কাজটা এসেছে শিশুশিক্ষার প্রথমেই। কারণ, কাজটা শিশুর খেয়ালের হুকুম নয়, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ওটা অপরিহার্য। চুপ করে বসে থাকাটা শিশুর

স্বভাব নয়, তাকে একটা কিছু করতে দিতেই হবে। কাজের জন্য শিশুর যে আগ্রহ, সেটা তার মনের ক্ষুধা ; আর চঞ্চলতাটা হচ্ছে তার দৈহিক তাগিদ। দেহ ও মনের ঐ ব্যাকুলতার জন্যই শিশু কাজ ভালবাসে। কাজেই, সে অনুরাগকে নিয়ন্ত্রিত করে কাজের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি থেকেই শিশুর প্রথম বস্তুজ্ঞান জন্মে। এইজন্য কাজকেই বুনিয়াদী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, কর্মী অর্থাৎ শিশুদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সর্বক্ষেত্রে। কাজের পরিকল্পনা, প্রেরণা এবং প্রয়োগ সমস্ত কিছুই করছে শিশুরা, প্রয়োজনবোধে শিক্ষকেরা দিচ্ছেন কেবল পরামর্শ আর নির্দেশ। কাজেই এ দিক থেকে বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক কর্মমুখী স্বাবলম্বী শিক্ষা বলা যেতে পারে।

কিন্তু শিশু-কেন্দ্রিক কর্ম মাধ্যমিক স্বাবলম্বী শিক্ষা বললেই বুনিয়াদী শিক্ষার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এ শিক্ষা জীবন-প্রস্তুতির সম্যক উপায় উদ্ভাবনের, প্রাণ-ধারণের, জ্ঞানহরণের, সমীকরণের, নীতি-বরণের, সহযোগিতার, নাগরিকতার শিক্ষা। কাজেই, এ শিক্ষার মধ্যে অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং সাম্যবাদের কথা আছে। এ সাম্যবাদ অবশ্য সহনশীল সহযোগিতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজী যে ঐশ্বর্যবিকেন্দ্রিত শোষণহীন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত সহযোগিতার রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই সমাজ-সম্ভাবনার অঙ্কুর আছে এই শিক্ষার বীজমন্ত্রে।

কাজেই, এক কথায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে সর্বতোমুখী শিক্ষা বলা চলে। এ শিক্ষাপরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি শিশুর সামগ্রিক বিকাশের দিকে এমন সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। শুধু কি তাই, শিক্ষার অপচয়, বিদ্যাদানের অত্যাচার আর অশিক্ষার অন্ধকার থেকে শিশুদের রক্ষা করা হয়েছে আত্মনির্ভরতার অভেদ্য বর্মে। ফলে ভবিষ্যতের জীবন-যুদ্ধে শিশুকে যাতে অসহায়ভাবে পরাজয় বরণ করতে না হয়, সেজন্য এ শিক্ষা দিয়েছে কাজের নির্দেশ, আত্মরক্ষার উপযোগী ভবিষ্যতের হাতিয়ার। তাই এ

শিক্ষাব্যবস্থায় ভাবী জীবনের অনিশ্চয়তার দ্বিধা নেই, আছে নিশ্চিত সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ। শিশুরা এখানে প্রথম থেকেই নিজের মতে নিজের হাতে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যে জীবন-পরিস্থিতির সমস্যা সমাধান করতে শেখে, তার জন্য ভবিষ্যতে আর শিশুকে ভাবতে হয় না। কারণ হাতে-কলমে কাজ করে আত্মশক্তি সম্বন্ধে শিশুর যে বিশ্বাস জন্মেছে, জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের জন্য সে পাথেয়টুকুই যথেষ্ট। তাই এ শিক্ষা ভবিষ্যতের অন্ধকারের দিকে শিশুদের ঠেলে দেয় না, বরং কর্মময় জীবনের প্রেরণা জোগায়। এইজন্য দেখা যায় যে, ছেলেবেলা থেকে হাতের কাজে অভ্যস্ত শিশুকে কোনদিন এই ভেবে বিব্রত হতে হয় না যে, শিক্ষা-সমাপ্তির পর সে কি করবে? প্রয়োজন হলে যে হাতের কাজ সে শিখেছে, তা দিয়েই সে তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। অর্থাৎ এ শিক্ষাই তাকে স্বাবলম্বী করে তুলবে। এই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন আসবে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে।

শিক্ষাদর্শের দিক থেকে এখানে অবশ্য একটু মতানৈক্য আছে। গান্ধীজী যে স্বার্থলেশহীন আদর্শ-বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদনাত্মক কাজকে বুনিয়াদী শিক্ষার অনন্য পন্থা বলে প্রচার করেছিলেন, দারিদ্র্যপীড়িত দুঃস্থ শিক্ষকের পক্ষে সে আদর্শ দিয়ে অমন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা কি সম্ভব? কারণ, যে উৎপাদনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক উন্নতি আর শিক্ষকের ভাগ্যপরিবর্তন নির্ভর করছে, সে শিল্পকাজের মধ্যে যে শিশুশিক্ষার উপাদান কতখানি আছে শিক্ষকেরা তা চিন্তা না করেই ভাববেন, কি করে আয় বাড়ানো চলে। ফলে লেখাপড়ার চেয়ে উৎপাদনের দিকটাই প্রকট হয়ে উঠতে পারে। তাই শিশু-শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কেবল উৎপাদনাত্মক কাজকে বেছে নিলে মুস্কিলে পড়বার সম্ভাবনা আছে। সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে কিন্তু ও-অসুবিধাটা নেই। কাজেই, বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষা দিতে হলে, সৃজনাত্মক কাজকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তা হলে কাজের কারখানা থেকে মুক্তি পেয়ে সৃষ্টির আনন্দে শিশু যে জ্ঞানার্জন করবে, সেটাই হবে শিশু-শিক্ষার স্বাভাবিক

পথ। তবে সৃজনাত্মক কাজ করতে গিয়ে শিশু যদি কিছু উৎপাদন করে ভাল, না করলেও ক্ষতি নেই; শিশুশিক্ষার ব্যাপারটা পরম লোভনীয় হলেই হল।

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় গান্ধীজী কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন যে, শিশু যেদিন থেকে উৎপাদনক্ষম হবে তখন থেকেই তার শিক্ষারম্ভ হবে, তার আগে নয়। কাজেই, অন্যান্য দেশের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার একটু পার্থক্য আছে। সাধারণ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার একটু পার্থক্য আছে। সাধারণ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় যে কোন কাজই শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু গান্ধীজীর মতে বুনিয়াদী শিক্ষায় তা হবার জো নেই। বুনিয়াদী শিক্ষায় ছেলেকে যে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে, সে কাজ হবে উৎপাদনাত্মক। শুধু তাই নয়, এ কাজের একটা সামাজিক মূল্যও থাকবে এবং তা থেকে একটা আয়ের ব্যবস্থাও হবে। এই আয় যখন বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের সহায়তা করবে, তখন শিক্ষা ব্যাপারটা হবে একেবারে স্বাবলম্বী।

তা ছাড়া ভাবী সমাজ গঠনের স্বপ্নও আছে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার মাঝে গ্রাম উন্নয়নের একটা লক্ষ্য আছে। কারণ, সামাজিক উন্নতিটাই প্রগতিশীল শিক্ষার উদ্দেশ্য, সভ্যতার মাপকাঠি। শ্রমের তারতম্য অনুসারেই সামাজিক বৈষম্য দেখা দেয়; কাজেই, গান্ধীজী শিক্ষার আওতায় এমন একটি শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য থাকবে না, শ্রমের মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজ, সেখানে কেউ কাউকে শোষণ করবে না, সবাই হবে স্বাধীন, স্বাবলম্বী। আজকের সমাজে ধনিকদের যে পরগাছা-মনোবৃত্তি দেখতে পাই, সে বৈষম্যের মূলে আছে শ্রমবিমুখতা। এক দল শ্রম করে; আর যারা করে না, তারা অন্যের শ্রমের উপর নির্ভর করে বসে খায়, শ্রমের অর্থকে শোষণ করে। সমাজগত এই বৈষম্য কি করে দূর করা যায়, গান্ধীজী সে কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন।

তিনি বুঝেছিলেন যে, এই বৈষম্য দূর করতে হলে সমস্ত সমাজকে শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কেউ বসে খেতে পাবে না। সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে যদি বাস্তবে রূপ দিতে হয়, তা হলে প্রতিটি শিশুকে ছেলেবেলা থেকেই এই নূতন আদর্শে মানুষ করতে হবে ; তাদেরও জীবনে শ্রমের মর্যাদা-বোধকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। সে শিক্ষার অনুশীলন হবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়। বুনিয়াদী শিক্ষা তাকে সেই শ্রেণীহীন উদার সমাজের আদর্শে এমন করে অনুপ্রাণিত করে তুলবে যে, উত্তর জীবনে প্রতিটি শিশুই নব পরিকল্পিত সমাজের সুযোগ্য নাগরিক হয়ে উঠবে। সেই ব্যবহারিক জীবনের সামাজিক আদর্শের মহড়া সুরু হবে বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে।

কাজেই, বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভারতের জাতীয় শিক্ষা বলা চলে। জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে জাতিগঠনের ব্যাপক প্রচেষ্টায় গান্ধীজী এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। শিক্ষার সঞ্জীবনীমন্ত্রে তিনি নূতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন জাতি, দেশ এবং সমাজকে। তাই ওয়াধা-অধিবেশনে যে প্রস্তাব তিনি এনেছিলেন তার মধ্যে আছে জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র। ভারতবর্ষব্যাপী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে চালু করাই ছিল তাঁর প্রথম প্রস্তাব। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষাই হবে বুনিয়াদী শিক্ষার বাহন। তৃতীয়তঃ যে কোন একটি শিল্পকাজকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা দিতে হবে ; অবশ্য স্থানীয় পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই হাতের কাজের প্রবর্তন করতে হবে। চতুর্থতঃ, উৎপাদনাত্মক কাজের আয় থেকে শিক্ষকের পরিশ্রমের এবং বিদ্যা-লয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ হবে। হরিপুরা কংগ্রেসে গান্ধীজীর এই প্রস্তাব উত্থাপিত এবং গৃহীত হল। কংগ্রেস এই শিক্ষাকেই ভারতের জাতীয় শিক্ষা বলে গ্রহণ করলেন। এবং এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হল। সমিতির নাম হল 'হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘ'। ডাঃ জাকির হোসেন হলেন তার সভাপতি এবং শ্রীআর্যনায়কম্ তার সচিব। যে

সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁদের পরামর্শ অনুসারে সেই সাতটি প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ সুরু হয়।

এই নবপরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই, শিশুর বয়স ও মান অনুসারেই শিশু-বিদ্যালয়ের শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে। বয়স অনুসারেই বুনিয়াদী শিক্ষায় নিম্নলিখিত চারিটি স্তরভেদ আছে। যথা, প্রাক্-বুনিয়াদী বা নার্সারি বিদ্যালয়। বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য এইসব বিদ্যালয়ে চলবে লিখন-পঠন-শিক্ষা প্রস্তুতির মহড়া। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনানুযায়ী জন্ম থেকে ছ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু থাকবে এই স্তরের আওতায়। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় কিন্তু শিশু-বিদ্যালয়ের বয়স ধার্য করা হয়েছে পাঁচ বছর। দ্বিতীয় স্তর হল প্রাথমিক বুনিয়াদী। প্রাথমিক বুনিয়াদীকে আবার নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদীতে ভাগ করা হয়েছে। এ ছাড়া উত্তর বুনিয়াদীকে জ্ঞান ও শিল্পমুখীরূপে আরও কয়েকটি বিশেষ স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে সার্জেণ্ট-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার সর্বব্যাপক কাঠামোটি প্রদত্ত হল :—

প্রাক্-বুনিয়াদী	
নার্সারী বা শিশু-বিদ্যালয়	৩—৫ বছর
নিম্ন বুনিয়াদী	৬—১১ "
উচ্চ বুনিয়াদী	১১—১৪ "
উত্তর বুনিয়াদী (বিশেষ শিক্ষা)	
নিম্ন টেক্নিক্যাল (শিল্প, যান্ত্রিক ও সওদাগরী) ...	১৪—১৬ "
জ্ঞানমুখী (academic) শিক্ষা	১১—১৭ "
শিল্পমুখী	১১—১৭ "
উচ্চ টেক্নিক্যাল প্রতিষ্ঠান (ডিপ্লোমা) ...	১৭—২০ "
উচ্চতর টেক্নিক্যাল (উচ্চ ডিপ্লোমা) ...	২০—২২ "
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা	১৭—২০ "

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অনেকে বলে থাকেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষাটা একেবারে কারিগরী শিক্ষা, এখানে উচ্চতর শিক্ষার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু সে অনুমান ঠিক নয়, শিশুর প্রবণতা অনুসারেই এখানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেবল জাতীয় অপচয় নিবারণের জন্য প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। ছবি আঁকায় দক্ষতা রয়েছে, জোর করে তাকে মোক্তার করবার পণ্ডশ্রম করা হয়নি। প্রতিটি শিশুর সম্যক শিক্ষার জন্য সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ফলে যান্ত্রিক, সাধারণ এবং বৃত্তি-শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষায়। কাজেই, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর ছেলেরা যেমন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও সেরকম ব্যবস্থা আছে। এমন কি তার চেয়ে ভাল করেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তো ছেলেরা সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে কম শেখে না। তা ছাড়া, যার যে দিকে ঝোঁক, তাকে সুকৌশলে সেইদিকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনেকে আবার এ আশঙ্কা করেন যে, হস্তশিল্পে অভ্যস্ত হলে, ছেলেরা হয়তো যন্ত্রশিল্পের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এ অনুমান কিন্তু অমূলক। সাধারণ বিদ্যালয়ে যেখানে ছেলেদের মোটেই হাতের ব্যবহার করতে হয় না, সেখানে শিক্ষা লাভ করে যদি কোন ছেলের যন্ত্রশিল্পের যোগ্যতা থাকে, তবে যে নানারকম হাতের কাজে দক্ষতা অর্জন করেছে সে নিশ্চয় অনায়াসে যন্ত্র-শিল্পের কাজে পাকা-পোক্ত হয়ে উঠবে। তা ছাড়া, যে বিদ্যালয়ে নানা রকমে হাতের ব্যবহার করতে হচ্ছে, সেখানে শিক্ষা পেলে তো ছেলেদের যন্ত্রশিল্পের যোগ্যতা আরও বাড়বে। হাতের কোন কাজের অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা না হওয়ার চেয়ে কি এক রকমের দক্ষতা ভাল নয় ?

এখানে কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শিল্পের মাধ্যমে যদি শিক্ষা দিতেই হয় তবে হস্তশিল্পের প্রয়োজন কেন ? যন্ত্রশিল্পের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দিলে ক্ষতি

কি? ক্ষতি উৎপাদনের দিক থেকে নয়, শিক্ষার দিক থেকে। কারণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গতানুগতিক ভাবে কোন কাজ করতে শেখানো হয় না, শিল্পকাজটা করানো হয় তার শিক্ষার জন্য। যন্ত্রশিল্পের কাজে সে সুবিধা এবং আনন্দ কোনটাই নেই। সেখানে দিনের পর দিন একজন মানুষ একটা জিনিসের একটি মাত্র ক্ষুদ্র অংশই তৈরী করে। কিন্তু হস্তশিল্পে একটা জিনিসের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে করা হয়। কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দিতে হলে কাজের সমগ্র রূপটি ছেলেদের কাছে থাকা চাই। তা হলে সে নিজে কাজের পরিকল্পনা করবে, কাজের উপকরণ সংগ্রহ করবে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করবে এবং কাজ হয়ে গেলে, সেটি তার পরিকল্পনা অনুযায়ী হল কিনা তার বিচার করবে। এ না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। যন্ত্রশিল্পেও সুবিধার কোন অবকাশ নেই। তা ছাড়া কাজের ভিতর দিয়ে ছেলেরা যে শুধু পণ্য উৎপাদন করবে তা নয়, নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি করার আনন্দের মধ্যে একদিকে যেমন সে সৃজনের আনন্দ উপভোগ করবে, অন্যদিকে তেমনই নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পাবে। একমাত্র হস্তশিল্পেই তা সম্ভব।

বুনিয়াদী শিক্ষায় হস্তশিল্পের বাহুল্য দেখে অনেকে প্রশ্ন করেন যে, কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষণীয় সব কিছু শেখানো কি সম্ভব? কোন একটা বিশেষ কাজের মধ্য দিয়ে সমস্ত জিনিস শেখানো সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু একটা কাজকে কেন্দ্র করেই যে সব কিছু শেখাতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বুনিয়াদী শিক্ষার একটা লক্ষ্য ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করা। স্বাবলম্বী মানে কেবল উপার্জনক্ষম করা নয়, আচার-আচরণেও তাদের আত্মনির্ভরশীল করা। অর্থাৎ যেমন করেই হোক যাতে ছেলেরা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই পূর্ণ করে নিতে পারে, বুনিয়াদী শিক্ষায় সেই স্বাবলম্বিতার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র এবং আবাস। নিজের প্রয়োজনীয় এই জিনিসগুলি তৈরী করে নেবার মত শিক্ষা যদি ছেলেদের দিতে

হয়, তা হলে ছেলেদের অবশ্যই শিখতে হয় কৃষি ও পশুপালন, সূতাকাটা ও কাপড়বোনা, কাঠ ও লোহার কাজ এবং আরও অনেক কিছু। এই সঙ্গে জীবনধারণের জন্য যেসব কাজ করতে হয়—যেমন দাঁত মাজা, মুখ ধোওয়া, স্নান করা, কাপড় কাচা—তাও আছে। তা ছাড়া কাজের প্রসঙ্গে ছেলেকে যে পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়, তার প্রাকৃতিক এবং সামাজিক আবেষ্টনী, তার কথাও এসে পড়ে। এই সব কিছুকে অবলম্বন করেই শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে। কাজেই, এ শিক্ষার মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই শেখানোর সম্ভাবনা আছে।

এই সম্ভাবনার কথা থেকে বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগিতার কথা আসে। বর্তমান যুগে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত, তা বুঝতে হলে প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার তফাৎটা কোথায়, বুঝতে হয়। প্রথম কথা, প্রচলিত শিক্ষায় জীবনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। কাজেই, সে শিক্ষায় ছেলেদের জীবন কোনরূপে উপকৃত বা সমৃদ্ধ হয় না। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা তা নয়, ও শিক্ষা জীবনের ভিতর দিয়ে এবং জীবন থেকেই উদ্ভূত। তাই এ শিক্ষার সমৃদ্ধির সঙ্গে জীবনের শ্রীবৃদ্ধি বিজড়িত। কাজেই, এ শিক্ষায় ছেলেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে নূতন করে গঠন করবার প্রচেষ্টা আছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, প্রচলিত শিক্ষা একান্তভাবেই শিক্ষক-কেন্দ্রিক। শিক্ষকই সেখানে সর্বময় কর্তা, শিশু ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন লক্ষ্য নেই। কারণ, সেখানে শিক্ষক শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কি শেখা প্রয়োজন তা স্থির করে নিয়েই নিজের মত করে শিশুকে তাই শিক্ষা দেন; শিশুর বর্তমান প্রয়োজনের কথা, তার আগ্রহ-অনাগ্রহের কোন কথাই ভাবেন না। অপর পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক। এ শিক্ষায় শিশুর বর্তমান জীবনকে অবলম্বন করে এবং তার আগ্রহ অনুসারেই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ একান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, কোন কিছুই জোর করে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। তার

ফলে তার শিক্ষায় আসে একটা সহজ স্বাভাবিক পরিণতি—আনন্দ উপভোগ করার মধ্য দিয়েই শিশু শিক্ষা লাভ করে।

তৃতীয়তঃ, প্রচলিত শিক্ষা হচ্ছে সহরমুখী। এই সহরমুখিতার প্রধান কারণ এই যে, কেতাবী শিক্ষায় জীবন-প্রস্তুতির কোন ব্যবস্থা নেই; কাজেই, এ শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেরা বিশেষ কোন কাজ শেখে না, সেইজন্য চাকরি করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকে না। ফলে তাকে বাধ্য হয়ে জীবিকার্জনের জন্য গ্রাম ছাড়তে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা কিন্তু একান্তভাবে পল্লীমুখী। গ্রামে থেকেই কেমন করে দেশের, দশের এবং নিজের মঙ্গল করা যায়, বুনিয়াদী শিক্ষা তারই নির্দেশ দেয়। এ শিক্ষায় ছেলেমেয়েরা প্রথম থেকেই কোন একটা উৎপাদনাত্মক কাজে অভ্যস্ত হতে থাকে। নিজেরটা নিজে করে নেবার মত সাহস ও শক্তি দুইই তারা অর্জন করে। কাজেই, শিক্ষান্তে তাকে নিরুপায় হয়ে চাকরির জন্য গ্রাম ছেড়ে যেতে হয় না।

তা ছাড়া, প্রচলিত শিক্ষা একেবারে নিয়মানুবর্তী, সেখানে কাজ করবার তেমন কোন স্বাধীনতা নেই। ছেলেরা সেখানে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে বসে শিক্ষকের কথা শোনে, তাঁর আদেশ পালন করে। নিজের আগ্রহে নিজের চেষ্টায় কোন কিছু করবার বিশেষ সুযোগ নেই। তার ফলে ছেলেদের স্বাধীন ভাবে কাজ করবার ক্ষমতা পরিস্ফুট হয় না। বুনিয়াদী শিক্ষায় কিন্তু ছেলেদের সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হয়; নানা পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। স্বাধীনভাবে যখন যেমন প্রয়োজন কাজ করতে করতে ছেলেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা, বিচার ও কাজ করতে শেখে।

প্রচলিত শিক্ষায় আর একটা দোষ এই যে, ছেলেদের মনে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়িয়ে তোলে। সেখানে জ্ঞান আহরণের অনেক ব্যবস্থাই আছে, কিন্তু সঞ্চিত জ্ঞান বিতরণের কোন ব্যবস্থাই নেই। ফলে সকল ক্ষেত্রেই ছেলেদের মনে সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা বড় হয়ে উঠে। অপরকে বঞ্চিত করে নিজে ভোগ করবার প্রবৃত্তিটা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় কিন্তু সঞ্চয়ের

পরিবর্তে ছেলেদের মনে সৃজনী প্রবৃত্তিই প্রবল হয়ে উঠে। প্রতিদিনকার কাজের ভিতর দিয়ে ছেলেরা পরম আনন্দে নিত্য নূতন সৃষ্টি করতে থাকে ; যে সৃষ্টি করতে পারে তার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কমে যায়। নিজের সৃষ্ট জিনিস অপরকে দিতে সে কার্পণ্য করে না, বরং দেওয়াতেই সে আনন্দ পায়। সেইজন্যে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে সমস্ত কিছুই সে ভোগ করে নিতে চায়, স্বার্থপরের মত সে সঞ্চয় করতে চায় না।

আর প্রতিযোগিতাটাই প্রচলিত শিক্ষার সবচেয়ে বড় দোষ। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার উপরই ব্যক্তিগত যোগ্যতার মান নির্ধারিত হয় ; ফলে সমবেতভাবে কাজ করবার সুযোগ সেখানে নেই। মিলে মিশে এক সঙ্গে কাজ করার সুঅভ্যাস যাতে ছেলেদের মনে বদ্ধমূল হয়, সেদিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না, বরং ব্যক্তিগত সাফল্য লাভের কৃতিত্বের উপরই জোর দেওয়া হয় বেশী। এমন কি কাউকে সাহায্য নিতেও দেওয়া হয় না, অন্যকেও সাহায্য করতে নিষেধ করা হয়। ফলে আপনা থেকে ছেলেরা স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। অপরপক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রতিযোগিতার বদলে আছে সহযোগিতা। কোন একটা কাজ একা করা শক্ত, ঠিকভাবে কাজ করতে গেলে বা কোন পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলেই, পরস্পরের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। ছেলেরা যাতে মিলে মিশে যুক্তি-চিন্তা করে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা আছে বুনিয়াদী শিক্ষায়। কেউ অন্য পাঁচ জন সতীর্থকে ডিঙিয়ে টেক্কা মেরে বড় হয়ে উঠবে, কিছু জানা বা শেখার আনন্দে একটি মাত্র শিশু উপকৃত হবে, এমন কোন ব্যবস্থা নেই বুনিয়াদী শিক্ষায়। এখানে সে যেমন সকলের সহযোগিতা চায়, তাকেও তেমনি সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

এই কারণে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্বজনিক শিক্ষা বলা চলে। বুনিয়াদী শিক্ষার এই ব্যাপকতার জন্যই গান্ধীজী বলেছিলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষাই হবে জাতিগঠনের নূতনতম সার্বজনিক শিক্ষা। বর্তমানে সকলের জন্য যে প্রাথমিক

শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তার পরিমাণ ও আয়োজন এত কম যে, তা দিয়ে আর যা হোক জাতি গঠনের কাজ চলে না। ছেলেকে মানুষ করা তো দূরের কথা, সে শিক্ষাপদ্ধতিতে ভাল করে লিখন-পঠন শিক্ষা দেওয়াও সম্ভব নয়। সেইজন্য গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাকে অন্যূন সাত বৎসরের শিক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী কালে এই সময়কে বাড়িয়ে আট বৎসর করা হয়েছে। এই আট বৎসরের শিক্ষায় ছেলেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজী বাদে প্রবেশিকার মান পর্যন্ত সমস্ত কিছুই শিখবে এবং জীবিকার্জনের উপযোগী কোন একটা শিল্পও শিখবে। শিক্ষাকাল এর চেয়ে কম হলে ছেলেদের শিক্ষা হবে না। তা ছাড়া অত অল্প সময়ে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করার পরিকল্পনা সফল নাও হতে পারে। কারণ, কাজের আয় তো উপরের শ্রেণীতেই বেশী হবে। শিক্ষাকাল কম হলে যে আনুপাতিক হারে আয়ের হারও কম হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৯৩৮ সালে। যে কয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, সেই কয়টি প্রদেশেই বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ সুরু হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার দরুণ শিক্ষাপ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়। যুদ্ধ প্রতিবাদকল্পে কংগ্রেস ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা অর্জন করে, ফলে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ প্রদেশেই বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বোম্বাইয়ে কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় না, কোন রকমে চলতে থাকে। অনেক অসুবিধা ও বাধা সত্ত্বেও বিহারে বেশ ভালভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চলে। ১৯৪১-এর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে অনেক কর্মী কাজ ছেড়ে দেন; যাঁরা রইলেন, তাঁদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার বিশেষ সুযোগ রইলো না; কারণ ইংরেজ সরকার তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। তথাপি বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চললো।

ইতিমধ্যে শিক্ষাসংস্কারের দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়লো। কেন্দ্রীয় সরকার

যুদ্ধোত্তর কালের জন্য এক শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনা করতে থাকেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরামর্শ-সমিতি ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য পর পর দুটি উপসমিতি গঠন করেন। এই উপসমিতিই পরিবর্তিত আকারে ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাকে গ্রহণ করবার নির্দেশ দেন। এই পরামর্শ-সমিতির সভাপতির নাম অনুসারেই এই শিক্ষা-পরিকল্পনা 'সার্জেণ্ট পরিকল্পনা' নামে অভিহিত হয়েছে।

আজ স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা কার্যকরী হতে চলেছে। ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকেই আজ জাতীয় শিক্ষা বলে গ্রহণ করেছেন ; এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশে অবশ্য বেসরকারীভাবে কিছু কিছু বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আগেই আরম্ভ হয়েছিল। এবার সরকারীভাবেই তা সমর্থিত হলো। তবে বিশেষ করে বাংলাদেশে সরকারীভাবে যে শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে, সেটাকে অল্পবিস্তর সার্জেণ্ট-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাই বলা চলে।

এই প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেকে আবার আপত্তি তুলেছেন। পরিকল্পনার বিষয়বস্তুর কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা বলেছেন, ওয়ার্ধা-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা, বিদেশ থেকে আমদানী করা সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা প্রদেশে কার্যকরী হতে পারে না। কাজেই, গান্ধীজী-কল্পিত সমাজ-আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমাদের সেই শিক্ষা-সংস্কারের কাজ চালাতে হবে। গোড়া থেকেই সেই সমাজের দিকে যদি আমাদের লক্ষ্য থাকে, তা হলে গান্ধীজীর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে আমাদের অপরিবর্তিত আকারেই গ্রহণ করতে হবে। তার খানিকটা বাদ দিয়ে খানিকটা রাখা, এ হতে পারে না। ওটা কিন্তু একেবারে গোঁড়ামির কথা। কাজেই, পক্ষপাতিত্বের কথা বাদ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ওয়াধা-পরিকল্পনার সঙ্গে সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার সামান্য কিছুটা ব্যবধান থাকলেও, ওটা বিদেশ থেকে আমদানী নয় ; ওয়ার্ধা-পরিকল্পনারই নামান্তর মাত্র। তবে মনস্তত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা

যায় যে, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের কথা চিন্তা করে কাজ দেওয়ার চেয়ে শিশুর চাহিদা মেটানো ঢের ভাল। তাতে শিশু আনন্দ পায় এবং শেখেও বেশী। কাজেই, সেদিক থেকে বিচার করে সার্জেন্ট-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিশু-শিক্ষার পক্ষে একান্ত অনুকূল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সর্বাঙ্গসুন্দর প্রচেষ্টার সম্ভাবনা ও সমন্বয় আছে এ শিক্ষা-ব্যবস্থায়।

বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক কেন?

কথায় আছে 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'। অর্থাৎ কাজের লোক কিছুতেই কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। কর্মঠ লোকের বেলায় একথা যতটা সত্যি হোকনা কেন, শিশুদের ক্ষেত্রে তার চেয়ে ঢের বেশী সত্য। কোন অবস্থাতেই শিশুরা বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না, একটা-কিছু করার জন্যে তার হাত দুটো নিষপিষ করে। তার এই অস্থিরতার পিছনে আছে শিশুর স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা। কাজেই, কোন কিছুতেই শিশু-মন স্থির হয়ে থাকে না, বৈচিত্র্যের সন্ধানে একটা কাজ থেকে অন্য একটা কাজের মধ্যে ছুটে যেতে চায়। বিষয়বস্তু যতই অভিনব হোক না কেন, তার প্রতি শিশুর আকর্ষণ ক্ষণিকের, চিরন্তন নয়।

এটাই শিশুর অভিরুচির মনস্তত্ত্ব, তার বয়সের ধর্ম। কাজেই, শিশুমাত্রই একটা-কিছু করতে চায়। হাত-পা গুটিয়ে চুপটি করে সে থাকতে পারে না। কারণ, কাজের জন্য শিশুর ক্রমবর্ধমান প্রতিটি অঙ্গ উন্মুখ হয়ে থাকে। সে চাহিদাকে অস্বীকার করে আর যা হোক, শিশুমনের ক্ষুধা মেটে না। কাজেই যেটা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, সেটার প্রতি সহজেই শিশুর অনুরাগ জন্মে; যে কাজে শিশু আনন্দ পায়, যা তার ভাল লাগে, ঘুরে ফিরে শিশুরা তারই

পুনরাবৃত্তি করতে চায়। তাতে শিশুমন শুধু খুশীতে ভরে উঠে না, সে প্রত্যহ অভিজ্ঞতাও লাভ করে। শিশুশিক্ষায় সে অভিজ্ঞতার মূল্য বড় কম নয়!

কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি থেকেই শিশুর প্রথম বস্তুজ্ঞান জন্মে। স্পর্শানুভূতির মারফতেই শিশুর জানার পালা সুরু হয়। শিশুর মন গড়ে উঠবার আগে, তার অনুভূতিই জাগ্রত হয়ে উঠে। তাই, সে তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কোন বস্তুরই খবর রাখে না; কায়াহীন বস্তুর ধারণা কিছুতেই তার মাথায় আসে না। দুহাতে মুঠোর মধ্যেই শিশুর অভিজ্ঞতা যেন সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ধরা-ছোঁয়ার অতীত কোন বস্তু সম্বন্ধে শিশু চিন্তাই করতে পারে না। শরীর ও মনস্তত্ত্ববিদরাও সে কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মস্তিষ্ক বিকাশের পথে হাতই সহায়তা করে। এই হাতের ব্যবহার থেকেই প্রথম শিশু-সভ্যতার চেতনা এসেছে, সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে মানুষ।

হাতেকলমে শিক্ষার স্থায়ী প্রভাব মনে। সাঁতার শিক্ষার মতই কাজের মাধ্যমে শিশু যা শিক্ষা করে, সে তা সহজে ভুলতে পারে না। কাজেই, এই মনস্তত্ত্বই ভাবিয়ে তুলেছিল গান্ধীজীকে। শিশুর খেয়াল ও আনন্দের মধ্যে কাজ অকাজের কোন ভেদ নেই, তথাপি শিশুর ঔৎসুক্যের কাছে কাজটাই যে অপরিহার্য—এ সত্য গান্ধীজী অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় তিনি কাজের উপরই জোর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন: কাজের মাধ্যমেই শুরু হবে বুনিয়াদী শিক্ষা। কারণ, পৈশিক অনুভূতি দিয়েই শিশু চিন্তা করে, ভাবাবেগ প্রকাশ করে; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তার প্রাথমিক জ্ঞান জন্মে। কাজেই, যে-কোন একটি বৃত্তি বা শিল্পকাজকে কেন্দ্র করেই শিশুশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হবে। শিশুমাত্রই উৎপাদনাত্মক তথা আনন্দদায়ক কাজ ভালবাসে। যে কাজে শিশুর যত আগ্রহ, শিশুমনে তার প্রভাবও তত সক্রিয়। এইজন্যে তিনি বুঝেছিলেন যে, কাজকে বাদ দিয়ে সত্যকার শিশুশিক্ষা চলতে পারে না। তাই তিনি বলেছিলেন যে,……I should begin its (শিশুর) education from the moment it

produces,—অর্থাৎ শিশুর উৎপাদন ক্ষমতা কার্যকরী হলেই সে লেখাপড়া শিক্ষা করার উপযুক্ত হবে। এক কথায় জ্ঞানার্জন এবং উপার্জন চলবে সমান তালে।

এইজন্য শিক্ষাবিদমাত্রই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রাধান্যের কথা স্বীকার করেছেন। কাজের মনস্তাত্ত্বিক দিক ছাড়াও একটা জৈবিক প্রয়োজনের দিকও আছে। কাজ করার মধ্যে শিশু যে শুধু আনন্দ এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে তা নয়, অঙ্গ-সঞ্চালনের ফলে সে একটা দৈহিক নৈপুণ্যও লাভ করে এবং তার জৈবিক প্রয়োজন মেটে। কারণ, কাজের জন্য শিশুর যে ব্যাকুলতা, সেটা তার বৃদ্ধিরই স্বাভাবিক লক্ষণ। তা ছাড়া অঙ্গ-সঞ্চালন শিশুমনের জড়তা দূর করে; ফলে শিশুর আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং তার ঘুমন্ত প্রবৃত্তি ও বিচিত্র অনুভূতিগুলোও সজাগ হয়ে উঠে। তাই কাজের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন যে, শিশুর ঘুমন্ত বৃদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ করে তোলার প্রেরণাই হচ্ছে কাজ। ডাক্তার ষ্টার্ণলি হল বলেছেন যে, পৈশিক প্রক্রিয়ার প্রভাব শুধু দেহমনে সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পরিব্যাপ্ত। তিনি আরও বলেছিলেন যে পৈশিক অনুশীলন শুধু মস্তিষ্ক বিকাশের পথে সহায়তা করে না, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, এমন কি সামাজিক সুঅভ্যাস গঠনেও সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, আনুগত্য এবং অনুকরণ-স্পৃহাকেও স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে। তাই কাজের এই জৈবিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপযোগিতার কথা উল্লেখ করে ষ্টার্ণলি হল বলেছিলেন যে, Muscle culture develops brain centres. ···Muscles are the vehicles of habitation, imitation, obeidence, character and even of manners and customs.

মনস্তাত্ত্বিকরা আরও বলেছেন যে, কর্ম-চাপল্যটা শুধু শিশুর প্রকৃতি নয়, তার আদিম প্রবৃত্তিও বটে। কাজেই, মননশীলতার সঙ্গে কর্মতৎপরতার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। এই জন্যে শিশুর কাছে জ্ঞানমুখী শিক্ষার মূল্য অনেক

বেশী। কারণ, শিশুদের যে-কোন অনুভূতিই তার কাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোঁজে। শিশুর ধ্যানধারণা মূর্ত হয়ে উঠতে চায় তার প্রকাশ-ভঙ্গীমায়; অর্থাৎ child's impression must be followed by expression. যে-কোন অনুভূতি বা অভিব্যক্তিকেই শিশু কাজে রূপায়িত করতে চায়। এই জন্য দেখা যায় যে, শিশুর হাতে রং তুলি, খেলার সরঞ্জাম, কাঁচি, কাগজ দিলেই শিশু সেগুলি নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। প্রথমে উদ্দেশ্যহীনভাবে একটা কিছু নাড়াচাড়া করতে করতে শিশুর মাথায় আসে কাজের প্রেরণা, অমনি উন্মুখ হয়ে উঠে শিশুর অফুরন্ত কল্পনা—সৃজনাত্মক কাজের আনন্দে মশগুল হয়ে উঠে শিশুরা। শুধু কি তাই? তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘিরে জাগে কাজ করার দুর্নিবার পিপাসা। কাজের চাকায় তার অফুরন্ত ইচ্ছা যেন ঘুরপাক খেতে থাকে, কাজের জন্য অস্থির হয়ে উঠে শিশু! তাই একজন শিক্ষাবিদ বলেছিলেন যে, For the young, motor education is cardinal. কাজেই এই সুযোগ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হলে তাদের মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে, তার ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। এইজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর অনুরাগের ছাঁচে ঢালাই করার প্রচেষ্টা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পাঠ্যসূচীকে। প্রত্যেক প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলিতেই যতদূর সম্ভব শিশুদের সুযোগ দেওয়া হয়: "to think through the muscles."

এই কারণে মনস্তত্ত্ববিদরা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত বলে মেনে নিয়েছেন। শিক্ষার আয়োজনে কাজের প্রয়োজন যে কত তা তাঁরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁরা জোর গলায় বলেছেন যে, কাজটাই শিক্ষার একটা উপলক্ষ্য মাত্র, স্বাভাবিক উপায়ে জ্ঞান পরিবেশন করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই জন্যে কাজের ভাল মন্দ নিয়ে অকারণ মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই, লক্ষ্য ঠিক থাকলেই হলো। কাজ যাই হোক না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রতিটি কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে শিশুর আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ, কার্যক্ষমতা,

নিয়ন্ত্রণ শক্তি, শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল এবং মনোসংযোগ বাড়ছে কি না, অথবা সাগ্রহে সে তার কাজ করছে কি না ?

কারণ কর্মোদ্দীপনা থেকেই শিক্ষার প্রেরণা আসে। কাজের প্রতি যখন শিশুর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, আত্মপ্রত্যয় বাড়ে, তখনই শিশু কিছু গ্রহণ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠে। সেই অবস্থায় যে-কোন শিশুকে কেন্দ্র করে অতি স্বাভাবিক উপায়ে শিশুকে 'লিখন', 'পঠন' এমন কি গণিত শিক্ষাও দেওয়া যায়। কারণ, আগ্রহ যেখানে দুর্নিবার, জানার ইচ্ছা প্রবল, শিক্ষার অনুশীলন সেখানে একান্ত স্বাভাবিক। তাই বলে শিশুর অনুশীলন-শক্তির উপর অযথা জোর দেওয়াটা ঠিক নয়, ওতে শিশুর দৈহিক এবং মানসিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। যে কাজে শিশু আনন্দ পাচ্ছে, সেখানে যে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা এগিয়ে চলছে, তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষাবিদ্‌রা তাই বলেছেন যে, "Progress will inevitably take place when the child is vitally interested in all that he is doing."

শিক্ষার এই বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে গান্ধীজী সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তিনি তার স্বাবলম্বিতার কথাও চিন্তা করেছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে শিক্ষা-সমস্যাকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন নি। তাই তিনি শিক্ষার বৈজ্ঞানিক সূত্রের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন অর্থনৈতিক সমস্যাকে। কারণ, তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা-পরিকল্পনা যতই নিখুঁত হোক না কেন, অর্থ ছাড়া কোন কিছুই কার্যকরী হতে পারে না। তাই বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য তিনি অন্ন-বস্ত্র-আবাস-সংস্থানের উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই দরিদ্র দেশে পরমুখাপেক্ষী হয়ে কোন বিদ্যালয়ই চলতে পারে না। কাজেই, বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনের জন্য কৃষিকার্যাদি প্রভৃতি উৎপাদনাত্মক কাজের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই উৎপাদনাত্মক শিল্পকেই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান শিল্প বলে ধ'রে নিয়েছেন। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, বুনিয়াদী শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করার সার্থকতা কোথায় ?

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের এত প্রাধান্য কেন? শিশুর অধিকাংশ কাজের মধ্যেই চারিটি দিক আছে; যথা—(১) মনস্তাত্ত্বিক (২) সামাজিক (৩) জৈবিক এবং (৪) অর্থনৈতিক। কাজের মধ্যে অবশ্য ও-গুলির তারতম্য ঘটতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিশু যখন তার খেলনা মোটর গাড়ীটায় চাপবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন বুঝতে হবে যে, তার সেই প্রচেষ্টার পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে শিশুর শারীরিক ও বৌদ্ধিক অভিপ্রায়। ক্রমে যখন শিশু মোটর চালনায় নৈপুণ্য লাভ করবে, সে তখন মোটরটাকে তার নাট্যাভিনয়ের কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে তার সে কাজের মধ্যে কিছুটা সাংস্কৃতিক আভাস থাকলেও সে কাজটা অবশ্য হবে সামাজিক। আবার মোটরখানার জন্যে শিশু যখন গ্যারেজ তৈরীর কাজে হাত দেয়, তখন তার সংগঠনী শক্তি কাজ করে। কিন্তু এই সব সংগঠনের কাজ করবার আগে শিশু যখন মাথা খাটিয়ে পরিকল্পনা রচনা করে, তখন সে তার বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। এইভাবে একটি কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি, আচার-আচরণ স্বাভাবিক ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠে।

শিক্ষার এই চতুরঙ্গ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পিত হয়েছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষারও চারিটি দিক আছে। প্রথমে মনস্তত্ত্বের কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক। অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে, কাজের সঙ্গে 'লিখন', 'পঠনের' সম্পর্ক কোথায়? লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়েই তো কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। তবে জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসাবে কাজের প্রয়োজন কেন? তার উত্তরে বলা চলে যে, বয়স্কদের ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের সময় কাজের প্রয়োজন না হতে পারে, কিন্তু শিশুদের পক্ষে কাজটা একেবারে অপরিহার্য। কারণ, শিশুশিক্ষায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রভাব বড় কম নয়। হাতেকলমে শিক্ষাটাই যে শিশুশিক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা, শিক্ষাবিদমাত্রই তা মেনে নিয়েছেন। কাজ করার আনন্দ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শিশু যা শিক্ষা করে, তা শিশুর জ্ঞান-ভাণ্ডারের অক্ষয় সম্পদ।

জানা পরিবেশ থেকে শিশু জ্ঞান আহরণ করে। তাই শিক্ষাবিদরা learning by doing-কেই শিশুশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলে স্বীকার করেছেন। কাজেই, এই মনস্তত্ত্বকে আরও বিশ্লেষণ করে মনস্তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন যে কাজের মনস্তত্ত্বের মাঝেও আরও তিনটি স্তর ওতপ্রোতঃ হয়ে আছে। সেগুলি যথাক্রমে হচ্ছে (ক) আত্মিক, (খ) চারিত্রিক এবং (গ) সৃজনাত্মক। কাজের আনন্দ থেকেই শিশু আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তার মনের পিপাসা মেটে, আগ্রহ কৌতূহল এবং অনুরাগের সৃষ্টি হয়। ও-গুলিই আসলে শিশুশিক্ষার দুর্দম প্রেরণা। কারণ, আগ্রহ ব্যতিরেকে শিশুশিক্ষা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কাজের মধ্যে শিশুরা ভাবাবেগ ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। কাজের আনন্দ ভিন্ন শিশুর সে অবাধ আত্মপ্রকাশের সুযোগ কৈ ?

তা ছাড়া কাজের মধ্যেই শিশুর একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেখে, ঠেকে এবং নিজের হাতে করে শিশু যা শিক্ষা করে, তা শিশুর চারিত্রিক আচরণের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। যে কাজের গুণাগুণ শিশুরা জেনেছে, পরীক্ষা করে উপলব্ধি দ্বারা যা সে আবিষ্কার করেছে, অনবরত সেই কাজ করে শিশু যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

সাধারণ কাজের চেয়ে সৃজনাত্মক কাজই শিশুরা বেশী পছন্দ করে। শিশুর মধ্যে যে অপরিণত শিল্পীমন, যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যে সম্ভাবনা লুক্কাইত আছে—সৃজনাত্মক কাজের আনন্দ উৎসে শিশুমন আপনা থেকেই সেই দিকে উৎসারিত হয়। সৃষ্টির গোমুখীধারায় শিশু-প্রতিভা পথ খুঁজে পায়। তা ছাড়া সৃজনাত্মক কাজের কোষ্ঠি পাথরে শিশুর অনুরাগ ও চাহিদার যাচাই চলে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে শিশু যে পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করবে, তা তার সৃজনাত্মক কাজের উপদান নির্বাচন থেকেই বেশ টের পাওয়া যায়। তা ছাড়া শিশুমনের রুদ্ধ ভাবাবেগ, নিত্য নূতন কল্পনা, বিচিত্র কর্মোদ্দীপনা সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে সহজেই মূর্ত হয়ে উঠে; ফলে শিশুর মানসিক সংহতি অব্যাহত থাকে।

এখন কাজের জৈবিক প্রয়োজনের কথায় আসা যাক। কাজের জন্যই যে শিশুরা কাজ করে, এমন নয়। দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদেই শিশুরা কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে পারে না, একটা-কিছু করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশুর কর্মব্যস্ততাই নাকি তার দৈহিক বিকাশের পরিচায়ক। শিশুর বিভিন্ন কর্মপন্থা থেকেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে কোন বয়সের স্তরে তারা পৌঁছেছে। কারণ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু একই কাজে আনন্দ পায় না, সেজন্য বিভিন্ন ধরণের কাজের প্রয়োজন হয়। পাঁচ বছরের শিশু যখন পুতুল খেলায় মশগুল, দশ-এগার বছরের শিশু তখন সংগঠনের কাজে ব্যস্ত। কাজেই, বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে চলা যে, নিছক কাজের জন্যই শিশুরা কাজ করে না, জৈবিক তাগিদেই শিশুরা কাজ করে। অর্থাৎ 'The child makes various activities for growth.' সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, কর্মতৎপরতাই শিশু-জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

এছাড়া কাজের একটা অর্থনৈতিক দিকও আছে। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার এই দিকটার উপরই বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, স্বাবলম্বিতাই হবে বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা। কারণ, অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে কোন নূতন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে শিক্ষা প্রসারের প্রধান উপায় এবং কর্তব্য হবে সর্ববিষয়ে বিদ্যালয়গুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা। উৎপাদনাত্মক কাজের আয়-ব্যয়ের তহবিল থেকেই বিদ্যালয়ের কাজ চল্‌বে। অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র এবং আবাসের জন্য যে যে শিল্প অপরিহার্য বলে মনে হবে, প্রথমেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কারণে তিনি অন্নের জন্য কৃষি, বস্ত্রের জন্য বয়ন এবং আবাসের জন্য দারু-শিল্প প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন যে, এই ভাবে নিজেদের কাজ নিজেরা করে নিতে পারলে বিদ্যালয়গুলি শুধু আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে না, নিয়মিত অভ্যাসের ফলে ছেলেরা কারিগরী বিদ্যায় নৈপুণ্যলাভ করতে পারলে নিশ্চয় উপার্জনের পথ

সুগম হবে; এবং সেই উৎপাদনাত্মক কাজকেই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান শিল্প বলে স্বীকার করে চালু করতে চেয়েছিলেন। কাজেই, বুঝা যাচ্ছে যে, কাজের এই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ছাড়াও সংস্থান এবং সংগঠনের দিকও আছে। অন্ন, বস্ত্র, আবাসের উপায় উদ্ভাবন করাটাকেই এক কথায় অর্থনৈতিক সংস্থান বলা যেতে পারে। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, সংগঠনের উপরই সংস্থানের কাজ নির্ভর করে। কাজেই, শিশুরা যাতে কাজের মধ্যে সংগঠনের সুযোগ পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সংগঠনী শক্তি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এইজন্যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অতি শৈশব থেকেই শিশুদের নানান ধরণের সংগঠনের কাজ করবার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়; যেমন ছোট বয়স থেকেই ছেলেদের বালির স্তূপ নির্মাণ করা, ফাঁপা ইটের বাড়ি ঘর তৈরি করা, কাঠের খেলনা প্রস্তুত করা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের সংগঠনের কাজ করতে দেওয়া হয়।

এবার কাজের সামাজিক ভিত্তির বিষয় আলোচনা করা যাক। সমবয়সী শিশুমাত্রই এক সঙ্গে কাজ করতে ভালবাসে। মিলেমিশে কাজ করার মধ্যে শিশুরা শুধু আনন্দ পায় না, পরস্পরের সহযোগিতায় কেমন করে যৌথ দায়িত্ব পালন করে পালাক্রমে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে হয়, শিশুরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সে সুশিক্ষা লাভ করে। কাজের সহযোগিতায় যখন বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, তখন বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন শিশুমনকে আকর্ষণ করে। সমাজ-ব্যবস্থার নিয়মকানুনগুলিও আর শিশুর কাছে দুর্বোধ্য জটিল বলে মনে হয় না; কারণ, সে তখন জীবন দিয়ে তাকে অনুভব করতে শেখে; এবং শিশু তার আত্ম-কেন্দ্রিকতার কথা ভুলে গিয়ে সমাজের আনুগত্য স্বীকার করে। এই অবস্থায় তার কাজকর্ম এবং অনুরাগকে শিশুশিক্ষাভিমুখী করার জন্য সামান্য মাত্র নির্দেশের প্রয়োজন হয়—অর্থাৎ সামাজিকতার কল্যাণে শিশুশিক্ষা তখন একটা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে। তাই কাজের এই সামাজিক প্রয়োজনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন যে, কাজের মধ্যেই শিশু

তার ব্যক্তিগত এবং সমাজ-জীবনের প্রেরণা, নির্দেশ এবং অনেক কিছুরই হদিস পায়। অর্থাৎ "He also finds a community life simple enough for him to understand and the guidance necessary for directing his interests and activities into the channels of learning."

এছাড়া সামাজিকতার আরও তিনটি দিক আছে ; যথা—(১) সাংস্কৃতিক, (২) আনুষ্ঠানিক এবং (৩) নাগরিক। শিশুমনে সাংস্কৃতিক প্রভাব বড় কম নয়। জন্মগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শিশুমনে শুধু প্রভাব বিস্তার করে না, শিশুর মনোভাবকেও নিয়ন্ত্রিত করে। এই জন্যে কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানের কাজে শিশুর আগ্রহ এবং উদ্দীপনা যেন আর ধরে না। তাই দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক বা আনুষ্ঠানিক উৎসবের কাজে শিশুরা যেমন সহজে মেতে উঠে, যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে, বিদ্যালয়ের অন্য কোন কাজে শিশুমন তেমন করে সাড়া দেয় না।

সাংস্কৃতিক শিক্ষা ছাড়াও কাজের মাধ্যমে শিশুরা আরও অনেক নাগরিক সুঅভ্যাসও শিক্ষা করে। কাজের লেনদেনের মধ্য দিয়ে শিশুরা স্বার্থপরতা ত্যাগ করে পালাক্রমে (learns to take turns) কাজ করতে শেখে। তারা বুঝতে শেখে যে, ব্যক্তিগত শ্রমে কোন মহৎ কাজ করা সম্ভব নয়, সহযোগিতা, সহানুভূতি, দায়িত্ব এবং কর্তব্য—সমস্ত কিছু মিলেই সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে, নতুবা ব্যক্তিগত অসন্তোষ ও অসহযোগিতার ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। সেইজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কাজের মধ্য দিয়ে সহজেই শিশুর নাগরিক বোধ জাগ্রত হয়ে উঠে। কারণ, নিয়মিত আচরণের ফলে যদি কোন শিশুর কোন সামাজিক সুঅভ্যাস একেবারে সংগঠিত হয়, তা আর সহজে পরিবর্তিত হয় না। শুধু কি তাই ? আচরণ অভ্যাসে পরিণত হলে তা মনকে শুধু দৈহিক চিন্তা থেকে মুক্তি দেয় না, সামাজিক ব্যবহারেও আনে স্বাচ্ছন্দ্যতা। তাই, কাজের এই সামাজিকতার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন মনস্তাত্ত্বিক বলেছিলেন যে, "Habits which release the mind

from thinking constantly of the care of the body, habits which make social intercourse easy, should become automatic."

এবম্বিধ কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়েছে। কাজকে সেখানে শিশুশিক্ষার বাইরের উপকরণ করে রাখা হয়নি, কাজ সেখানে শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকেরা সেখানে সর্বদা লক্ষ্য রাখেন কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের সুঅভ্যাস সংগঠিত হচ্ছে কিনা। তা ছাড়া বাড়িতে শিশুদের কি কি আচরণ ও অভ্যাস গড়ে উঠছে, পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষকেরা সেগুলি পর্যন্ত আবিষ্কার করতেও সচেষ্ট হন। এমন কি শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রণের কাজে তাঁরা সেগুলিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। এখানেই শিক্ষকদের দায়িত্ব বড় গুরুতর। তাঁরা শিশুর সদাচরণগুলিকে উৎসাহ দিয়ে বাড়িয়ে তোলেন, আর যেগুলি তার ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, সেগুলিকে পরিমার্জিত করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, এই ভাল-মন্দের মাঝে শিশুর যে ভবিষ্যৎ দোলকের মত দুলছে,—এতটুকু অসাবধানতায় সে দোলকের গতি রুদ্ধ হলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন মাটি হয়ে যেতে পারে। তাই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সে বিষয়ে অবশ্যই সচেতন হতে হবে, নইলে যে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম

নবপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থা শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপরই জোর দিয়েছে। তাই বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর এত জয়গান। এখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুরাই প্রধান, শিক্ষকেরা উপদেষ্টা, পরিচালক এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে দর্শকমাত্র। তাই শিশুর বিভিন্ন বয়সের প্রয়োজন, শারীরিক ও মানসিক ক্রমবৃদ্ধি এবং বয়সের স্তরভেদে তার আগ্রহ, কৌতূহল, সামর্থ্য, দক্ষতা,

মনোভাব এবং সর্বোপরি তার প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রেখে ভাবীকালের শিশু-শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ-প্রণালী বিরচিত হয়েছে। এক কথায় মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি।

পদ্ধতি ঃ

বুনিয়াদী শিক্ষাকে এক কথায় কর্মকুশল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলা চলে। শিশুর শিক্ষাকে উপলক্ষ্য করেই নানা সুযোগ দেওয়া হয়। কাজটা মুখ্য নয়, শিক্ষার বাহন মাত্র। অর্থাৎ শিশুর সহজাত কাজের প্রবৃত্তিকে এখানে শিশু-শিক্ষার কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বিচিত্র কাজের আনন্দ, কোন শিল্পানুরাগ, যখন শিশুর সৃজনাত্মক প্রতিভাকে দুর্নিবার করে তোলে, একটা-কিছু করার কৌতূহল যখন তার সমস্ত অনুভূতিকে আগ্রহোন্মুখ করে তোলে, সেই প্রেরণাকে কাজে লাগানোই হচ্ছে শিশু-শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক স্বাভাবিক পদ্ধতি। গান্ধীজী তাই বলেছিলেন যে, যখন থেকে শিশু উৎপাদন করতে শিখবে, তখন থেকেই শুরু হবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা।

শিশু এবং বালকবালিকাদের নিয়েই প্রাথমিক শিক্ষার কাজকারবার। এই অল্পবয়স্ক এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শুভ কামনার আন্তরিকতা প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবনব্রতের সর্বপ্রধান উপকরণ। কাজেই, এখানে শিক্ষকদের আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ হ'লে শিক্ষাদান-পদ্ধতি যে ব্যাহত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই শিশুশিক্ষা-ব্যাপারে শিক্ষককে শিশুচরিত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষকতার কাজে আগুয়ান হতে হবে।

(১) প্রথম কথা, শিশুর মনস্তত্ত্বকে জানতে হবে। শিশুরা বয়স্কদের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়, তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীব। তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, অনিচ্ছা, উপলব্ধি, বিচিত্র প্রবণতা এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে; কাজেই, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে। শিশুরা সর্বদা কাজ করতে ভালবাসে। একটা প্রবল প্রাণচাঞ্চল্য, কর্মব্যাকুল অস্থিরতা শিশুদের প্রতিনিয়ত বিষয় থেকে

বিষয়াস্তরে, কাজ থেকে কাজে টেনে নিয়ে যায়। শিশু কিছুতেই সংযমের রাশ টেনে ধরে রাখতে পারে না; আবেগে, অনুরাগে, কৌতুকে, হাস্তেলাস্তে, দৌরাত্ম্যে শিশু তার মনের পুঞ্জীভূত ভাবাবেগকে উজাড় করে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। শিশুর আচার আচরণ, কাজকর্ম বয়স্কদের কাছে অর্থহীন হতে পারে, কিন্তু শিশুর কাছে তার যথেষ্ট মূল্য আছে।

সুযোগ্য শিক্ষক অবশ্য শিক্ষাদান ব্যাপারে শিশুর এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেই কাজ করবেন। সহজ সাধারণ শিল্পকাজ, হাতের কাজ এবং খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক উন্মেষের সহায়তা ও সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন শিক্ষকেরা।

(২) শিশুমন কিছুতেই অপরিচিত বস্তুকে আপনা থেকে গ্রহণ করতে চায় না; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সে তাকে যাচাই করে নিতে চায়। সুতরাং শিক্ষার বিষয়বস্তু শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকে সঙ্কলন করতে হবে, যাতে শিশু বিনা দ্বিধায়, অসঙ্কোচে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে।

(৩) গল্প, কবিতা, নৃত্যগীত-অভিনয়ের প্রতিও শিশুর আকর্ষণ বড় কম নয়। আবৃত্তি ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিশুরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়, তার ভাবাবেগ মূর্ত হয়ে উঠে, প্রক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয়; সুতরাং শিশুর ভাষা শিক্ষার কাজে ওগুলি যে শিশুর মনে প্রেরণা জাগাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভাষা শিক্ষার সময় শিশুমনের উপযোগী গল্প, ছড়া, কবিতা প্রভৃতির সাহায্যে শিশুকে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। গল্প বলা, অভিনয় ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিশুরা ভাব প্রকাশের সুযোগ পাবে, তার কল্পনা-শক্তি বেড়ে উঠবে; তারা চিন্তা করতে শিখবে, জিভের জড়তা আর সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারবে—এক কথায় কাজে কথায় শিশুরা একেবারে চৌকষ হয়ে উঠবে।

(৪) শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল। কোন কাজেই সে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করতে পারে না। সে সব সময় খেলতে, ছুটতে, নাচতে, গাইতে—যা হয় একটা কিছু করতে চায়, চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই এমনভাবে

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যসূচী তৈরি করতে হবে, যাতে শিশুদের চিত্ত বিনোদনের প্রচুর অবসর আর অফুরন্ত সুযোগ থাকে। তা ছাড়া সব সময় লক্ষ্যও রাখতে হবে যে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলিতে কিছুতেই যেন একঘেয়েমি না আসে। বুনিয়াদী শিক্ষার আকর্ষণই সেখানে। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি রসায়িত করে এমন উপভোগ্য করে পরিবেশন করতে হবে যাতে শিশুমাত্রই যেন আনন্দ পায়, তার কল্পনা-শক্তি বেড়ে উঠে—শিশুর আত্মপ্রকাশ যেন একটা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে।

(৫) শিশু সাধারণের মধ্যে বিশেষকেই পছন্দ করে। অপরিচিতের প্রতি তার তেমন কোন মোহ নেই। অযাচিতভাবে সে অজানাকে জানতে চায় না। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরের সমস্ত জিনিসই তার কাছে অর্থহীন; সে ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোন নির্দিষ্ট প্রাণীকে চেনে—যার সঙ্গে প্রতিদিন তার দেখাশুনা হয়। গরুর মধ্যে সে তার বুধি গাইকেই চেনে, রাস্তার কুকুরের চেয়ে সে তার বাড়ীর ভুলো কুকুরটাকেই ঢের বেশী ভালবাসে। দুধওয়ালার মধ্যে সে কানু গোয়ালাকেই ভাল করে চেনে। কাজেই, শিশুর এই আত্মকেন্দ্রিক জ্ঞানকে অনুসরণ করেই ছোটদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতে হবে। তাই শিশুর পরিচিত অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিশুকে সুপরিচিত করে তুলতে হবে; তবেই তার জানাটা হবে গভীর এবং নিবিড়। কাজেই, জানা বস্তুর সহায়তায় অজানার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে দিতে হবে।

(৬) শিশু অতিমাত্রায় অনুসন্ধিৎসাপ্রবণ। পরিবেশের প্রত্যেকটি জিনিস তার কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু; প্রতিটি বস্তুর রহস্যগুণ্ঠন সে মোচন করতে চায়, তার অন্তর্নিহিত সত্যকে শিশুরা জানতে—আবিষ্কার করতে চায়। 'কি' ও 'কেন'র প্রশ্ন নিয়ে শিশুরা ডুব দিতে চায় রহস্যের অতলে—বিশ্ব-জিজ্ঞাসার মীমাংসার খোঁজে। কাজেই, এই প্রশ্নের সাহায্যে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক শিশুকে টেনে নিয়ে যাবেন জ্ঞানের আলোক-তীর্থে।

(৭) শিশু বিচ্ছিন্নভাবে কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারে না। শিশুর কাজের সঙ্গে ঘটনা বা বিষয়বস্তুর যোগ থাকা চাই, নইলে জ্ঞান আহরণটা শিশুর পক্ষে মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে উঠবে, তাই শিশু-শিক্ষার কার্যসূচীর মধ্যে এই ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে শিশুকে তার অভিজ্ঞতার সাহায্যে সুকৌশলে শিক্ষা দিতে হবে। কাজের মাধ্যমে সমবায় প্রণালীতে শিশুর জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করার সুযোগ করে দিতে হবে। অর্থাৎ সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত, স্বাস্থ্য প্রভৃতি শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে পৃথক শ্রেণীর প্রয়োজন হবে তা নয়, কোন একটি কাজকে কেন্দ্র করে প্রসঙ্গক্রমে যে যে বিষয়ে শিশুর আগ্রহ জাগবে, একই ঘণ্টায় একই শ্রেণীতে, সে বিষয়ে শিশুদের জ্ঞান দান করতে হবে। স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান বা ভূগোল শিক্ষার জন্য পৃথক সময় এবং নির্দিষ্ট ক্লাসের কোন প্রয়োজন নেই। যেমন ধরা যাক সূতা-কাটার কথা। সূতা-কাটার পর দেখা গেল যে, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা তুলার জন্ম-বৃত্তান্ত জানবার জন্যে খুব উদ্‌গ্রীব হয়েছে, তখনই তাকে নানা বিষয়ে জ্ঞানদান করা হবে যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক। অর্থাৎ তুলার জন্ম-বৃত্তান্তকে অবলম্বন করে কোন মাটিতে বেশী তুলা হয়, কোন দেশ তুলার জন্য বিখ্যাত, কেমন করে তুলার চাষ করতে হয়, কেমন করে এবং কখন বয়ন-শিল্পের উদ্ভব হয়, খাদির অর্থ নৈতিক সম্ভাবনা, প্রভৃতি কত বিষয়েই না শিশুদের শিক্ষা দেওয়া যায়; এর জন্য আর ভূগোল ইতিহাসের স্বতন্ত্র ক্লাস করতে হয় না—একই ঘণ্টায় একই শ্রেণীতে সমস্ত শিক্ষা চলে।

(৮) শিশু মাত্রই অনুকরণপ্রিয়। সে সুযোগ পেলেই তার মাতাপিতা বা গুরুজনদের আচার আচরণের কিছু না কিছু অনুকরণ করে। মাতাপিতার যে ভঙ্গিটি তার ভালো লাগলো, যে কথাটি তার কানে সুধা বর্ষণ করলো, যে অনুষ্ঠানটি তার মনে রেখাপাত করলো তাই অনুকরণ করে অভিনয় করে শিশুরা আপনা থেকেই উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে। কাজেই, শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কেমন করে শিশুর এই অনুকরণ-প্রবণতাকে

তার শিক্ষার কাজে লাগানো যায়, তা ছাড়া স্বভাব-চরিত্র আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষককে শিশুদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠতে হবে। কারণ অনুকরণ করে কতকগুলি অসৎ অভ্যাস এবং ভুল শিক্ষা করার মত মারাত্মক আর কিছু নেই। কাজেই, কোন শিক্ষকের ভাষাগত, উচ্চারণগত, বচনভঙ্গী অথবা অন্য কোন বদ অভ্যাস থাকলে, তাদের প্রাথমিক কর্তব্য হবে সে-গুলির আশু সংশোধন করা।

(৯) শেষ কথা, শিশুমাত্রই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূজারী। সে আবার ব্যক্তি-কেন্দ্রিকও বটে। অনেকের মধ্যে থেকেও শিশুরা পৃথক করে পরের কাছে জাহির করতে চায় যে, পাঁচজন তাকে জানুক, চিনুক, ভালবাসুক—শিশুমাত্রই তা কামনা করে। সে আত্মপ্রচারে যথেষ্ট আনন্দ পায়। কাজেই, কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে শিশুদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিতে হবে, যাতে সহজেই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে উঠে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

এখন বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রমের আলোচনায় আসা যাক। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থার পিছনে রয়েছে সমাজ, জীবন এবং রাষ্ট্রের আদর্শ। মহাত্মাজীর সেই শোষণহীন বিকেন্দ্রিত সমাজের স্বপ্ন এই শিক্ষাধারাকে প্রভাবিত করেছে। তাই এই শিক্ষা-পদ্ধতি আবাসিক ছাত্র-সমাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে এমন আদর্শ সমাজ—সেখানে ধনী-নির্ধনের কোন শ্রেণী-বৈষম্যই থাকবে না। জনগণই হবে সর্বময় কর্তা। পরস্পরের সেবা, ভালবাসা আর সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের কাজ চলবে। হাতে-কলমে সেই শিক্ষাই শুরু হবে ছাত্রাবাসে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, জনগণকে নাগরিকতা অর্জন করতে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষার এই আদর্শকে পুরোভাগে রেখে বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যসূচী রচনা করার প্রচেষ্টা হয়েছে। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশকে উপলক্ষ্য করেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অঙ্গীভূত করা হয়েছে :—

যথা, পাঠ্যবিষয়—

(১) শরীর পালন

(২) স্বাস্থ্য রক্ষা ও খেলাধূলা

(৩) সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা

(৪) সৃজনাত্মক কার্য ও কারুশিল্প

(৫) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও কৃষি (সব্জীবাগান) সহ গৃহস্থালীর শিক্ষা

(৬) ভাষা ও সাহিত্য

(৭) সহজ অঙ্ক

(৮) পরিবেশ পরিচিতি : (ক) ইতিহাস, (খ) ভূগোল, (গ) প্রকৃতি বিজ্ঞান

(৯) শিল্প-সঙ্গীত-নৃত্যকলা

(১০) নৈতিক ও আত্মিক শিক্ষা

উল্লিখিত পাঠ্যক্রমের সহিত প্রচলিত কর্ম-পদ্ধতি ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর তুলনামূলক সমালোচনা করলেই দেখা যাবে যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষারীতি অনুসরণ করলে প্রতিভাত হয় যে, সেখানে শিশুর প্রতি দেখানো হয়েছে সর্বপ্রকার ঔদাসীন্য ; শিশুমনের চাহিদাকে শুধু অবহেলা করা হয় নি, অস্বীকার করেই পঠন-পাঠন কার্য চলেছে। এক রকম জোর করেই শিক্ষাকে সেখানে শিশু-মনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে শিশুর স্বতন্ত্র সত্তার কথায় আমল দেওয়া হয়নি, শিশু বয়স্কদের ক্ষুদ্র সংস্করণ ধরে নিয়েই শিশুর সুখ-দুঃখ, অনুরাগ-বিতৃষ্ণা সমস্তই নির্ধারিত হয়েছে বয়স্ক শিক্ষকদের খেয়ালের মানদণ্ডে। ফলে, সেই পুঁথিগত সংবাদ-সর্বস্ব শিক্ষা শিশুর জীবন-সম্পর্কের বাইরের জিনিস হয়ে পড়েছে, তার সঙ্গে শিশুদের আত্মিক যোগ ঘটেনি। কাজেই, সেখানে শিক্ষক এসেছেন শিক্ষার পুরোভাগে, আর শিশুর অস্তিত্ব ঢাকা পড়ে গিয়েছে বইএর পাহাড়ে।

অর্থাৎ শিশুর স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করেই পঠন-পাঠন চলেছে। তার কারণ, প্রাচীনদের ধারণা ছিল যে, শিশুরা আর যাই হোক মানবক মাত্র! অর্থাৎ পূর্ণ মানুষেরই তারা ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই হচ্ছে গতানুগতিক শিক্ষার মস্ত বড় ভুল; কারণ…"that the child is not a miniature of man but a full man." সুতরাং শিশুকে ক্ষুদ্র বলে অবহেলা করলে চলবে না; তার সর্বাঙ্গীণ—দৈহিক, মানসিক, আনুভাবিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আত্মিক-বিকাশের একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা পরিবেশের সম্পর্কে নেই এবং সবচেয়ে মজার কথা, এই শিক্ষা যে একটা প্রাণবন্ত জীবনধারা (Education is a living process), একদল লোক সে সত্যকে ভুলে গিয়ে, বর্তমানকে অস্বীকার করে, ভবিষ্যতের প্রস্তুতির জন্য সেই নিরানন্দময় গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন করতে চেয়েছেন।

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট; তাদের স্বাধীনতার উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নি। তাই কর্মকেন্দ্রিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম শিশুর সকলপ্রকার চাহিদার উপর লক্ষ্য রেখেই বিরচিত হয়েছে। এক কথায় বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বেশী। এখানে শুধু যে, শিশুর দৈহিক ও মানসিক শিক্ষারই ব্যবস্থা আছে তা নয়, পরন্তু ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের বৃহত্তর কল্যাণের দিকেও সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, প্রগতিশীল শিক্ষার ধারা কিরূপ হওয়া উচিত? তার উত্তরে শিক্ষাবিদ্‌রা বলেছেন যে, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতিই শিশু-শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। কারণ, শিশুরা কোন একটি সৃজনাত্মক কাজকে কেন্দ্র করে হাতেকলমে যা শিখবে, বা জানবে তা প্রত্যেক শিশুর মনে একটা গভীর রেখাপাত করবে; এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির মারফতে পুঁথিগত নীরস বিদ্যার চেয়ে শিশু অনেক বেশী শিখবে, জানবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সৃজনীশক্তি কার্যকরী হয়ে উঠবে। তা ছাড়া নানা কাজের

মধ্যে শিশুরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে, শ্রমের মর্যাদাবোধ জাগ্রত হবে, তার মনে জাগবে আনন্দ, গৌরব আর আত্মবিশ্বাস। বিভিন্ন উৎপাদনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা যে বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভ করবে, তাই হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। তা ছাড়া তারা শিল্পী, কর্মী এবং কারিগর হয়ে যে দক্ষতা অর্জন করবে, তাই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। ফলে, ভবিষ্যৎ জীবনে তারা সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারবে। কাতাই, কৃষি, কাঠের কাজ, ছবি-আঁকা, মাটির কাজ, সেলাই ইত্যাদি টুকিটাকি স্বৈচ্ছিক কাজের মধ্যে শিক্ষকগণ আবিষ্কার করতে পারবেন, কিসের প্রতি শিশুর বিশেষ আগ্রহ, কোন কাজ কোন বয়সের শিশুরা ভালবাসে—তা জেনেই শিক্ষকেরা শিশুদের সেইদিকে পরিচালিত করতে পারেন। তা ছাড়া, এই সমস্ত শিল্পকাজকে আশ্রয় করে শিশুর প্রয়োজন, সামর্থ্য ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে শিশুর কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হবে। শিশু-শিক্ষাকে বাস্তবাভিমুখী, সহজ এবং স্বাভাবিক করে শিশুদের মন আকর্ষণ করতে পারলে যে শিশু-শিক্ষায় যুগান্তর আসবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেমন করে তা সম্ভব? কোন পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, হিউরিষ্টিক, ল্যাবরেটারী এবং প্রজেক্ট প্রণালী প্রভৃতি যে কোন পদ্ধতিকেই প্রয়োজনানুসারে প্রয়োগ করে সমবায় প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এ উপায়ে শিক্ষা দিলে আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা আছে।

অনেকে আবার এ কথা বলেছেন যে, ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির মান নির্ণয় করে প্রয়োজনমত দলগত (Group teaching) অথবা ব্যক্তিগত (individual teaching) শিক্ষার ব্যবস্থা করলে, ফল পাওয়া যাবে আরও বেশী।

কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় শিশুর পরিবেশ আর অভিজ্ঞতাকে শিশুশিক্ষার কাজে লাগানোর জন্য সচেষ্ট। তাই এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে যে শিল্প বা

হাতের কাজের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে, তা শিশুর পরিবেশ থেকেই নেওয়া হয়েছে। শিল্প শিক্ষা দিতে গিয়ে কেবল উৎপাদনের উপর জোর দিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'তে পারে। সুতরাং সবসময় মনে রাখতে হ'বে যে, activity is a means to an end, it is not an end in itself."

শেষ কথা এই যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হবে জাতীয় আদর্শ ও চিন্তার ধারক, আর পদ্ধতি হবে শিশুস্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল—অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যে শিল্প বা কাজ নির্বাচন করতে হবে—তা যেন শিশু-শিক্ষার বিচিত্র সম্ভাবনার উৎস হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষণ-ব্যবস্থা

শিক্ষার গুরু দায়িত্ব শিক্ষকের। ছেলেদের ভবিষ্যৎ, তাদের ভাল মন্দ অনেকটা নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতার উপর। সুযোগ্য শিক্ষকের কাছে অধ্যাপনাটা আনন্দের ব্যাপার, বোঝাস্বরূপ নয়। কিন্তু মুশকিল এই যে সে ধরণের জাত মাষ্টার তৈরি করা যায় না, তা জন্মায়। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় জাত শিক্ষকের দ্বারা সমাজের কতটুকু মঙ্গল হতে পারে? নিরক্ষরতার দিগন্তব্যাপী যে অন্ধকার গণমানসকে আচ্ছন্ন করে আছে, সেই অজ্ঞতার নির্বাসন দিতে হলে চাই হাজার হাজার উপযুক্ত শিক্ষক।

কিন্তু এত যোগ্য শিক্ষক আমাদের দেশে কোথায়? যাঁরা আছেন,—জাতীয় প্রয়োজনের তুলনায় তাদের সংখ্যা যৎসামান্যই হবে—কেমন করে তাঁদের যোগ্যতার মান উন্নত করা সম্ভব? উপযুক্ত অনুশীলনের দ্বারা। তা না হলে শিক্ষা পরিকল্পনা নিরর্থক হয়ে যাবে। কর্মী না হলে কর্ম ব্যর্থ হয়, সুশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে কোন শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা সম্ভবপর নয়। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা

হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এমন শিক্ষকের প্রয়োজন, যিনি শিক্ষার মত ও পথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কারণ, না জানলে যেমন জানানো যায় না, না শিখলেও তেমনি শেখানো যায় না।

এই মুশকিল আসানের জন্য পশিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। শিক্ষায় বুনিয়াদ যাতে সুদৃঢ় হয়, সেইজন্য তাঁরা প্রথমেই শিক্ষকশিক্ষণের বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। শিক্ষাসংস্কারের সঙ্গে শিক্ষকদের যে নতুন আদর্শ ও পদ্ধতির ছাঁচে ঢালাই করা প্রয়োজন সে সিদ্ধান্ত সরকারী পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনানুসারে গত ১৯৪৮ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাণীপুরে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় এবং দুইটি শিক্ষক-শিক্ষণ-বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। সেখানে অধুনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষকতা শিক্ষার হাতে-কলমে অনুশীলন চলছে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনানুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণ হালে প্রচলিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ কোন ধারণা নেই, শিক্ষকেরাও সকলে ওয়াকিবহাল নন; সুতরাং এই বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তুলতে হলে যে শিক্ষক-শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তা সর্ববাদিসম্মত।

এ ছাড়াও প্রগতিশীল শিক্ষাবিদরা অনুশীলন-কেন্দ্র প্রবর্তনের পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাকে ঠিকভাবে চালু রাখতে হলে মাঝে মাঝে অনুশীলন-কেন্দ্রে শিক্ষকদের ঝালাই করা উচিত। নচেৎ অধ্যাপনায় একঘেয়েমি এবং শিক্ষা-প্রণালীতে দোষত্রুটি আসতে পারে। কারণ, শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক দিকটা এমন জটিল যে সেদিকে খেয়াল রেখে নির্ভুলভাবে শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করা দুরূহ। কাজেই অনুশীলন-গবেষণাগারে সন্দেহভঞ্জন এবং পুনরালোচনার জন্য শিক্ষাবিদদের মিলিত হওয়া উচিত। এজন্য অবশ্য বারো মাসই শিক্ষণ-কেন্দ্রের দ্বারা উন্মুক্ত রাখতে হবে। বছরে অন্ততঃ বার দুই শিক্ষকদের ঝালাই করতে পারলেই, শিক্ষকতার মান উন্নত হবে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনাতেও শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সর্বতোভাবে শিশু-কেন্দ্রিক, এবং কাজই হচ্ছে সে শিক্ষার মাধ্যম। কাজের মারফতে সমবায় প্রণালীতে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ করতে হলে বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। তাই তাঁরা বলেছেন যে পরিকল্পনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করবে উপযুক্ত শিক্ষকের উপর; কাজেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাধিক।

এখন শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। সুচারুভাবে অধ্যাপনার কাজ করা, অধীত বিদ্যাকে কাজে লাগানো, জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্বারা ছাত্রসমাজের মঙ্গল করাই শিক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। মোটকথা, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যকল্পেই শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন:

(ক) শিশু-শিক্ষার উপযোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলে।

(খ) পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সমাজ-সংগঠনের ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং সমাজসংগঠক সৃষ্টি করা।

(গ) এ ছাড়া, শিক্ষককে এমন সুমহান শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে তাঁরা গ্রাম্য শিক্ষাব্যবস্থার পথপ্রদর্শক, চিন্তানায়ক, এমন কি মতবাদের স্রষ্টা হতে পারেন।

এখন, শিক্ষণ-কেন্দ্র সংগঠন প্রসঙ্গে আসা যাক। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে শিক্ষণ-কেন্দ্র সংগঠন করতে হবে:

(১) প্রথমেই শিক্ষণ-কেন্দ্রের অবস্থানের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কেন না, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও অবস্থান শিক্ষার্থীর মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষণ-কেন্দ্র এমন কোন স্থানে স্থাপিত হবে না, যেখানকার হট্টগোলে বিদ্যালয়ের শান্তিভঙ্গ হতে পারে অথবা দুর্নীতির জন্য নৈতিক অধঃপতনের কারণ ঘটতে পারে। বাহ্যিক পরিবেশ সুন্দর না হলে কৃত্রিম উপায়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঘাট্‌তিটুকু পূরণ করে নিতে হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শিক্ষণ-

পরিবেশের ঐশ্বর্য। প্রকৃতি যেখানে রুক্ষ, অনুর্বর, কৃত্রিম সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্য সেখানে ফল-ফুলের বাগান তৈরি করতে হবে; এমন কি পরিবেশ অনুযায়ী বিদ্যালয় গৃহের বর্ণও সুদৃশ্য হওয়া উচিত।

(২) বাহ্যিক পরিবেশের পরেই স্বাস্থ্যকর আবেষ্টনীর কথা ওঠে। অস্বাস্থ্যকর স্থানে কখনই শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত নয়। সেখানে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই যে শুধু স্বাস্থ্যহানি হবার আশঙ্কা আছে তা নয়, বিদ্যালয় হাসপাতালে রূপান্তরিত হলে সংগঠনের সমস্ত পরিকল্পনাই যে ব্যর্থ হবে। দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর মানসিক স্বাস্থ্যও নির্ভর করে। দেহ ভেঙে পড়লে মনের উদ্যমও যে নষ্ট হবে তা সহজেই অনুমেয়।

(৩) এর পরেই সুবিধার কথা আসে। সমাজ ও লোকালয়ের সঙ্গে সংযোগ রাখাও শিক্ষণ-কেন্দ্রের প্রয়োজন। লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্বাসিত এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপিত হ'লে লেখাপড়ার বিষয়ে হয়তো কিছু সুবিধা হতে পারে, কিন্তু সংগঠনের কার্যে যে বিশেষ অসুবিধা হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই যাতায়াতের সুবিধা ও অসুবিধার দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এইজন্য শিক্ষণ-কেন্দ্র এমন স্থানে হওয়া উচিত, যেখান থেকে সরকারী বীজাগার, ডাক্তারখানা, রেলষ্টেশন, ডাকঘর নিকটবর্তী হবে এবং সর্বত্র যাওয়া-আসার বিশেষ সুবিধা থাকবে।

(৪) এবার শিক্ষায়তন নির্মাণের কথা। এর সঙ্গে অবশ্য অর্থনৈতিক প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। গরিব দেশে যাতে স্বল্প ব্যয়ে মজবুত গৃহ নির্মিত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজেই গৃহ নির্মাণের আগে তার আকৃতি ও প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্যের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। ইটের বাড়ি করা সম্ভব না হলে মাটির ঘর হলেও কোন ক্ষতি নেই, অবশ্য তার ছাদ হবে টিনের। অঞ্চল বিশেষে মাটির ঘর কোঠা বাড়ির চেয়ে কোন অংশে কম মজবুত নয়। উঁচু শুকনো কাঁকর বা বালুকাময় স্থানে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করা উচিত। বিদ্যালয়ের গঠনাকৃতি কেবল সুন্দর হলে চলবে না, বিজ্ঞান-সম্মত

এবং সুপরিকল্পিত হওয়া উচিত। L, T, E প্রভৃতি কোন উন্নত ধরণের বিদ্যালয়গুলি নির্মিত হলে ভাল হয়। প্রতি শিক্ষণ-কেন্দ্রে একটি করে পরীক্ষা-মূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকা অত্যাবশ্যক। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কৃষি ও বাগানের কাজের জন্য ৬ বিঘা জমির প্রয়োজন। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়-সম্বলিত শিক্ষণ-কেন্দ্রের জন্য অন্ততঃ :২।১৩ বিঘা জমির প্রয়োজন। তা না হলে শিক্ষণ-শিক্ষার্থী ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র উভয়েরই অসুবিধা হবে।

(৫) বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের সঙ্গে শ্রেণীকক্ষের কথাও ভাবতে হবে। শিক্ষণ-কেন্দ্র বা বিদ্যালয়ের জন্য কতগুলি শ্রেণীকক্ষ থাকা উচিত, শিল্প বা পঠন পাঠনের জন্য কমপক্ষে এক একটি শ্রেণীতে কতকটা স্থানের প্রয়োজন, অথবা কোন্ কাজের জন্য কি ধরণের শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে সে বিষয়েও চিন্তা করতে হবে। শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের পক্ষে নিম্নলিখিত শ্রেণীকক্ষের একান্ত প্রয়োজনঃ (ক) সভাসমিতি বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য একটি বড় হল ঘর। সেখানে ও ছাড়া আরও অন্যান্য কাজ যেমন সমবেত প্রার্থনা, জরুরি সভা বা বিশেষ সম্মেলনের কাজও চলতে পারে। (খ) এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক শিল্পের জন্য পৃথক শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন; পাঠাগারের জন্য একটি বৃহৎ শ্রেণীকক্ষ অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া (গ) ছেলেদের সংগ্রহশালার জন্য আলাদা একটি কক্ষ থাকলে ভাল হয়। নৈমিত্তিক প্রয়োজনের জন্য আরও কয়েকটি কক্ষ বা ঘরের একান্ত প্রয়োজন। যেমন, পানীয় জলের ঘর প্রস্রাবাগার, পায়খানা প্রভৃতির ব্যবস্থাও করতে হবে।

(৬) আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামের প্রয়োজনও কম নয়। পঠন-পাঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে কিছু সাজ-সরঞ্জাম একেবারে অপরিহার্য। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসবার উপযোগী চেয়ার, বেঞ্চ, ডেস্ক এবং শ্রেণীকক্ষের উপযোগী ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়াও এইগুলি চাইঃ

(ক) গোলক, (খ) দেশ ও মহাদেশের মানচিত্র, (গ) গ্রাম, জেলা ও থানার ম্যাপ বা নক্সা, (ঘ) খ্যাতনামা মহাপুরুষদের ছবি, (ঙ) ঐতিহাসিক

ও ভৌগোলিক বিখ্যাত চিত্র, (চ) ভাস্কর্য ও শিল্পের নিদর্শন, (ছ) বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, (জ) ভূগোল শেখানোর জন্য বিভিন্ন সামগ্রী, (ঝ) কৃষি, কাতাই প্রভৃতি কাজের সরঞ্জাম ইত্যাদি।

(৭) পাঠাগারের সুব্যবস্থার দিকেও নজর দিতে হবে। পাঠাগারে থাকবে শিক্ষকদের উপযোগী গ্রন্থাদি—শিক্ষানীতি, শিশুমনস্তত্ত্ব, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি ছোটদের উপযোগী ছবি ও গল্পের বই। তা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সব পুস্তক থাকবে, যার দ্বারা শিক্ষকেরা উপকৃত হতে পারেন।

বিদ্যালয়ের বহিরঙ্গের পর বিদ্যার্থী নির্বাচনের কথা ওঠে। শিক্ষণ-কেন্দ্রে কি ধরণের বিদ্যার্থী নেওয়া হবে, প্রথমেই সে বিষয়ে চিন্তা করে তাদের যোগ্যতার মান স্থির করা উচিত। আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের কষ্টিপাথরে বিদ্যার্থীদের যাচাই করে নেওয়া ভাল। কারণ শিক্ষকদের কাজ যেমন দায়িত্বপূর্ণ, তেমনই কঠিন। সকলের ধাতে অধ্যাপনার পেশা তেমন খাপ খায় না। তথাপি অনেক ক্ষেত্রে নিরুপায় হয়েই তাদের শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কেউ চিন্তা করেন না যে এ কাজের জন্য যোগ্যতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ফলে শিক্ষকেরা নিজ নিজ কাজের যোগ্য কিনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দেখা হয় না। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, বহুগুণের আধার না হলে সুযোগ্য শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষককে একাধিক গুণের অধিকারী হতে হবে। শিক্ষক হবেন স্বাধীনমতাবলম্বী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উদারচেতা, সহানুভূতিশীল এবং উৎসাহী সংগঠক। তা ছাড়া সৃজনী-প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তিও তাঁর থাকবে। এক কথায় শিক্ষক হবেন নূতন-দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন, শিক্ষাদর্শের 'মডেল'।

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, শিক্ষক শুধু শিক্ষকতাকে পেশা বলে গ্রহণ করবেন না, আদর্শের খাতিরে অধ্যাপনা প্রীতির জন্য বরণ করবেন। এই মনোভাব না থাকলে শিক্ষকতা করার কোন অর্থ হয় না। কাজেই শিক্ষণ-কেন্দ্রের জন্য বিদ্যার্থী নির্বাচনের সময় এদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। প্রথমেই দেখতে হবে বিদ্যার্থীদের শিক্ষকতার যোগ্যতা কতদূর এবং তাদের শিক্ষকোচিত

গুণাবলী বা মনোভাব আছে কিনা। উপযুক্ত ছাত্র নির্বাচিত না হলে শিক্ষা-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলা সম্ভবপর নয়। কাজেই নিরপেক্ষভাবে উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করা একান্ত কর্তব্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য প্রতিভাসম্পন্ন খুব উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। প্রয়োজন সামাজিক-মনোভাবসম্পন্ন কর্মকুশল উৎসাহী শিক্ষকের। প্রাথমিক শিক্ষকেরা যখন ছেলেদের মাঝে কাজ করবেন, তখন তাঁরা প্রত্যেক শিশুকে সাহায্য করবেন, যাতে তাদের সর্বাংগীণ বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, তারা যাতে প্রত্যেক কাজে অগ্রণী হতে পারে, কাজে ও চিন্তায় স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দিতে পারে, আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। উপরন্ত প্রত্যেকটি শিশু যাতে সহযোগিতার আদর্শ, সমাজ-বিজ্ঞান-নীতি হৃদয়ঙ্গম করে সুযোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষককে যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে হবে। আমরা আরও আশা করি যে, শিক্ষকেরা শুধু ছেলেদের ভবিষ্যৎ বাস্তব জীবনের উপযোগী করে তৈরি করবেন তা নয়, তাঁরা হবেন শিশুদের কাছে জ্ঞান-অন্বেষণের আদর্শ, উদ্দেশ্যমূলক কাজের জীবন্ত প্রেরণা। বাধ্য হয়ে তাঁরা শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করবেন না, প্রীতি এবং সহযোগিতার বশে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষকতা করবেন। আমরা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষাভিমানী 'স্কলার' চাই না, আমরা চাই সামাজিক, কর্মঠ, সুশিক্ষিত সত্যকার শিক্ষক।

এইজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতার নিম্নতম মান ধরা হয়েছে প্রবেশিকা পাশ। পঠন-পাঠনের যোগ্যতার দিক থেকে তাই বটে, কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তাঁকে চৌকস হতে হবে। শিক্ষকোচিত চারিত্রিক গুণাবলী-ই হবে তাঁর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। কেবল শিক্ষকতার বিশেষ অভিজ্ঞতা বা পারদর্শিতা থাকলেই চলবে না। তাঁকে হতে হবে অক্লান্তকর্মী, পরিশ্রমী এবং উত্তম সমাজ-সংগঠক। প্রগতিশীল শিক্ষার আদর্শেও তাঁর থাকবে

গভীর প্রীতি ও আত্মপ্রত্যয়। তিনি হবেন প্রত্যুৎপন্নমতি, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মিষ্টভাষী ও দরদী। অনেকে বলেন যে, এক সপ্তাহ হাতেকলমে কাজ করিয়ে পরখ করে দেখে তার পর নির্বাচন করলে ভাল হয়; তা হলে নির্বাচনে ভুল হবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

অনুশীলনের দ্বারাই শিক্ষকতার মাত্র উন্নীত করা সম্ভব। তাই যারা নির্বাচনে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তাদের বিশেষ অনুশীলনের ব্যবস্থা হবে শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্রে। কিন্তু এই সব বিদ্যার্থীদের শিক্ষার মেয়াদ হবে কত দিনের? অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা বলেছেন, এদের শিক্ষাকাল অন্ততঃ দু বৎসর হওয়া উচিত। আবাসিক ছাত্রাবাসে থেকে বিদ্যার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতায় হাতেকলমে কাজ করতে শিখবে। প্রথম বৎসর আত্ম-প্রস্তুতির জন্য বিদ্যার্থীরা কেতাবী জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত করবে গভীরভাবে; দ্বিতীয় বৎসরের অর্ধেক যাবে অধীত বিদ্যার পুনরালোচনায়, বাকি সময়টুকু ব্যয়িত হবে অর্জিত বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগে। পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে তারা ছেলেদের নিয়ে হাতেকলমে কাজ করে অধ্যাপনা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। এই সব স্বল্প-শিক্ষিত যুবকদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা নেই, উচ্চ শিক্ষার অভাবে সকল বিষয় ঠিকমত অনুধাবন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করতে হলে বেশ কিছু সময় লাগবে বৈকি। তারপর শিক্ষাকাল শেষ হলে, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতায় যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তাদের প্রত্যেককে মান-পত্র বা উপাধি দেওয়া আবশ্যক। জরুরী অবস্থায় অবশ্য এক বছরের অনুশীলনেই কাজ চলতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে পাঠ্যতালিকাও কিছু রদবদল করে সংক্ষিপ্ত করা উচিত। নচেৎ বিদ্যার্থীদের যথেষ্ট অসুবিধা হতে পারে।

গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র

গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ। আবাসিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা সহজ। কারণ প্রয়োজনের তাগিদে যেখানে ছাত্র-শিক্ষক একত্র সমবেত হয়েছেন, প্রতিদিনের কাজকর্মের মাঝে ছাত্র শিক্ষক সহযোগিতা করেছেন, সেখানে সমাজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি সকলেরই। তা ছাড়া যেখানে নানা সংগঠনের কাজ চলছে, সেখানে অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য-বোধের মধ্যেই আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিকতা। কারণ ব্যষ্টির দৃষ্টি যেখানে সমাজের মঙ্গলের দিকে, সেখানে ব্যক্তিগত কোন স্বৈরতন্ত্রের প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল জনসাধারণের উপরেই নির্ভর করে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমষ্টির কল্যাণ সম্ভব নয়, কাজেই সকলের জন্য সমাজ এবং সমাজের জন্য সকলকে সমান সহযোগিতা করতে হয়। এইজন্যে শিক্ষা, শিল্প এবং যে কোন সৃজনাত্মক কাজই হোক না কেন, তাকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করতে হলে শ্রমবিভাগ অপরিহার্য; যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত ক্ষমতানুসারে প্রত্যেকে আপনাপন কাজ করে যাবেন—সমাজের নির্দেশক্রমে। গণতন্ত্রের মূলকথাও তাই—গণরাজ প্রতিষ্ঠা করাই গণতন্ত্রের গোড়ার কথা। আপামর জনসাধারণের সুখ-সুবিধা, অভাব-অভিযোগ এবং সমবেত সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখেই গণতন্ত্রের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয়। তাই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিদ আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন যে, গণতন্ত্র হচ্ছে জনসাধারণের কল্যাণে পরিচালিত, প্রতিষ্ঠিত, নির্বাচিত গণ-সরকার। কাজেই গণতন্ত্র শুধু জনসাধারণের সুখ-সুবিধার দিকেই দৃষ্টি দেবে না, শাসনতন্ত্র পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হবে সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য।

গণতন্ত্রের এই আদর্শেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি সংগঠিত। কাজেই সক্ল

বিষয়ে সেই বিদ্যালয়গুলি ছাত্র-সমাজের মুখপত্র। সামাজিক কাজের সুবিধার জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ে গণতন্ত্রের অনুরূপ শাসনতন্ত্র রচনা করে গণতন্ত্রের পদ্ধতিতেই সমাজ পরিচালনা, শাসন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সমস্ত কাজ করাই সম্ভব। অধুনাতন কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলি এইরূপ ক্ষুদ্রতম গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এখানে থেকে শিশু লাভ করবে রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যবহারিক ধারণা—যা তার ভবিষ্যৎ জীবনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করতে পারে। কেতাবী জ্ঞান সেখানে শাসন নিয়ন্ত্রণের ব্যবহারিক কাজে লাগে। সে জন্য বিকেন্দ্রিত শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য।

সামাজিক চাহিদানুসারেই রচিত হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা। ব্যক্তিগত প্রয়োজন, সুখ-সুবিধা এবং পারস্পারিক সহযোগিতার ওপর গড়ে তুলতে হবে এমন আদর্শ সমাজ, যেখানে কোন শ্রেণী-বৈষম্য থাকবে না। যোগ্যতানুসারে প্রতেকেই নিজ নিজ কাজ করবে, সমাজের চোখে কেউ কারুর চেয়ে ছোট নয়, সকলের অধিকার সমান। তাই সেখানে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে আছে সহযোগিতা। মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র এবং আবাস। এই অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যেখানে সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, সেখানে নামগোত্রহীন প্রতিটি মানুষের দাবীই অগ্রগণ্য। তাই উৎপাদনাত্মক শিল্প ও কারিগরী শিক্ষাকে অবলম্বন করে বুনিয়াদী শিক্ষা চেয়েছে সেই বহুবাঞ্ছিত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। এই বিশেষ শিক্ষার মধ্যেই তা করা সম্ভব। তাই গান্ধীজীর সেই বিকেন্দ্রিত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কেবল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রসমাজে কার্যকরী হয়েছে। এইরূপ আদর্শ সমাজ—যেখানে পুঁজিবাদীদের অত্যাচার নেই, শাসনের নামে শোষণ চলে না—গ্রাম্য পরিবেশেই তা সম্ভব এবং তার জন্যই বিকেন্দ্রিকরণ অপরিহার্য। ঐশ্বর্যস্ফীত ভোগ-বিলাস-সর্বস্ব শহরের প্রধান আকর্ষণ শিল্প কেন্দ্রগুলিকে গান্ধীজী তাই গ্রামে স্থানান্তরিত করতে চেয়ে-

ছিলেন। আর সেই প্রচেষ্টার পিছনে ছিল গ্রামীন সভ্যতা উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই তিনি বলেছিলেন যে, কল-কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান গ্রামে গ্রামে সংগঠন করতে হবে। তা হলে জীবিকার্জনের জন্য লোকে আর গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছুটবে না। তার আগে অবশ্য গ্রামগুলির সংস্কার এবং সংগঠন একান্ত আবশ্যক। গান্ধীজী তাই শহরের মোহে প্রলুব্ধ জনসাধারণকে আহ্বান করে বলেছিলেন যে, প্রত্যেককেই নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যেতে হবে, নইলে গ্রামের উন্নয়ন, সংস্কার বা সংগঠন কোনটাই সম্ভব নয়।

আমাদের সমাজ আজও গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; ব্যক্তিপ্রাধান্যই এখনো সেখানে বিরাজমান। ফলে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথাটাই সেখানে বড় হয়ে উঠেছে। তাই সহযোগিতার পরিবর্তে সেখানে দেখা দিয়েছে উগ্র প্রতিযোগিতা। জীবন-সংগ্রামে যারা জয়ী হবে—অপরকে বঞ্চিত করে যারা ভোগের সিংহাসন দখল করতে পারবে, তারাই হবে সমাজের ভাগ্য-বিধাতা। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির দ্বারাই আপামর জনসাধারণ হবে শোষিত ও উৎপীড়িত। গুটিকয়েক প্রতিপত্তিশালী লোকই নিজের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের জন্য সমাজের কল্যাণকে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। এই মনুষ্যত্ব-বিহীন কৃত্রিম বাহ্যাড়ম্বরসর্বস্ব চটকদার সমাজব্যবস্থাকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, "এমন চোখ-ধাঁধাঁনো সমাজের প্রতিচ্ছবি—সভ্যতার ব্যাধি, বিলাসের ফাঁস ছাড়া আর কিছু নয়।" বাইরে থেকে হঠাৎ শহরের এই জাঁকজমক দেখলে মনে হয় না যে, আমাদের দেশ নিরন্ন, দরিদ্র। কিন্তু সেটাই গ্রাম-প্রধান দেশের উন্নতির এতটুকু লক্ষণ মাত্র নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "দেহের সমস্ত রক্ত যদি শরীরকে বঞ্চিত করে মুখে সঞ্চিত হয়, তাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা চলে না—সেটা ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয়।"

ইংরাজ-প্রবর্তিত সমাজেও ছিল উৎকট প্রতিযোগিতা। ফলে প্রতিষ্ঠা-লাভের নেশা আর জীবিকা অর্জনের পেশা—মানুষকে স্বার্থান্ধ করে রেখে-ছিল। গান্ধীজীই প্রথম জনসাধারণকে সেই মোহ দূর কর্তে বল্লেন; গ্রাম

সংস্কারের কাজে জনসাধারণকে আহ্বান জানালেন, এবং বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিই হলো তার কর্মকেন্দ্র। তাই সেখানে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে আছে সহযোগিতা, আর এই সহযোগিতাই গণতান্ত্রিক সমাজের প্রাণস্বরূপ।

তাই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলনে এত সচেষ্ট হয়েছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষা জীবনকেন্দ্রিক এবং জনগণের মঙ্গলের জন্যই পরিকল্পিত; কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষার মত গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে শুধু জনপ্রিয় নয়, কার্যকরী হয়ে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের ব্যবহারিক শিক্ষার মহড়া চলবে বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্রে।

কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষা গণতান্ত্রিক সমাজের কল্যাণ সাধন করবে। শুধু তাই নয়, গণতান্ত্রিক সমাজের দায়িত্বশীল ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার ভার গ্রহণ করতে পারবে এই বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্রগুলি।

তা ছাড়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সম-দায়িত্বশীলতা ও জনগণের সম-অধিকার যে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র, তার প্রস্তুতিই চলেছে বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্রে। তাই বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়েছে সমান অধিকারপ্রাপ্ত, স্বাধীন এবং সম-দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার ভার। বুনিয়াদী শিক্ষা তাই প্রথম থেকেই প্রতিটি ছাত্রকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চায়; আর সে দেশাত্মবোধ জাতীয় চেতনা ভিন্ন গণতন্ত্র গঠন বা সংরক্ষণ সম্ভবপর নয়। দেশাত্মবোধই সমস্ত দলাদলি আর বিরোধের প্রতিরোধ করে। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্যও সেই দিকে।

তা ভিন্ন গণতন্ত্রের জন্য যে ঔদার্য, যে সার্বজনীন কল্যাণকর প্রচেষ্টার আবশ্যক, তারও মহড়া চলেছে বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্রে। কারণ এই শিক্ষার প্রধান নীতি হচ্ছে সমাজ-সেবা এবং দেশ-হিতৈষিতা।

শেষ কথা এই যে, ভারতের সভ্যতা ও শিক্ষার মূলে রয়েছে একটা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক একাত্মবোধের সাধনা, আর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতিধর্ম নির্বিশেষে 'বহু'র মধ্যে একের সন্ধান করা। আর সেই সার্বজনীন

চেতনা থেকেই গণতন্ত্রের সূচনা এবং সেই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে যে সহযোগিতা, একাত্মতা এবং সংগঠনের প্রয়োজন, তার ব্যবহারিক প্রয়োগের হাতেখড়ি হচ্ছে প্রতিটি বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্রে। এক কথায় বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্রগুলিকে গণতন্ত্রের গবেষণাগার বলা চলে।

পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয়

শিক্ষা পরিবর্তনশীল। যুগে যুগে নানা শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। তবুও শিক্ষার কোন চূড়ান্ত পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। শিক্ষার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে জীবন-প্রস্তুতির গবেষণা চলেছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে শিক্ষাকে কতখানি জীবনের কাজে লাগানো যায়, কি সহজ স্বাভাবিক অকৃত্রিম উপায়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব, এখনো সে কথা ভাববার যথেষ্ট অবকাশ আছে, তার জন্য ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে সে গবেষণার কাজ চলতে পারে।

সাধারণতঃ দুটি কারণে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। প্রথমতঃ শিক্ষাকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষণা ও তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য যেমন গবেষণাগারের প্রয়োজন, তেমনি নবপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের। সেখানে শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলাফল থেকে তুলনামূলক ভাবে পদ্ধতির গুণাগুণ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা লাভ করা যেতে পারে। শিক্ষা-প্রগতির দিক থেকে সেটা মস্ত বড় লাভ। আর দ্বিতীয় কারণ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ। তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগের সুযোগ। যে সমস্ত বিদ্যার্থী প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবার জন্য শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষা নিতে আসবেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার গবেষণাগার হবে এই বিদ্যালয়গুলি। সেখানে তাঁরা কর্মকেন্দ্রিকশিক্ষা সম্বন্ধে

ওয়াকিবহাল হবেন, নিত্য অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করবেন ; এবং অধীত বিদ্যাকে ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা যাচাই করে দেখবেন, কোন পদ্ধতি কোন ক্ষেত্রে কতখানি কার্যকরী ; এবং নীতিকে রীতিতে, কথাকে কাজে রূপান্তরিত করে দেখবেন,—তবেই মত ও পথের সমন্বয় সাধিত হবে। তা ছাড়া শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্যের বাস্তব প্রয়োগ এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় মতবাদ ও সমস্যা সমাধানের জন্যই পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় অপরিহার্য। অধুনাই যে, এই ধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হ'য়েছে, তা নয়। প্রচলিত প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য পূর্বেও প্রত্যেকটি শিক্ষাকেন্দ্রে ঐ ধরণের বিদ্যালয়ের বিশেষ দরকার ছিল। কিন্তু নানা কারণে শিক্ষা-ব্যবস্থার এই ব্যবহারিক দিকটা একেবারে অবহেলিতই ছিল। আজ শিক্ষা-ব্যবস্থার সে দৃষ্টি-ভঙ্গী গিয়েছে সম্পূর্ণ পাল্‌টে। তাই জ্ঞানমুখী থেকে শিক্ষা যতই কর্মমুখী হয়ে উঠছে, তত-ই তার কর্মের ক্ষেত্র নানা দিকে প্রসারিত হচ্ছে। কর্মের ব্যাপকতা কি ভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থায় যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে,—তার জন্যই তো পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন সর্বাধিক।

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় কিন্তু এত হাঙ্গামা ছিল না এবং নেইও। তার কারণটা অবশ্য এই যে, গতানুগতিক-পদ্ধতি-বিদ্‌দের কাছে শিক্ষাটা ছিল স্রেফ্ পরিবেশনের ব্যাপার। ছাত্ররা ছিল সেই মতবাদের ধারক ও বাহক মাত্র। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় শিক্ষকদের নির্দেশিত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে হতো। ফলে 'শোনা' এবং 'পড়া' এই দুটো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশুরা সদ্য অভিজ্ঞতা থেকে কিছু জানতে পারতো না ; তাদের জ্ঞান আসতো 'হাতফের' হয়ে। নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনই এইখানে ; এবং এই নতুন পদ্ধতি এতই মনোবিজ্ঞানসম্মত হয়েছে যে, এ বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন হয়েছে সব চেয়ে বেশী।

তাই সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেমন হওয়া উচিত, তার উত্তরে শিক্ষাবিদ্

ষ্টিফেন্‌সন মন্তব্য করেছিলেন যে, "আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে একটি গবেষণাগার, নির্জীব শ্রোতাদের প্রেক্ষাগার নয়।"

পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিবেশ কেমন হবে, সে সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্‌রা অনেক নির্দেশ দিয়েছেন। সকলেই কিন্তু অকৃত্রিম স্বাভাবিক পরিবেশের কথাই উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে শিশুদের কাছে ছোটখাটো পৃথিবী বিশেষ—যেমন ক্ষুদ্র সুন্দর পৃথিবীর কল্পনা করতে আমরা ভালবাসি, ঠিক তেমনি। সেখানে শিশুর কোন কিছুরই অভাব হবে না—গানে-কথায়-নৃত্যে-লেখাপড়ায়-খেলায় সেটা হবে শিশুদের 'সব পেয়েছির আসর'।

॥ বিদ্যালয়ের বাহ্যিক গঠন ॥

সব দিক থেকে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়টি আদর্শ হওয়া উচিত। কেবল সুন্দর পরিবেশ হলেই চলবে না, সৌন্দর্য, অবস্থান এবং সুব্যবস্থার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। যাতে কোন দিক থেকেই শিশুদের কোন অসুবিধা না হয়, সর্বাগ্রে সে ব্যবস্থাই করতে হবে। যে পরিবেশ শিশুর দেহ ও মনে প্রভাব বিস্তার করে, সে পরিবেশ স্বাভাবিক সুন্দর না হলে কৃত্রিম উপায়ে তাকে দর্শনীয় করে তুলতে হবে। স্থান নির্বাচনের সময় সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য এবং সুবিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত হবে আলো-বাতাস-যুক্ত প্রাঙ্গণে। অপেক্ষাকৃত উঁচু কাঁকরময় বেলে-মাটি-যুক্ত শুকনো জমির উপর বিদ্যালয় গৃহ-নির্মিত হওয়া উচিত। শহর বা গ্রামের এমন স্থানে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে, যেখান থেকে হাটবাজার, সরকারী বীজাগার ও ডাক্তারখানার দূরত্ব যেন খুব বেশী না হয়।

বিদ্যালয়-গৃহ এবং তার বাহ্যিক পরিবেশ অবশ্যই হবে সুপরিকল্পিত। তার গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও চিন্তা করতে হবে। খুশী মত যেমন তেমন বিদ্যালয় গৃহ-নির্মাণ না করে, 'এস', 'টি', 'ঈ' প্রভৃতি যে-কোন একটি আকৃতির

বিদ্যালয় গঠন করা যেতে পারে। এই ঘরবাড়ী, খেলার মাঠ, ফুলের বাগান, প্রভৃতির জন্য অন্ততঃপক্ষে ৬ বিঘা জমির প্রয়োজন। সম্ভব হলে বিদ্যালয়-গৃহ পাকা হওয়াই ভাল। আর যদি একান্তই অর্থাভাব হয়, তাহলে ইটের দেওয়ালের উপর টিন বা এ্যাসবেস্‌টাসের ছাউনি দেওয়া যেতে পারে। খড়ের ছাউনি দিলে, পৌনঃপুনিক খরচা বেশী হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

॥ চাষবাস ও পশুপালন ॥

বিদ্যালয়-সংলগ্ন থাকবে চাষ-আবাদের জমি আর ফলফুলের বাগান। বাগানে ছেলেরা ফলফুলের গাছ লাগাবে, তার যত্ন করবে; আর কৃষিক্ষেত্রে চলবে সারাবছরের কৃষিকাজ। তা ছাড়া পোলট্রিতে থাকবে হাঁস, মুরগী, খরগোস, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী পালনের ব্যবস্থা। এই সমস্ত জীবজন্তু পালনের দায়িত্ব থাকবে ছেলেদের উপর। তারা জীবজন্তুদের আচার-আচরণের সঙ্গে পরিচিত হবে, তাদের বিষয় অনেক কিছু জানবে, শিখবে, দেখবে; এবং সর্বোপরি তাদের পর্যবেক্ষণ করে শিশুদের অফুরন্ত কৌতূহল মিটবে।

॥ খেলার মাঠ ॥

এ ছাড়া বিদ্যালয়ের নিজস্ব খেলার মাঠ থাকবে। সম্ভব হলে পৃথক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র মাঠ অথবা দু-তিনটি শ্রেণীর জন্য আলাদা একটি মাঠ হলে খুবই ভাল হয়। এই খেলার মাঠই পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ের একটি প্রশস্ত শিক্ষার ক্ষেত্র—শিশুদের আনন্দ-নিকেতন। খেলাকে বাদ দিয়ে যেমন শিশুদের ভাবা যায় না, তেমনি খেলার মাঠকে বাদ দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা চিন্তা করাও কঠিন। তাই খেলার প্রয়োজন ও উপযোগিতার কথা বলতে গিয়ে হ্যাচিন্‌শন মন্তব্য করেছিলেন যে, "ক্রীড়াক্ষেত্র-বিহীন বিদ্যালয়ের চেয়ে বিদ্যালয়-বিহীন খেলার মাঠ-ই অনেক শ্রেয়।"

কাজেই যে খেলার মাঠের উপযোগিতা এতখানি, সেই খেলার মাঠটিকে সর্বতোভাবে সুন্দর করে তুলতে হবে। আয়োজনে, ব্যবস্থায় ও পরিচালনায় কোন ত্রুটি রাখলে চলবে না। খেলার মাঠটি হবে পূর্বপরিকল্পিত; এবং সম বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলার উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া-নেওয়ার সুব্যবস্থাও থাকবে। তা ছাড়া আদর্শ ক্রীড়া-কেন্দ্র গঠনের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হবে 'নাগর-দোলা', 'দোলনা', 'জংলা বার', 'নীচু বার', 'সি-শ' প্রভৃতি খেলাধূলার অপরিহার্য যন্ত্রাদি ও সাজসরঞ্জাম।

॥ শ্রেণী-কক্ষ ॥

এবার শ্রেণী-কক্ষের ব্যবস্থাপনায় আসা যাক। পঠন-পাঠনের সব দিকে দৃষ্টি রেখেই পৃথক এবং স্বতন্ত্র স্থানে বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করতে হবে। যে শ্রেণী যেখানেই হোক না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিল্প বা হাতের কাজের শ্রেণীটি যেন সাধারণ শ্রেণী-কক্ষ থেকে অনেকটা দূরে থাকে। নচেৎ কোন একটি শিল্পশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের হৈ-হুল্লোড়ে পাশের সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রদের পঠন-পাঠনের ব্যাঘাত হতে পারে। শিল্প কাজ ছাড়া শ্রেণীগত খেলাধূলার সময়, স্থানাভাবে ঐ ধরণের অসুবিধা হয় সব চেয়ে বেশী।

সাধারণ শ্রেণীর জন্য পাঁচটি শ্রেণীকক্ষের একান্ত প্রয়োজন। ঘরগুলি প্রশস্ত এবং প্রচুর আলো-বাতাস-যুক্ত হওয়া উচিত। ছাত্রেরা যাতে শ্রেণী-কক্ষে অবাধে চলাফেরা করতে পারে, উঠা-বসায় যাতে এতটুকু অসুবিধে না হয়, সেজন্য ত্রিশটি ছাত্রছাত্রীর জন্য অন্ততঃপক্ষে ৪৫০ বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন। প্রত্যেক শ্রেণী-কক্ষে পাঠাগার এবং শিশুদের সংগৃহীত জিনিস-পত্র সাজিয়ে রাখারও বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।

হস্তশিল্পের জন্য অন্ততঃ তিনটি পৃথক কক্ষ থাকা উচিত। শিল্পকাজের যন্ত্রপাতি, উপকরণ এবং নির্মিত দ্রব্যাদি রাখার জন্য দুটি আলমারী অবশ্যই থাকবে। শিল্পের শ্রেণী-কক্ষে কাজের সুবিধার জন্য ৫০০ বর্গফুট স্থান থাকা

উচিত। সাধারণ শ্রেণী ও শিল্পাগার ছাড়াও প্রস্রাবাগার, এবং পানীয় জলের পৃথক ঘরের ব্যবস্থা থাকবে। যেখানে সেখানে প্রস্রাবাগার বা পায়খানা থাকা ঠিক নয়। খেলার মাঠের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে সাধারণতঃ পায়খানাদি নির্মাণ করা উচিত। স্থানাভাব হলে ঠেলা পায়খানার (Trolly) ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এ ছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য থাকবে একটি কার্যালয়। বিদ্যালয়ের যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কয়েকটি আলমারীতে, খাতাপত্তর 'তাক' বা 'হোয়াট্‌নটে' থাকবে বেশ কেতাদুরস্ত ভাবে সাজানো। কার্যালয়ে অন্ততঃপক্ষে ৩০০ বর্গফুট স্থান থাকাই বাঞ্ছনীয়। কার্যালয়টি বিদ্যালয়ের সামনে, মধ্যে অথবা এক প্রান্তেই হওয়া উচিত।

॥ আসবাবপত্র ॥

পরীক্ষামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের বিশেষ প্রয়োজন নেই, এটাই অনেকের ধারণা। তাঁরা মনে করেন যে, ছেলেদের বসার জন্য সামান্য দু-একটা চাটাই বা মাদুর হলেই যথেষ্ট, চেয়ার বেঞ্চের কোনই প্রয়োজন নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকেও মতটাকে গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যনীতির দিক থেকে কথাটাকে সহজে সমর্থন করা যায় না। প্রথম কারণ শিশুরা সোজা হয়ে নিখুঁত ভঙ্গীমায় কিছুতেই বসতে চায় না। উবু হয়ে সামনে ঝুঁকে অথবা ডাঁয়ে কিংবা বাঁয়ে বেঁকে বসতে ভালবাসে। দৈহিক বিকাশের দিক থেকে এই ত্রুটিপূর্ণ বসবার ভঙ্গীটি বড়ই মারাত্মক। দ্বিতীয় কারণ মাদুরে বা চাটাই-এ বসে লেখাপড়ার সময় শিশুরা কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে; অনেক সময় পাঠে অখণ্ড মনোযোগও থাকে না, এবং অপেক্ষাকৃত আরামজনিত আলস্য থেকে ঘুম আসে। সেই সব অসুবিধা দূর করার জন্যই ছোট ছোট টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাবপত্রের বিশেষ প্রয়োজন। তাতে বসা, উঠা, লেখাপড়া এবং কাজকর্ম করা—সমস্তই

ভালভাবে চলতে পারে ; এবং স্বাস্থ্যনীতির দিক থেকেও তাদের দৈহিক কোন বিকৃতিও ঘটবার ভয় নেই। কাজেই প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক চেয়ার টেবিল ; অথবা দুজনের জন্য একটি টেবিল ও বেঞ্চের ব্যবস্থা করাই শিশু মনস্তত্ত্ব-সম্মত। যদি অর্থাভাবে চেয়ার টেবিল বা বেঞ্চের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়ে উঠে, তবে ছোট ছোট নীচু টুল এবং অপেক্ষাকৃত উচু বেঞ্চ দেওয়া যেতে পারে। উচু বেঞ্চগুলো অবশ্য সামনের দিকে ঢালু হবে (পরিমাণে এই বেঞ্চগুলি হবে ৬′ × ২½ ও উচ্চতায় ২৪″ অথবা ৬′ × ½ও ১০″ উঁচু হওয়া ভাল)।

এক জোড়া ব্ল্যাকবোর্ড ও শিক্ষকের জন্য চেয়ার টেবিলেরও প্রয়োজন। তা ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীতে খোলা নীচু বইয়ের আলমারী থাকবে—যা থেকে ছেলেমেয়েরা ইচ্ছে মতন বই নিয়ে পড়তে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি প্রদর্শনী টেবিল (আকার ৫′ × ৮′ × ৩′) থাকা ভাল। শিক্ষা-উপকরণ হিসাবে বিভিন্ন দেশের ম্যাপ, নানা বিষয়ের মূল্যবান চার্ট, গ্লোব, রিলিফ ম্যাপ্ প্রভৃতি রাখা দরকার। প্রত্যেক শিক্ষকের জন্যও থাকবে একটি ছোট আলমারী। সেখানে শিক্ষকমশাইরা তাদের প্রয়োজনীয় বইপত্তর, খাতা এবং শিক্ষা-উপকরণ সযত্নে রেখে দেবেন। হস্তশিল্পের শ্রেণীতে শিল্প অনুসারে বসবার জন্য টুল বা আসনের ব্যবস্থা থাকবে। তা ছাড়া প্রত্যেক শিশুর জন্য স্বতন্ত্র-'হুকে' ঝোলানো থাকবে তোয়ালে বা গামছা এবং বাথরুমে থাকবে জল সাবানের ব্যবস্থা। শ্রেণী-কক্ষের জানালাগুলি অপেক্ষাকৃত নীচু হওয়া প্রয়োজন, যাতে অবাধে বাইরের আলো বাতাস ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসা করতে পারে। তা ছাড়া শিশুরা শ্রেণী-কক্ষে বসেই যেন বাইরের সৌন্দর্য দেখতে পায়।

॥ গবেষণাগার ॥

প্রত্যেক পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে থাকবে একটি গবেষণাগার। একজন

শিশু-মনস্তাত্ত্বিক এবং শিশু-শিক্ষায় বিশেষজ্ঞের উপর তার সমস্ত ভার ন্যস্ত থাকবে। সেখানে শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিশুদের বিচার বিবেচনা করে শিশু-জীবনের বৈশিষ্ট্য, তথ্য এবং নানা জটিলতর সমস্যা সমাধানের পথ উদ্ভাবন করতে হবে। পিছিয়ে-পড়া, স্বাভাবিক, এবং প্রতিভাশালী শিশুদের মনস্বিতার গড়, যোগ্যতার মান পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোন শিক্ষা-পদ্ধতি কোন পরিবেশে কতখানি কার্যকরী হবে লিখন-পঠনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি, না শব্দানুক্রমিক পদ্ধতি বেশী ফলপ্রসূ হবে, তা গবেষণালব্ধ ফলাফলের দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ভাল কি মন্দ তারও যথার্থ মূল্য যাচাই করা হবে, যোগ্যতা প্রমাণিত হবে এই সব গবেষণাগারে। শিশু-শিক্ষা-সংস্কার ও সমস্যা সমাধানের দিক থেকে এই গবেষণাগারগুলির গুরুত্ব হবে সব চেয়ে বেশী। এখানে যদি নিষ্ঠার সঙ্গে শিশুদের নির্ভুলভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষণ করা যায়, তাহলে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার পথ সুগম হবে, শিশু-প্রতিভার অপমৃত্যু বন্ধ হবে—দেশ জুড়ে শিশু-শিক্ষার আবহাওয়া বদলে যাবে; সেই হবে সত্যিকার শিশু-শিক্ষার সন্দেহাতীত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা।

॥ গবেষণা সমিতি ॥

এই গবেষণাগারগুলি হবে উন্নততর গবেষণা-সমিতির আঞ্চলিক শাখা। দশ বারোটি গবেষণাগারের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তিনজন বিশেষজ্ঞ শিশু-মনস্তাত্ত্বিকদের নিয়ে এই সমিতি গঠিত হবে। বছরে অন্ততঃ চার বার এবং কমপক্ষে দুবার এই সমিতি বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন। সেখানকার বিশেষ সভায় শিশু-শিক্ষাবিদ্‌রা শিশু-সমস্যার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে একটা কার্যকরী সিদ্ধান্তে পৌছাবেন। আঞ্চলিক গবেষণার বিভিন্ন ফলাফল নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা, বিচার এবং পরীক্ষা করে দেখবেন

এই গবেষণা-সমিতির বিশেষজ্ঞরা। শিশুদের মান উন্নতির প্রগতিপত্র, দৈহিক, আত্মিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের ফলাফল নিয়ে যে চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, সেগুলি হবে শিশু-শিক্ষার প্রামাণিক পন্থা। এই গবেষণা সমিতিগুলি যদি শহরাঞ্চল থেকে জেলার প্রত্যেক বিভিন্ন গবেষণাগারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, এই ধরণের উন্নততর গবেষণার কাজে ব্যাপৃত হন, তা হলে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার দুর্নাম ঘুচবে, এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার যথার্থ সার্থকতাকে আমরা সত্যই প্রত্যক্ষ করতে পারবো।

নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োগ-ক্ষেত্র হবে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়গুলি। জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রস্তুতি, প্রয়োগ এবং পরীক্ষা চলবে বিদ্যালয়ে এবং গবেষণাগারে। শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে সব জিনিস করতে হবে, তার সব কিছুই 'হবু শিক্ষক' শিক্ষার্থিদের শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আহরণ করে, এই সমস্ত শিশু-বিদ্যালয়ে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে এই শিক্ষার্থিরা কিভাবে পঠন পাঠনের কাজ চালাবেন, কি কি শেখাবেন এখানে তার একটু আভাস দিচ্ছি :—

॥ শরীরচর্চা ॥

স্বাস্থ্যই জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ও নিয়মিত ব্যায়ামের প্রয়োজন। তাই সর্বাগ্রেই ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে নজর দিতে হবে। কেমন ভাবে এবং কি কি আচার-আচরণের দ্বারা শিশুদের এই বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে এখানেই তার মহড়া শুরু হবে। স্বাস্থ্য-বিষয়ক নানা ধরণের ছবি দেখানো এবং সেই ভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার ব্যবহারিক নির্দেশ দিতে হবে। তা ছাড়া নাচগান, ছান্দিক ব্যায়াম প্রভৃতি যে, সব খেলাধূলার প্রতি শিশুদের ঝোঁক খুব বেশী, যতদূর সম্ভব সেগুলির প্রচলন করতে হবে। এ ছাড়া ব্রতচারী গান ও খেলার মধ্য

দিয়ে শিশুদের মধ্যে সমাজসেবার আগ্রহ এবং উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে হবে। এর মধ্য দিয়ে আসবে সাম্প্রদায়িক ঐক্য, সমাজ-সংস্কারের মনোভাব, এমন কি আধ্যাত্মিক চেতনাও জাগ্রত হয়ে উঠবে।

॥ নৈতিক শিক্ষা ॥

সমাজসেবা বা পরার্থপরতা নৈতিক চরিত্র বিকাশের সহায়ক। ধর্ম-নির্বাসিত-শিক্ষা-ব্যবস্থায় নৈতিক চরিত্রের বিকাশ হওয়া সুকঠিন। সেবার মনোভাব থেকে পূজার মনোভাব জাগে। সেই ব্যক্তিগত পূজার মনোভাবকে সার্বজনীন প্রার্থনায় সহজেই রূপান্তরিত করা যায়। তার জন্যই পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে সামূহিক প্রার্থনার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতের নানা ধর্ম ও কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ এবং শ্রদ্ধাকে জাগ্রত করে তুলতে হলে, নানা ধর্মগ্রন্থের মনোনীত বাণী পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে, ছেলেমেয়েদের নৈতিক উন্নতির সঙ্গে পরধর্ম-সহিষ্ণুতাও বাড়বে।

॥ সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধি ও পরিবেশ-পরিচিতি ॥

সাধারণ জ্ঞান শিশুমাত্রেই একটু কম থাকে। সেজন্য ছেলেদের দিয়ে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করানো এবং খবরাখবর বলানোর বিশেষ প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী নানা বিষয় পাঠ, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দান এবং আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে থাকবে ছেলেদের লেখা দেওয়াল-পত্রিকা বা তাদের সংগৃহীত হালের খবর লেখা বোর্ড। উপরন্তু থাকবে সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত বিশেষ বিশেষ ঘটনা, খবর এবং ছবি,—পেষ্ট বোর্ডে ভাল করে আঠা দিয়ে আটকে রাখার সুব্যবস্থা।

॥ বিতর্ক সভা ॥

চিন্তা ও বাচন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বিতর্ক সভার। ছেলেদের উপযোগী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমবেত আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। মাসে অন্ততঃ দুবার এই ধরণের আলোচনা সভা হবে, তাতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই

উপকৃত হবেন। বিতর্ক সভায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে প্রতিযোগিতাও হতে পারে। সে আলোচনা অবশ্য হবে তর্কের খাতিরে। শ্রেণীগত বিষয়গুলি আগে থেকেই ঠিক করে দিতে হবে। ছেলেদের দ্বারাই এগুলি পরিচালিত হবে। তার বিচার বিবেচনা এবং সভাপতিত্ব করবে ছেলেরাই। এমন কি কার্যনির্বাহ-সমিতির দায়িত্বও থাকবে ছেলেদের উপর। তবে প্রয়োজন-বোধে শিক্ষক মশাইরা মাঝে মাঝে তাদের ডেকে পরিকল্পনা কার্যপদ্ধতির বিষয় পরামর্শ দেবেন—এই মাত্র।

॥ পাঠাগার ॥

বিদ্যালয়ের পাঠাগার পরিচালনা করবে ছেলেরা। তারাই নিজেদের মধ্যে বই লেনদেন করবে এবং যাবতীয় পুস্তকের হিসাব রাখবে। শিক্ষকের নির্দেশ মত গল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পুস্তকাদি প্রত্যেক শ্রেণীর আলমারীতে ঠিক মত সাজিয়ে রাখবে। এতে ছেলেদের দায়িত্ব পালনের শক্তি, পরিচালনা ও সংগঠন ক্ষমতার সম্যক স্ফুরণ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাঠ-তৃষ্ণা ও পঠন অভ্যাস বাড়বে।

এ ছাড়া থাকবে নাচগান, অভিনয় এবং আবৃত্তির ব্যবস্থা। এই সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুদের সঙ্কোচ ও জড়তা দূর হবে, উচ্চারণ-শুদ্ধি ঘটবে, এক কথায় শিশুরা কাজে কথায় দক্ষ ও চতুর হয়ে উঠবে। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তারা কেবল অভিনয়-চাতুর্য আয়ত্ত করবে না, তাদের মনের ভাব, আবেগ ও আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বাড়বে। এই সব শিশু-নাটকগুলি শিশুদের দিয়ে লেখাতে পারলেই ভাল হয়।

॥ সামাজিক ও গণতান্ত্রিক চেতনা ॥

আবাসিক বিদ্যালয় শিশুর সমাজ-বিশেষ। সেই সমাজ-জীবনের মধ্যে বাস করে, নানা কাজ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা সত্যিকার সমাজ-চেতনা লাভ করবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তারা সমাজব্যবস্থাকে জানবে।

আর জানবে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোটিকে। সমাজ ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে যাতে শিশুদের সত্যিকার বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মে, সেইজন্য শিশু-রাষ্ট্র-শাসন, পরিচালনা, নির্বাচন সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা আছে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে। শিশুরা শাসনতন্ত্র অনুসারে ভোটের দ্বারা যাদের মন্ত্রী, সচিব, সভাপতি প্রভৃতি নির্বাচিত করবে, তারাই সাধারণের প্রতিনিধি হয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষুদে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এইভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিশুরা গণতন্ত্রের স্বরূপকে বুঝতে শিখবে। ফলে, তারা উত্তর-জীবনে উপযুক্ত নাগরিক হওয়ার যথার্থ শিক্ষা লাভ করবে।

॥ উৎসব ॥

এ ছাড়া পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বারো মাসে তের পার্বণ তো থাকবেই। মাসে মাসে উৎসব, সপ্তাহে কৃষ্টি-সম্মেলন, কখনো বা প্রদর্শনী, ঋতু-উৎসব, জন্মতিথি—কি-না থাকবে পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে! উৎসবের আনন্দ আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিশু-শিক্ষা যেমন সহজ স্বাভাবিক ধারায় প্রবাহিত হয়, শিক্ষার তেমন সহজ প্রবণতা আর কিছুতেই দেখা যায় না। একটা উৎসবকে কেন্দ্র করে শিশুরা কত বিচিত্র কাজ করে, আল্পনা দেয়, অভিনয় আবৃত্তি করে, কত বিষয় পরস্পর আলোচনা করে যা শেখে,—হাজার পৃষ্ঠা পুঁথি পড়ে তা সম্ভব নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান

নতুন পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলেই নানা বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পরিবেশ, প্রয়োগ, ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অসুবিধা থেকেই যত বাধা আসে। সঙ্গত উপায়ে সেই অসুবিধাগুলো দূর করাই হচ্ছে শিক্ষা-সমস্যা-সমাধানের উপায়। প্রথমেই দেখতে হবে কি কি কারণে সমস্যাগুলির উদ্ভব হয়েছে, এবং কেমন করে কি উপায়ে তার সুরাহা করা যায়।

পরিবেশের আগেই কিন্তু মতবাদের কথা উঠে। শিক্ষা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তবুও সে মতবাদের মধ্যে তেমন বিরোধ নেই। বিরোধ আছে সাধারণ মতবাদে। জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত, তাঁদের অন্ধ গোঁড়ামি বেশী; তাঁরা সনাতনের জায়গায় নতুনকে বসাতে চান না। নতুন শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রোশ প্রবল। এঁদের মধ্যে যাঁরা মধ্যবিত্ত শিক্ষক,—সাবেকী শিক্ষায় যাঁদের অস্থিমজ্জা গড়া—তাঁরাও বৈমাত্র ভাইয়ের মত বুনিয়াদী শিক্ষাকে অবহেলার চোখে দেখেন। শিক্ষার অন্য কোন নতুন পদ্ধতিকে তাঁরা মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের জানা উচিত শিক্ষা-বিপ্লব জাতীয় জাগরণের আগমনী। তা ছাড়া যে শিক্ষা-ব্যবস্থা বিজ্ঞানের দিক থেকে প্রামাণিক, তার সম্বন্ধে সঠিক কিছু না জেনে তার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা উচিত নয়। আর অশিক্ষিত জনসাধারণ এ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেন না। কাজেই এ শিক্ষার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তা হলে এর প্রসারের পথ অনেকটা সুগম হবে। প্রচারের এ দায়িত্ব সরকারী ভাবে শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত হলে, নিশ্চয় সুফল পাওয়া যাবে।

মতবাদের পর পরিবেশের কথা ভাবতে হবে। পরিবেশই শিশু-শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। অথচ অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান এবং পারিবেশের খুবই অভাব। সেখানে শিক্ষার যত সুন্দর আয়োজন হোক না কেন, পরিবেশের অভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা চলে। বিদ্যালয়টি দুটি গ্রামের মধ্যবর্তী নির্জন শ্মশানের ধারে অবস্থিত। সন্ধ্যার পর কেউ সেখানে যেতে বা থাকতে রাজী হয় না। শিক্ষকদের কোয়ার্টারগুলি খালিই পড়ে থাকে। আদর্শ পরিবেশের দিক থেকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পক্ষে এ স্থানটি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ছ' বিঘা জমি আর চার হাজার টাকার বিনিময়ে এমন স্থানে কখনই বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করা ঠিক নয়। ওতে আর্থিক অপব্যয় এবং মানসিক

অপচয় দুইই হবার সম্ভাবনা আছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় গ্রামের প্রাণকেন্দ্র হওয়া উচিত। স্থান নির্বাচনের সময় এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে, ঐ ধরণের কোন সমস্যার উদয় হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে পরিবেশকে গড়ে তোলার কথা আসে। গ্রাম সংগঠন ভিন্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন এবং তার সংরক্ষণ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। কারণ প্রতি দু মাইল অন্তর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে গেলে দেখা যায় যে, অনেক স্থানে লোকবসতি এতই বিরল যে, সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন করতে গেলে ছাত্র মেলাই ভার হবে। হয় তো ছাত্রাভাবে বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে regrouping of villages ছাড়া গত্যন্তর নেই; অর্থাৎ যেখানে ঘন লোক-বসতি আছে, সেখানকার কিছু লোক এনে জনবিরল গ্রামগুলিকে বর্ধিষ্ণু করে তুলতে হবে। তখন বিদ্যালয় পরিচালনায় কোন অসুবিধা হবে না। সাধারণের সহযোগিতা এবং ছাত্রাভাব—এর কোনটারই সম্ভাবনা থাকবে না।

প্রয়োগটা বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবহারিক দিক। এটার উপর আরো গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ হাতেকলমে শিক্ষার সার্থক প্রয়োগের উপরই তার সাফল্য নির্ভর করে অনেকখানি। শিক্ষণ-পদ্ধতির পিছনে যতই মনস্তত্ত্বের ভূরি ভূরি নজির আর শিক্ষানীতির তত্ত্বকথাই থাক না কেন, প্রয়োগের দোষে সবই মাঠে মারা যেতে পারে। আজ বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকদের মনে যে বিরূপ ধারণা জন্মেছে, তা পদ্ধতির দোষে নয়, প্রয়োগের দোষে। তার দুটি কারণ আছে। একটি আর্থিক অনটন, অন্যটি অনাস্থা। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি অনেক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকেরই নিষ্ঠা এবং আস্থা—কোনটাই নেই। কাজেই তাদের দ্বারা এ শিক্ষার কতখানি কল্যাণ হতে পারে, তা ভাববার কথা। এইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশ্বাসী, সমাজসেবক, নিরলস কর্মী, সুযোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষক নির্বাচনের সময় তাদের ব্যক্তিগত আচরণ এবং মনোভাবের কথাই চিন্তা করতে হবে সর্বপ্রথম। তার জন্য প্রয়োজন হলে সপ্তাহ দুই তাদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করে, তারপর তাদের যোগ্য বলে

নির্বাচন করলে ঐ সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। আর্থিক অনটনটা আপাততঃ দূর করা সম্ভব নয়। তবে যাতে নিষ্ঠা ও আস্থা বাড়ে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ ভাল ভাবে চলতে পারে, তার জন্য একটি মডেল বেসিক স্কুলের বিশেষ প্রয়োজন। বিদ্যালয়টি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ভাল হয়। এখন সেখানে যে ধরণের পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালু আছে, সে ধরণের বিদ্যালয়ের কথা বলছি না। আমি বলছি সেই ধরণের বিদ্যালয়ের কথা, যেখানে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি নিয়ে সত্যিকার পরীক্ষা চলতে পারে। কাজে, আদর্শে যে বিদ্যালয় সত্যই 'মডেল'। তা হলে সেই আদর্শ বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ দেখে প্রাথমিক শিক্ষকরা অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারতেন। সুযোগ সুবিধা মত তাঁরা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যে চেহারা দেখতে পেতেন, পদ্ধতির প্রয়োগ নৈপুণ্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করতেন, তার দ্বারা নিশ্চয় বুনিয়াদী শিক্ষার এমন হাল হতো না।

বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়েই যত গোলযোগ। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুশীলন-কেন্দ্র বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্রের কথাই বলছি। অনুশীলন-কেন্দ্রে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা জানেন যে, শিক্ষাপ্রসারের পথে শিক্ষকের দায়িত্ব কতখানি। শিক্ষকের যোগ্যতার উপরই শিক্ষা পরিকল্পনার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অথচ আদর্শ শিক্ষক মেলা ভার। যাঁরা অনিচ্ছায় অনন্যোপায় হয়ে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেন,—তাঁদের হাজার শিক্ষা দিলেও—কখনই তাঁদের আদর্শ ও নিষ্ঠায় উদ্‌বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তা সম্ভব না হলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। একজন শিক্ষাবিদ তাই বলেছেন যে, শিক্ষার যত কিছু সমস্যা তা ছাত্রদের নিয়ে নয়, তা শিক্ষককে নিয়ে। কাজেই খাঁটি শিক্ষক নির্বাচনের দিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। অবশ্য শিক্ষক নির্বাচনের উপায় সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ভাল শিক্ষক না পাওয়ায় ঠিক যেমন ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ হওয়া উচিত ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মোটেই

আশাপ্রদ হচ্ছে না। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চয়তার মধ্যে।

বিদ্যার্থী নির্বাচনের পর শিক্ষণ-কেন্দ্রের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের কথা উঠে। বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বলতে আমি শিল্প বা সঙ্গীত-শিক্ষকের কথা বলছি। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য যে শিল্পকাজ,—সেগুলি যাঁরা শেখান,—তাঁদের সে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হওয়া দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দু-একটি কেন্দ্র ছাড়া সত্যিকার শিল্প-নিপুণ শিক্ষকের একান্তই অভাব। সঙ্গীত শিক্ষকের তো কথাই নেই। কাজেই কোন রকমে কাজ চালানো বিদ্যা নিয়ে, কাজ হয় তো চলতে পারে, কিন্তু আশানুরূপ অনুশীলনের কাজ হতে পারে না। ফলে শিক্ষার আদর্শ ব্যাহত হতে বাধ্য। কাজেই শিক্ষকের শিক্ষকদের যোগ্যতার মান বাড়াতে হবে সর্বপ্রথম। সে বিষয়ে সরকার যদি সচেষ্ট হন, তা হলে শিক্ষকেরা যে-কোন অবকাশ সময়ে শান্তিনিকেতন বা শ্রীনিকেতনে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই সঙ্গীত বা শিল্প বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করে আসতে পারেন। অবশ্য যে-কোন শিক্ষককে সেখানে পাঠালে অত অল্পদিনে, তাঁদের পক্ষে কোন কিছুই শেখা সম্ভবপর হবে না। তবে যাঁদের সঙ্গীত বা যে শিল্প-কাজে স্বাভাবিক নৈপুণ্য বা প্রবণতা আছে, বেছে বেছে তাদেরই পাঠাতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীত শিক্ষক নেই বল্লেই চলে। সেই সমস্ত শিক্ষণ-কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষরা অনেক সময় স্থানীয় কোন সঙ্গীত শিক্ষককে গান শেখানোর কাজে লাগান। সেটা সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু গোলমাল বাধে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শের দিক থেকে। তাঁরা কেউ বুনিয়াদী শিক্ষার লোক নন বলে, সব সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষার মর্মানুধাবন করে সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারেন না, কাজেই তাঁদের সাহায্য নিতে গেলে কিছুটা মুশকিল আছে।

শিক্ষণ কাজের মস্ত বড় অসুবিধা পাঠ্যসূচীকে নিয়ে। দু বছরের মত ব্যাপক পাঠ্যতালিকার বিষয়বস্তু, এক বছরে তা পড়ানো সম্ভব নয়। কোন

রকমে হয়তো তা শেষ করা যায়, কিন্তু ঠিক মত পড়ানো যায় না। সর্বোপরি এমন কতকগুলি কঠিন দুরূহ বিষয় আছে, যা একজন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের পক্ষে আয়ত্ত করা প্রাণান্তকর, ক্ষেত্র বিশেষে সম্ভবও নয়। পাঠ্যতালিকার ফিরিস্তিটি কোন অংশে 'বি-টি'র পাঠ্যতালিকার চেয়ে কম নয়। কাজেই এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি শিক্ষার সুব্যবস্থা ও ছাত্রদের কল্যাণার্থে পশ্চিম-বঙ্গ-শিক্ষাধিকর্তা এ বিষয়ে শীঘ্রই তৎপর হবেন।

পাঠ্যতালিকার চেয়ে আরো কঠিনতর হচ্ছে পরীক্ষা-ব্যবস্থা। যে নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনায় পরীক্ষার স্থান ছিল গৌণ, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থায় এত পরীক্ষার বাহুল্য কেন? যোগ্যতার মান নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন আছে মানি, কিন্তু বর্তমানে যে ধরণের পরীক্ষা চলছে, তার পরিবর্তন আবশ্যক। তবে সাড়ে আঠারো শ মার্কের সমুদ্র যাতে পাড়ি দিতে না হয়, তার জন্য আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর আরোও গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। সারা বছরের জড়িত ফলাফলই পরীক্ষা পাশের প্রধান নিরিখ হওয়া উচিত, শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের অনেকেই এ মত পোষণ করেন। তাত্ত্বিক বিষয়গুলি পরীক্ষার জন্য কয়েকটি ব্যাপক বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া যেতে পারে। প্রবন্ধগুলি অবশ্য হবে 'থিসিস' পর্যায়ের লেখা। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকেরা আগে থেকেই বিষয়বস্তু ঠিক করে দেবেন, কোন কোন পুঁথি থেকে কতখানি হদিস পাওয়া যাবে, তার নির্দেশ দিয়ে দেবেন; সেগুলি অধ্যয়ন করে সারা বছরের অভিজ্ঞতা ও তথ্য থেকে জ্ঞান আহরণ করে, তারা সেগুলি বিশদভাবে লিখবে। এই লিখিত 'থিসিস্' গুলি বাইরের পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সেটাই হবে শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক বিষয়ের পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল। এতে রাত্রি জাগরণ করে বই মুখস্থ করা, পরীক্ষার আতঙ্ক এবং অনর্থক শ্রম-কষ্টের হাত থেকে ছেলেরা রেহাই পেতে পারে।

এর পর প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিদর্শনের কথা আলোচনা করা

যেতে পারে। নব প্রবর্তিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাজ কোন পথে, কেমন ভাবে চলছে, তা দেখার জন্য মাঝে মাঝে পরিদর্শনের বিশেষ প্রয়োজন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দোষ ধরাই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য নয়। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হবে প্রাথমিক শিক্ষকদের উৎসাহ দেওয়া এবং নানা উপায়ে তাদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করা। বুনিয়াদী-শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিদর্শকদের দ্বারাই এ কাজ সুচারু ভাবে সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না। প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে প্রায়ই অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায় যে, তাঁরা অবর পরিদর্শকদের কাছ থেকে মোটেই উৎসাহ পান না। তার কারণ উল্লেখ করে তাঁরা বলেন যে, পরিদর্শকদের অনেকেই বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত নন, কাজেই তাঁরা (পরিদর্শকেরা) বুনিয়াদী শিক্ষাকে আমলই দিতে চান না। তা যদি সত্যি হয়, তবে বুনিয়াদী শিক্ষার যে অশেষ ক্ষতি হচ্ছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত সংবেদনশীল অবর পরিদর্শকের বিশেষ প্রয়োজন।

এবার শিক্ষা উপকরণের কথা ধরা যাক। শিক্ষা উপকরণ, শিল্প দ্রব্যাদি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার অপরিহার্য সরঞ্জাম। ওগুলি প্রয়োজনানুসারে সময় মত না পাওয়া গেলে, কাজের মাধ্যমে কোন কিছুই শেখানো সম্ভবপর নয়। মনে করা যাক, ডাকঘরের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, অথচ কার্ড বোর্ড যন্ত্রপাতি কিছুই পাওয়া গেল না, তখন শিক্ষককে পরিকল্পনা ত্যাগ করে বই ধরে পড়াতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের যা আয়, তাতে তাদের পেটই ভরে না, শিক্ষার জন্য খরচ করবে কি? কিছু কিছু শিক্ষা উপকরণ পাঠানোর সরকারী ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শুনা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষকেরা সময় মত ওসব জিনিসগুলি পান না। একটা 'কন্‌টিন্‌জেন্সি বিল' পাশ হতে কম্‌সে কম ছ মাস সময় লাগে। এক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কিছু করা সম্ভব কি? অবশ্য স্কুলবোর্ড এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকেরা একটু সচেষ্ট হলে এ সমস্যার সুরাহা করতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষান্তে * ছেলেমেয়েদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করার

---

* অর্থাৎ প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর

একটা অসুবিধা আছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে ধরণের শিক্ষা তারা পায়, তার সঙ্গে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন যোগ নেই। তা ছাড়া একটা সম্পূর্ণ নতুন বিদেশী ভাষা—ইংরেজী—তাদের পড়তে হয়, ফলে তারা ভয়ানক মুস্কিলে পড়ে। যতদিন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় না স্থাপিত হয়, তত দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার কিছুটা রদবদল করে এই ধরণের অসুবিধাকে দূর করা যেতে পারে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের আরো দুটি অসুবিধা আছে। প্রথম অসুবিধা ছেলেমেয়েদের সঠিক বয়স নিয়ে। আর দ্বিতীয় অসুবিধা সহশিক্ষার ব্যাপারে। বয়সানুসারে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শ্রেণী-বিভাগের ব্যবস্থা আছে। অথচ পাড়াগাঁয়ের অধিকাংশ বাপ মা ছেলেমেয়েদের সঠিক বয়স জানেন না; আর অনেকে জান্‌লেও ঠিক মত বলেন না। ফলে একই শ্রেণীতে নানা বয়সের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হয়। কাজেই বয়সজনিত নানা অসুবিধা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের মধ্যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে, পঠন-পাঠনে ব্যাঘাত ঘটে। সে অসুবিধা দূর করতে হলে স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করে বয়স নির্ণয় করা যেতে পারে। অথবা গ্রাম্য চৌকিদারদের উপর নির্ভর না করে থানা অফিসাররা যদি স্বয়ং একটু কষ্ট স্বীকার করে সঠিক ভাবে বার্থ রেজিষ্টার রক্ষার ভার নেন, তা হলে আর বিশেষ অসুবিধা থাকবে না। আর সহশিক্ষার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, সেটা যে কত ভ্রান্ত, তা বুঝিয়ে দিলেই, ও কুসংস্কার দূর হবে।

এবার অর্থনৈতিক অসুবিধার কথায় আসা যাক। বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য বহু টাকার প্রয়োজন। শিক্ষা-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন, তার সবটাই সরকারী তহবিল থেকে ব্যয় করা সম্ভব নয়; বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ব্যয়ভারের কিছুটা ধনী গ্রামবাসিদের গ্রহণ করতে হবে। এ যাবৎ যে সমস্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা সরকার ও জনসাধারণের অর্থানুকূল্যেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে

আবশ্যিক এবং বাধ্যতামূলক করতে হলে জনসংখ্যার গড়ে এবং ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যার হারে কত অর্থ ব্যয় হতে পারে, তার একটা আনুমানিক হিসাব ধরা যাক। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ২,২৫,০০,০০০ জন; সুতরাং ৬-১১ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা হবে মোটামুটি ২২,৫০,০০০ অর্থাৎ দশ ভাগের একভাগ। পাঁচটি শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য এক একটি বিদ্যালয়ে ৬ জন করে শিক্ষকের প্রয়োজন এবং স্কুলপ্রতি ৫ × ৩০ = ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকবে। তা হলে ($\frac{২২,৫০,০০০}{১৫০}$) = ১৫,০০০ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে। এখন ১৫,০০০ স্কুলে ৯০,০০০ শিক্ষক লাগবে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ৩২০০০, কিন্তু এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ করছেন। বাকি যারা আছেন, তাঁদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিতে হলে আনুমানিক ৮০,০০০ শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়া দরকার। সুতরাং ১৭।১৮ বছরে ট্রেনিং দিতে গেলে শিক্ষণ-কেন্দ্রের জন্যই মোট ৪৫,০০০ শিক্ষককে ট্রেনিং দিতে হবে। কাজেই ৫০টি ট্রেনিং স্কুল যদি খোলা সম্ভব হয়, তা হলে প্রত্যেকটি অনুশীলন-কেন্দ্রের জন্য (যদি ৬ জন শিক্ষক থাকেন) বছরে অন্ততঃ খরচ হবে ২,৫০,০০ টাকা পৌনঃ পুনিক। আর পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি দুটি কলেজ, ৫০টি শিক্ষণ বিদ্যালয় এবং ৮০০টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তা হলে পৌনঃ পুনিক খরচ লাগবে যথাক্রমে :—

১,০০,০০০, + ৬,০০,০০০ + ৪০,০০,০০০ = ৪৭,০০,০০০ ; এবং এককালীন খরচা লাগবে ২,৫০,০০০,৮৫৬,০০,০০০ = ৫৮,৫০,০০০ অর্থাৎ প্রায় ষাট লক্ষ্য টাকা।* কাজেই বুঝা যাচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য যে বিপুল

* এই আয় ব্যয়ের হিসাবটি কিন্তু কে, ডি ঘোষের 'আমাদের শিক্ষা' থেকে নেওয়া। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার পূর্বেই বইটি লেখা হয়। তারপর এই ক' বছরের আর্থিক আয় ব্যয়ের হিসাব কিছুটা বদলেছে নিশ্চয়, কিন্তু সঠিক হিসাবের তালিকাটি জানা না থাকায়, আমাদের শিক্ষায় মুদ্রিত হিসাবের তালিকাটিই দেওয়া হলো। অবশ্য শিক্ষকের তালিকাটির আনুমানিক হিসাব কিছুটা বদলানো হয়েছে।

—লেখক

অর্থের প্রয়োজন হবে, একা সরকার তা ব্যয় করতে অপারগ। কাজেই জনসাধারণের অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা স্কুলবোর্ড প্রতি বৎসর শিক্ষা খাতে যে ব্যয় করেন, তা বুনিয়াদী শিক্ষার খাতে ব্যয়িত হলে খুবই ভাল হয়।

সমস্যা সমাধানের শেষ কথা হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার জন্য তার স্বপক্ষে অনুকূল জনমত সৃষ্ট করা এবং মাঝে মাঝে বিশিষ্ট-শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে শিক্ষা-সম্মেলনের ব্যবস্থা করা। এই সভায় বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে যে পন্থা কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে, সরকারী নির্দেশে সেই পন্থাই অনুসৃত হবে। এ সম্মেলন নিয়ন্ত্রণের ভার এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচারের দায়িত্ব অবশ্যই সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। তা হলে অবশ্যই বুনিয়াদী শিক্ষায় আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাবে।

শিক্ষক ও সমাজ

শিক্ষকরাই সমাজের কর্ণধার। সমাজের সঙ্গে শিক্ষকের আত্মিক যোগাযোগ বিদ্যমান। যেখানে মানুষের সমাজ আছে, তার শিক্ষা দীক্ষা-আছে, সেখানেই আছেন শিক্ষকেরা। এরাই ছোট বড় সকল মানুষেরই শিক্ষাগুরু। এরা জীবনাদর্শের বাণী, জ্ঞানের মন্ত্র হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত করে তোলেন, গণ-মানস তৈরি করেন; শিক্ষকদের হাতেই গড়ে উঠে জাতির ভবিষ্যৎ। শিক্ষকের মতবাদ নিয়ে যে শিশু বড় হয়ে উঠে, তারাই গুরুর জীবনাদর্শে সমাজ সংগঠন করে তোলে। যুগে যুগে দেশে দেশে তাই হয়ে আসছে।

সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় কার্য বিভাগের সূত্রপাত আদিযুগ থেকেই হয়ে আসছে; এবং সেইরূপ একটি বিধি-ব্যবস্থার প্রতিনিধি

হচ্ছেন এই শিক্ষকেরা অর্থাৎ যিনি শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, তাঁর হাতেই সমাজ তুলে দিয়েছে তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ভার। প্রাচীনকালে এ ভার ছিল গুরুর উপর, আজ তা শিক্ষকের উপর ন্যস্ত হয়েছে। সমাজকে সুন্দররূপে গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেককে তার কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে পালন করতে হবে। কারও দায়িত্বই কম নয়। কিন্তু শিক্ষকের দায়িত্ব আরও উদার ও গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, সমাজ শিক্ষকের উপর এমন ভার দিয়েছে, যার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে বহু অমঙ্গলের আশঙ্কা করা যেতে পারে। সমাজের মঙ্গল অমঙ্গল শুভ অশুভ নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে সেই সমাজের অধিবাসিদের কর্মপন্থা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর যা আবার গড়ে উঠে শিক্ষকের শিক্ষাধারার মধ্য দিয়ে। তাই পরোক্ষভাবে হলেও শিক্ষকই হচ্ছেন সমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা, জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের পথপ্রদর্শক।

অবশ্য শিক্ষিত লোক-সমাজে—বিশেষ করে আমাদের দেশের—শিক্ষকদের সামাজিক প্রতিপত্তি বিশেষ নেই। দারিদ্র্যই তাঁর আত্ম-সম্মান, যোগ্যতা, মতবাদ সমস্তই চুরমার করে দিয়েছে। শহরে কি গ্রাম্য সমাজে কোথাও শিক্ষকেরা মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত নন। শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের বাইরে শহরের ছেলেমেয়েদের কোন খোঁজখবর রাখেন না। সেখানকার শিশুদের যাঁরা অভিভাবক, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত এবং শিশু যতক্ষণ তাঁদের দৃষ্টির সম্মুখে গৃহে অতিবাহিত করে, সে সময় তাঁরা শিশু শিক্ষার কাজটা নিজেরা পরিচালনা করতে পারেন। তাই বলে শিক্ষকের দায়িত্ব যে এতে হ্রাস পেয়ে গেল, আর শিক্ষকের ঔদাসীন্য প্রকাশ পেল তা' বলা চলে না।

কিন্তু গ্রামের সামাজিক পরিবেশ শহরের অনুরূপ নয়। গ্রামের ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশ অভিভাবকরাই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। এক্ষেত্রে হয়তো শিশুরা অনেক অশিক্ষা কুশিক্ষা লাভ করে,—তাদের গৃহ-আবেষ্টনীর বিপাকে পড়ে। তাই গ্রামের শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে সকল দিকে।

ঘরে বাইরে শিশুরা কি করছে তার খবরাখবর রাখতে হবে শিক্ষককে। এমন কি তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের অজ্ঞতার, অশিক্ষার কুফল কি, তা বুঝিয়ে দিতে হবে শিক্ষককে। শিক্ষককে আরও তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে, শিশুর সুশিক্ষার জন্য তাঁদের দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব সুদূরপ্রসারী। তাঁকে আরও চিন্তা করতে হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা। গ্রাম ও শহরের শিক্ষা যদি বিপথগামী হয়, তবে অচিরেই সে সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংসমুখী হবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন। অন্যদিকে শিক্ষকের প্রতি সমাজের দায়িত্বও বড় কম নয়। সমাজ শিক্ষকের উপর যে গুরুভার ন্যস্ত করেছে, সে ভার যাতে সে অনায়াসেই বহন করতে পারে, তার সর্ববিধ ব্যবস্থা সমাজকেই করতে হবে। আজ আমাদের দেশে শিক্ষার যে এই দুর্গতি, শিক্ষকেরা যে বুভুক্ষু, তার জন্য দায়ী আমাদের সমাজব্যবস্থা। প্রাচীন যুগের গুরুরা শুধু যে সমাজ-পূজ্য ছিলেন তা নয়, রাজরাজড়া তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন। তদানীন্তন রাজশক্তি তাঁদের পার্থিব সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু আজ শিক্ষকদের চেয়ে অবহেলিত আর কেউ নেই। শিক্ষকগণ আজ তাঁদের কর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। কেন না শিক্ষকতায় আজ তাঁদের পেট ভরে না। শিক্ষকদের যদি উদয় অস্ত তৈল-তণ্ডুলের চিন্তায় না কাটাতে হয়, তাহলে তাঁরা ছাত্রের, সমাজের, সকলের মঙ্গলের জন্য মাথা ঘামাতে পারেন। তাই আজ দিন এসেছে যখন, তখন সমাজ নিশ্চয়ই ফিরে চাইবে শিক্ষকদের দুর্দশার দিকে। এই সমস্যা সমাধান করাই হবে সমাজের প্রথম কর্তব্য।

॥ গ্রাম সংগঠন ॥

শিক্ষককে সত্যিকার শিক্ষাদান করতে হলে গ্রাম সংগঠনের প্রতি প্রথম

দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি না হলে জ্ঞানামৃত বিতরণ করে লাভ কি? এদিকে দৃষ্টি না দিলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, শিক্ষকের সহিত গ্রাম্যসমাজের কি নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; সেখানে শিক্ষক শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-কর্তা নয়, গ্রাম্য সমাজের কর্ণধার, চিন্তানায়ক। তাই গ্রামের জন-স্বাস্থ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, এমন কি অর্থনীতি ও রাজনীতিরও নিয়ন্তা তাঁকে হতে হবে। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত গ্রামের লোকের না আছে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধীয় জ্ঞান, না আছে উন্নত সাংস্কৃতিক মান। তারা পরিশ্রম করে প্রচুর কিন্তু অমিতব্যয়িতার জন্য কিছুই সঞ্চয় করতে পারে না। তাছাড়া অর্থনৈতিক জ্ঞানের অভাব হেতু তাদের এই শ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান তারা পায় না। তাই তাদের জীবনে প্রাণের উৎস গিয়েছে শুকিয়ে, ফুরিয়ে গিয়েছে আনন্দ। এই নিরুৎসাহময় পরিবেশ শিশুদের মনে এঁকে দেয় ব্যর্থতার ছাপ। কাজেই এমনি করে তিলে তিলে মনুষ্যত্বকে নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া চলবে না। বাঁচিয়ে তুলতে হবে দেশের প্রাণ-শক্তিকে। এ কাজের ভার নেবেন শিক্ষকেরা, যিনি হবেন গ্রাম্য সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে একমাত্র আদর্শবাদী কাজের লোক; সুতরাং তাঁকেই নিতে হবে গ্রাম-উন্নয়নের দায়িত্ব। গ্রামের জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা, উন্নত সাংস্কৃতিক মান, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে, গ্রামের জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করে, মৃতপ্রায় গ্রামগুলিকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। শিশুর মঙ্গলের জন্য, জাতির ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে এ কাজের ভার নিতে হবে।

॥ শিক্ষক ও বয়স্ক শিক্ষা ॥

পল্লী-সংস্কারের আলোচনা থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ কত বেশী। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা।

কিন্তু কোন দেশের নাগরিকদের সত্যিকার নাগরিক শিক্ষা না থাকলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা হয়ে পড়বে পঙ্গু। এই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ছাড়াও শুধু জীবনের তাগিদেই আজ বয়স্ক শিক্ষা হয়ে পড়েছে অত্যাবশ্যক।

আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষা নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে অপরিহার্য পন্থা, তা কেউ অস্বীকার করবেন না। তাই পাশ্চাত্ত্যের একজন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ বলেছেন যে, গণতন্ত্রকে জাগ্রত করে তুলতে হলে শিক্ষার গতি করতে হবে বিরামবিহীন—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—যাতে বিশিষ্ট একটি স্থান থাকবে বয়স্ক শিক্ষার। একথা পাশ্চাত্ত্য দেশ সম্বন্ধে যদি খাটে,—তা হলে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে একথা খাটবে আরও বেশী করে; কারণ আমাদের দেশের প্রায় শতকরা ৮৬ জন নিরক্ষর।

এ প্রসঙ্গে বয়স্ক শিক্ষার পরিচালনার ভার কে গ্রহণ করবে স্বতঃই এ প্রশ্ন উঠে। প্রগতিশীল দেশে দেখা গেছে যে, শ্রমিক ও চাষী-সঙ্ঘ বা তাদের শিক্ষাসংসদগুলো এর ভার গ্রহণ করে নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বার্থ অপ্রতিহত রেখেছেন, অপরের অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতার ধার তাঁরা ধারেন নি। আমাদের কিন্তু তা হওয়া সম্ভব নয়, আমাদের দেশে এ শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে হবে শিক্ষকদের।

বয়স্ক শিক্ষা প্রচলনের আগে নির্ধারণ করতে হবে কি পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এবং কি কি বিষয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। সেজন্য সুচিন্তিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয় নিয়ে প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষকদেরই মাথা ঘামাতে হবে, কারণ গ্রাম্য সমাজের তাঁরাই মুখপাত্র। দায়ে অদায়ে, সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণ পরামর্শ, উপদেশ নিতে আসে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে। গ্রামের শিক্ষককে তারা ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে—জ্ঞানী গুণী বলে মান্য করে—তাঁর উপদেশ পরামর্শ যুক্তি তর্ককে তারা বেদবাক্য বলে মানে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের প্রাণের পরিচয়

ঘটে। উৎসবে ব্যসনে, সুখে দুঃখে অশিক্ষিত প্রজা-প্রতিবাসিদের সঙ্গে শিক্ষকদের অনেক সময় অতিবাহিত করতে হয়। সুতরাং গুরুরূপে, বন্ধুরূপে, উপদেষ্টারূপে তাঁরাই বয়স্কদের সুশিক্ষা দিতে পারেন।

বিদ্যালয়ের বিচিত্র অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাত্রা, নৃত্য, গীত, কথকতা প্রভৃতির আয়োজন করে শিক্ষকরা ইচ্ছে করলেই, শিশুদের অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে টেনে এনে আলাপ আলোচনা আর কথকতার সূত্র ধরে বয়স্কদের শিক্ষা দিতে পারেন। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আলোচনা প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন—বুঝিয়ে দিতে পারেন অশিক্ষার কুফল কি, অন্ধ কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে কেমন করে তাদের বুদ্ধির ও মানবতার অপমৃত্যু ঘটছে। এমনি দেশের প্রচলিত খবরাখবরের মধ্য দিয়ে তাদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেন শিক্ষকেরা। যে রোগ নির্ণয় করতে পেরেছে, সেই কেবল রোগের প্রতিকার করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বয়স্ক শিক্ষার জন্য একটি সহজ সরল প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ যারা লিখতে পড়তে জানে না, তারা চোখে দেখে, কাণে শুনে সহজেই শিক্ষালাভ করতে পারে। এর জন্য চাই বড় বড় হরফে লেখা সচিত্র পোষ্টার এবং যাত্রা, গান প্রভৃতি উৎসবের প্রয়োজন। শিক্ষামূলক আলোকচিত্র প্রদর্শন, মেলা, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা—যাতে কাণে শুনে ও চোখে দেখে তারা কিছু শিখতে পারে; সম্ভব হলে গ্রামোফোন, রেডিও, বক্তৃতার সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। যাদের অক্ষর জ্ঞান হয়েছে তাদের নৈশ বিদ্যালয়ে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখানোর ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া ভ্রাম্যমান পাঠাগার থেকে পুস্তক লেনদেন করার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক পাড়ায় একটি করে বয়স্ক-আলোচনা-সমিতি বা ক্লাব-ঘর থাকা প্রয়োজন; তা ছাড়া খবর সংকলন করান, দেওয়াল পঞ্জী প্রস্তুত করান ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে বয়স্কদের অনেক কিছু শেখানো যেতে

পারে। বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ সুবিধা এই যে, বয়সের অভিজ্ঞতার দরুণ তাদের সকলের আছে গভীর দূরদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও যৌক্তিকতা।

এজন্য চাই সুশিক্ষিত উপযুক্ত শিক্ষক। কিন্তু বয়স্ক শিক্ষার পারদর্শী এমন দক্ষ শিক্ষকের একান্ত অভাব। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাপক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। অন্যান্য দেশে যেমন ব্যবস্থা আছে যে, উপাধি পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রত্যেক ছাত্রকে গ্রামাঞ্চলে কিছুদিনের জন্য বয়স্ক-শিক্ষার ভার নিতে হয়, নৈলে তাদের ডিগ্রী দেওয়া হয় না। এরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে—আপনা থেকেই বয়স্কশিক্ষা সম্প্রসারিত হবে।

এ কার্যে শিক্ষককে সাহায্য করবে দেশের স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা; উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা অথবা উৎসাহী শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের হাতেই তুলে দিতে হবে এই প্রচারের গুরুদায়িত্ব। এজন্য অবশ্য শিক্ষকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু আশঙ্কার কথা এই যে, আনাড়ীর হাতে পড়ে বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হতে পারে। সেজন্য একাধিক শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলা উচিত। সেখান থেকে হাজার হাজার শিক্ষক বিশেষ শিক্ষা লাভ করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান শুরু করবে। সুপরিকল্পিত কার্যসূচী অনুধাবন করে একাজে হাত দিলে বয়স্কশিক্ষা যে ফলবতী হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শেষ কথা এই যে, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞতার যুদ্ধ চিরদিনই থাকবে; কারণ জ্ঞান অজ্ঞতার সঙ্গে কখনও আপোষ মীমাংসা করে না, সুতরাং অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতেই হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব

কাঁচা মৃত্তিকার উপর মৃৎ-শিল্পী যেমন করে আপন পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তোলে, শিক্ষাও তেমনি করে শিশুমনে বিচিত্র রঙের আলিম্পন আঁকে। মৃত্তিকার উপাদান অনুসারেই মূর্তিকারকে যেমন কাজ বেছে নিতে হয়, শিক্ষাদান ব্যাপারে শিক্ষাকেও তেমনি জানতে হয় মনের চাহিদা। তা না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্য শিশু-শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে ভাল করে পরিচয় করতে হবে শিশুর মনের সঙ্গে। এখানেই শিক্ষার মনস্তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষকেরা শিশু-মনকে অনেক সময় যাচাই না করেই শিক্ষাদান-কার্যে ব্রতী হন ; ফলে, সাধু প্রচেষ্টাও এগুতে চায় না। এইজন্য একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন যে, শিক্ষার অসম্পূর্ণতার জন্য ছাত্ররা দায়ী নয়, সমস্যা হচ্ছে শিক্ষক-কে নিয়ে। অর্থাৎ নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে যে শিশু সচেতন নয়, তার ভবিষ্যৎ যখন অনেকখানি শিক্ষকের উপর নির্ভর করে, তখন নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষককে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, শিশু-শিক্ষার দরবারে সর্বোচ্চ আসন অধিকার করে আছে মনোবিজ্ঞান। সুতরাং শিক্ষাজগতে শিশু-মনের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে না পারলে শিক্ষার পথ যে সহজ সরল হবে না—শিক্ষাবিদ্‌রা আজ তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছেন।

এখন শিক্ষার সঙ্গে মনোবিদ্যার কি সম্পর্ক, তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে শিক্ষা বলতে কি বোঝায় ? সম্যক বিকাশ। কিসের বিকাশ ? দৈহিক ও মানসিক। অর্থাৎ শিক্ষার দৃষ্টি থাকবে সমগ্র মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্মেষের দিকে। তা না হলে শিক্ষা বলতে আমরা এই বুঝব যে, একটি মনুষ্যশিশুকে এমনভাবে সুশিক্ষিত করতে হবে যাতে তার আচার আচরণ শুধু

তার নিজের কাছে নয়, অপরের পক্ষেও ফলপ্রসূ হবে; উন্নতিকরণের এই সাধনাই তো শিক্ষা। এখানে দুটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়: (১) সন্তোষজনক ফললাভের অভিপ্রায়ে মনুষ্যচরিত্রের কয়েকটি আদিম প্রবৃত্তিকে (instincts) যথোপযুক্তভাবে চালনা করবার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক; (২) অনিষ্টজনক বা অনুযোজক প্রবৃত্তিগুলিকে পরিমার্জিত করে বা অন্যভাবে চালিত করে অথবা অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়ে অন্য পরিস্থিতির সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করতে হবে যাতে কম বা আদৌ ক্ষতি না হয়। পরন্তু ক্ষয়-ক্ষতির পরিবর্তে সমস্ত প্রচেষ্টাই মঙ্গলময় হয়ে উঠে। এই প্রসঙ্গে মিঃ জ্যাকসের উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, শিক্ষা বলতে একটি মাত্র রাস্তা বোঝায় না, কারণ প্রত্যেককেই নিজের গমনপথ করে নিতে হবে। যেহেতু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বুদ্ধির উন্মেষ ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, সেইহেতুই শিক্ষিতের জীবনযাত্রাপথ বলতে এমন একটি সোজা রাস্তা বোঝায় না, যার কোন বাঁক নেই। এবং যাত্রীকেও এইসব বাধা-বিঘ্ন নিজ চেষ্টায় অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে উপনীত হতে হবে।

এবার শিক্ষামূলক মনোবিদ্যা (Educational Psychology)র সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যাক। গ্রীক psyche শব্দ থেকে psychology শব্দের উৎপত্তি। psyche অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব যে শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত তাকে আত্মদর্শন বা মনোবিজ্ঞান বলা চলে। প্রাচীনগণের ধারণা ছিল যে, আত্মাই জীবের সারবস্তু। যদিও আত্মা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তথাপি আত্মাই জীবনের মৌলিক অবলম্বন। কিন্তু অধুনাতন মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা আত্মা ও মনের স্থলে Behaviourism-কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ, মনুষ্য আচরণের মধ্যেই কর্মবহুল জীবনের প্রতিভাস প্রতিফলিত হয়।

এখন মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার কি সম্পর্ক তা আলোচনা করে দেখা যাক। মনোবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সত্যিকার শিক্ষা অসম্ভব। যে শিক্ষার সঙ্গে প্রাণের যোগ নেই, সেই অন্তঃসারশূন্য শিক্ষার গুরুভারে প্রতিভার শ্বাসরোধ

ঘটে। কাজেই শিশু-শিক্ষাকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে শিশুর আচার-আচরণ, ভাবাবেগ, আগ্রহ-কৌতূহল—এক কথায়, শিশুর মনস্তত্ত্ব—জানতে হবে। শিশুর দৃষ্টিভঙ্গিতে অবাধ আনন্দের ছুটির রাজ্য সৃষ্টি করতে হবে—যেখানে শিশুর বিচিত্র খেয়াল বাঁধনহারা বৈচিত্র্যের মধ্যে মুক্তি পাবে, খেলার মধ্যে, কাজের মধ্যে শিশু নিজেকে আবিষ্কার করে প্রতিষ্ঠিত করবে নিজের জগতে। সেই বাঞ্ছিত শিশু-জগৎ সৃষ্টি করতে হলে শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে কাজে অগ্রসর হতে হবে। বিচক্ষণ চিকিৎসক যেমন রোগ নির্ণয় করে ঠিক ঔষধের ব্যবস্থা করে, প্রত্যেক শিক্ষককেও তেমনি শিশুর মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী তার মানসিক ক্ষুধার চাহিদা মেটাতে হবে। শিক্ষার এই জটিল সমস্যা সমাধানের কলকাঠি আছে মনোবিজ্ঞানের হাতে। তা ছাড়া মনোবিজ্ঞান শুধু শিশু-চরিত্র সংশোধনের উপায় বাতলে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, কিসে শিশুর মঙ্গল হবে বা কোন্ পথ শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর হবে না, তারও নির্দেশ দেয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনেকাংশে নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানের উপর। সুতরাং শিক্ষার সংস্কার করতে হলে চাই সেই মনোবিজ্ঞানের অমোঘ অস্ত্র।

শিক্ষাদান ব্যাপারে মনোবিজ্ঞান কতখানি সাহায্য করে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বহুলাংশে মনোবিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত করছে শিক্ষা-প্রণালীকে। শিক্ষা-ব্যবস্থা একটানা প্রবাহের মত যুগ থেকে যুগান্তরে লোকালয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে সভ্যতার জলধারা আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজস্র ফসল। এতে সমাজ সমৃদ্ধ হচ্ছে, উন্নতি লাভ করছে মানবগোষ্ঠী।

মনোবিদ্যা (Educational Psychology) যদিও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে না, তথাপি ঐ লক্ষ্য আয়াসলভ্য কিনা তা বলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যখন একজন শিক্ষক কোন শিশুর একটি আদিম প্রবৃত্তি উৎপাটন করতে চান, তখন মনোবিদ্যা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ সাধ্যায়ত্ত

নয় ; বরং এ আদিম স্বভাবটিকে অন্যভাবে চালাতে পারলে সুফল আশা করতে পারেন। মনোবিদ্যার সাহায্যে শিক্ষক মহাশয় নিজের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটা আনুমানিক ধারণা করতে পারেন, ছাত্রের সংশোধনের জন্য আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় এবং এরূপ আচরণের মনোগত অভিপ্রায়টিও উপযুক্তভাবে পরিবর্তিত হয়েছে কিনা তাও বোঝা যায়। সর্বোপরি প্রমাণসাপেক্ষ তথ্যাবলীর সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় বলে কোন্ পথে অগ্রসর হলে অকৃতকার্য হবার সম্ভাবনা কম হবে তা সহজেই ধরতে পারা যায়। অতএব যদিও মনোবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে কোন মূল বা দার্শনিক নীতি প্রচার করে না, তথাপি শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনের যথেষ্ট মালমশলা সরবরাহ করে। সুতরাং দেখা যায় যে, শিক্ষা-বিষয়ক মনোবিদ্যা, আচরণ সম্বন্ধীয় মতবাদ ও তথ্যাবলীকে যথেষ্ট কাজে লাগায়।

স্যর জন অ্যাডাম্স্-এর মতে শিক্ষার উপায় দুটি : (১) শিশুর উপর শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করা, (২) লব্ধ জ্ঞানটিকে বিভিন্ন উপায়ে কাজে লাগানো। মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে ছাড়া এ দুটির একটিকেও কাজে লাগানো সম্ভবপর নয়। মনোবিদ্যার সাহায্যে শিক্ষক নিজেকে ও শিশুকে বুঝতে সক্ষম হন। শিশুর অন্তর্নিহিত গুণাবলী, শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুসুলভ সারল্যের পরিবর্তে জটিলতার উদ্ভব, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর চাপ এবং সর্বোপরি তার চারিত্রিক গঠন, এ সমস্তই মনোবিদ্যার সাহায্যে বুঝতে পারা যায়। এ ছাড়া, একের ব্যক্তিত্ব কি করে অপরের ব্যক্তিত্ব গঠন বা পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়, জনতার মধ্যে কি করে লোকে তার নিজস্ব সৎ বা অসৎ গুণাবলী সাময়িকভাবে ভুলে যায়, বিদ্যালয় কিভাবে ছাত্রের উন্নতির সহায়ক হয়—এগুলি জানতে হলে মনোবিজ্ঞান ছাড়া গত্যন্তর নেই। এগুলি ব্যতীত জ্ঞানলাভের প্রণালীগুলি কিভাবে প্রস্তুত হয়, নূতন নূতন জ্ঞান কি করে মানসপটে রেখাপাত করে, আমরা কিরূপে চিন্তা করি এবং কিভাবে বিচার করি, তা বুঝতে হলেও মনোবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ

করতে হয়। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষক হতে হলে মনোবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মনোবিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হয় পরীক্ষিত প্রমাণাবলীর উপর। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আগেকার দিনে অধিকাংশ সিদ্ধান্তই গঠিত হত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। চেতন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে সকল আচরণ সংঘটিত হয়, সেগুলিই সমস্ত নয়; কারণ অচেতন বা নির্জ্ঞান ও অবচেতন বা অন্তর্জ্ঞান অবস্থাতেও আমরা এমন অনেক কিছু কাজ করি, যা বুঝতে হলে কতকগুলি কাল্পনিক মতবাদের সাহায্য গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। স্বয়ংক্রিয়ভাবেও অনেক কাজ সাধিত হচ্ছে—এরা আমাদের ইচ্ছাশক্তির মুখাপেক্ষী নয়, সুতরাং অন্তর্দর্শনের সাহায্যে এদের বোঝা যায় না। তা বলে এদের বাদ দেওয়া চলে না, কারণ, মনোজগতে এদের প্রয়োজন অপরিহার্য।

শিক্ষাদান বিষয়ে মনোবিজ্ঞান কতখানি সাহায্য করতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পেষ্টালজি বলেছেন যে, মনই শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তিভূমি। সুতরাং সঠিক জ্ঞানসমৃদ্ধ মানসিক সক্রিয় কার্যপ্রণালীর উপরই গড়ে উঠবে শিক্ষানীতি। শিক্ষার গোড়া পত্তনই হবে মনের উপর। তাই তিনি বলেছেন যে, "the mind of the pupil is the primary concern of the educator, and that the art of education must be based on an accurate knowledge of mental processes." কাজেই প্রত্যেক শিক্ষাবিদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে শিশুমনকে ভাল করে জানা। রুশ্ কিন্তু আত্মবীক্ষণের কথা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শুধু শিশু-মনকে জানলে চলবে না। অভিভাবকদেরও মনের গঠন জানতে হবে—নইলে শিক্ষা-দান-ব্যাপারে একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা এই যে, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর নিত্য নূতন জ্ঞানের মন্দির গড়ে তুলতে হবে; সেই দেবালয় হবে নূতন-পুরাতনের ভাব-

বিনিময়ের মিলন-তীর্থ। এই যোগাযোগ ভিন্ন জ্ঞানের পরিণতি নেই। অর্থাৎ শিশু কি জ্ঞান লাভ করেছে না জানলে, কোন্ শিশুকে কি জ্ঞান পরিবেশন করা যুক্তিসঙ্গত হবে, তা বিবেচনা-সাপেক্ষ থেকে যাবে। তাই রশ্ বলেছেন যে, "The main principle which psychology lends to the theory of education, as its starting-point, is the need that all communication of new knowledge should be a development of previous knowledge." এইজন্য জন অ্যাডাম্‌স্ বলেছেন যে, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সমস্ত আসন জুড়ে আছে—সেখানে আছে শুধু জানা এবং জানানো।

আচরণবাদীরা কিন্তু মানুষের বহিরাচরণের উপরই অধিক জোর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, Psychology of behaviour, then, is of great importance to the educator. ছাত্রদের কার্যকলাপের মধ্যেই শিশু-মনের পরিচয় মেলে, খেলা-পাগল যে চাপল্য কলভাষে মুখর হয়ে ওঠে—সেখানেই শিশুমনের স্বরূপ প্রকটিত হয়; সেই স্বরূপকে আবিষ্কার করতে না পারলে ছাত্রের তথা জাতির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়।

অনেকে বলেন যে, শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কোন স্থান নেই। কারণ, নীতি বা ঔচিত্য সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান কোনদিন মাথা ঘামায় না। কি হওয়া উচিত তা' দর্শনের বিষয়বস্তু। কাজেই, শিক্ষানীতির সংস্কার করতে পারে দর্শন, মনোবিজ্ঞান নয়। শিক্ষার আদর্শ কি হবে তার নির্দেশ দর্শনে আছে; কি ঘটছে, সে কথা মনোবিজ্ঞান জানে, কিন্তু কি হওয়া উচিত মনোবিজ্ঞানে তার কোন স্থান নেই।

উপসংহারে এই কথাই বলা চলে যে, শিক্ষা-গবেষণা-ব্যাপারে মনোবিজ্ঞান প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। মনোবিজ্ঞান-সম্মত উপায় ছাড়া প্রকৃত বা স্বাভাবিক শিক্ষার প্রচার অসম্ভব। তা ছাড়া পাঠ্য-বিষয় ও পাঠ্যক্রম রচনা ব্যাপারেও মনোবিজ্ঞানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মনোবিজ্ঞান ছাড়া শিক্ষক জানতে পারেন না যে, তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য ফলবতী হয়েছে কি

না। শিশু-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-সুখের মধ্যে শিক্ষক নিত্য যে মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভ করেন, শিক্ষা-জগতে তা হবে পাথেয়। এই কারণে শিক্ষককে আমরা এক অর্থে মনস্তত্ত্ববিদ্ বলতে পারি। শেষ কথা, মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর শিক্ষা-প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে দেশের ও দশের আশু উন্নতির কোন আশা নেই।

শিক্ষক ও মনস্তাত্ত্বিকের চোখে শিশু

বিংশ শতাব্দী, শিশু শতাব্দী। শিক্ষাক্ষেত্রে আজ শিশুর স্থান সর্বাগ্রে। পূর্বে কিন্তু শিক্ষকই ছিলেন মুখ্য, বিষয়বস্তু ছিল গৌণ, আর ছাত্ররা ছিল একেবারে নগণ্য। তাই সে যুগের শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা ছিল : Teacher teaches Latin to John, অর্থাৎ শিক্ষক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েই শিক্ষা দেবেন, শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করতে সমর্থ কিনা, তা জানার প্রয়োজন নেই। কোন রকমে জ্ঞান পরিবেশন করেই শিক্ষকদের দায়িত্ব শেষ। কারণ, প্রাচীনেরা মনে করতেন যে, শিশুরা শিক্ষা গ্রহণের আধার মাত্র। কাজেই সেই পাত্রে কৌশলে জ্ঞান উজাড় করে দিলেই হলো, শিশুর মনকে যাচাই করার কোন প্রয়োজন নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় স্বেচ্ছাচারিতা আর কি হতে পারে ? যার জন্য শিক্ষা, তাকে এড়িয়ে যাওয়া মানেই শিক্ষাকে অবহেলা করা। কারণ, মনকে বাদ দিয়ে যেমন মননশীলতার স্থান নেই, শিশুকে বাদ দিয়ে শিক্ষাও তেমনি অসম্ভব। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে আজ এ সত্য ধরা পড়েছে ; শিক্ষাবিদ্রা আজ তাই জোর গলায় প্রচার করেছেন : "John is taught Latin by teacher" অর্থাৎ আজ শিক্ষা-পদ্ধতির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। যাঁরা ছিলেন শিশু-শিক্ষার সর্বময় কর্তা, আজ তাঁরা হয়েছেন পথ-নির্দেশক মাত্র। জ্ঞানের রাজদরবারে মর্যাদার সিংহাসনে বসেছে শিশুরা, দেউড়িতে আছে বিষয়বস্তু, আর শিক্ষক হয়েছেন

বাণীর দৌবারিক। অধ্যাপনার রঙ্গমঞ্চে শিশুরা এসেছে পুরোভাগে, শিক্ষক আছেন নেপথ্যে।

ফলে শিক্ষক ও মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে শিশুরা আর অবজ্ঞার পাত্র নয়, তারাই সর্বেসর্বা। তাই শিশুদের নিয়ে শুরু হয়েছে কত পর্যবেক্ষণ আর গবেষণা। সেই শিশুদের কথা নিয়েই প্রথম আলোচনা আরম্ভ করা যাক। শিশুরাই শুধু অধ্যাপনার জীবন্ত উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার ফলশ্রুতিই শিশুর জীবনাদর্শ। শিশুর চিন্তাধারা, জ্ঞান ও চরিত্র, অর্থাৎ শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্যই বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের প্রয়োজন এবং শিশুর অনুধাবনের শক্তি ও জ্ঞানার্জনের ক্ষমতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির সাফল্য অথবা ব্যর্থতা।

কাজেই একথা স্বীকার্য যে, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পুঁথিগত যত জ্ঞানই থাক না কেন, তা দিয়ে শ্রেণী কক্ষের অধ্যাপনার কাজ যে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হবে, তা নয়। কারণ, জগতে এমন কোন তত্ত্বজ্ঞান নেই, যা ব্যবহারিক জীবনের প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের স্থান অধিকার করতে পারে। সহজ জ্ঞান ও দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় যে শিশু-মনের পরিচয় আমরা লাভ করি, সেই দিব্য দৃষ্টি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে শিশুর মনোরাজ্যে—যেখানে হাসি-কান্না আর ঘৃণা-ভালবাসা অংগাংগীভূত হয়ে আছে। এইজন্যে দূরদর্শী শিক্ষক তাঁর ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার কল্যাণে শিশুর জীবন-দর্শনের যে ভাষ্য রচনা করতে পারেন এবং শিশুর নিত্যনৈমিত্তিক আচরণ থেকে তাঁরা শিশুর ধ্যান ধারণা, অনুভূতি ও কার্যকলাপের বিষয়ে যে অনুমান খাড়া করতে পারেন, মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের তা সংগ্রহ করতে কিন্তু অনেক সময় লাগে।

এখন আলোচনা করা যাক কেমন করে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের কাজে লাগে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা সামগ্রিক দৃষ্টিতে শিশুর সম্যক্ উন্মেষের কথাই চিন্তা করেন; তাঁরা কিন্তু শ্রেণী-কক্ষ, বিদ্যালয় কিংবা নাগরিক আবেষ্টনীর মধ্যে শিশুকে সীমাবদ্ধ করে দেখতে চান না। শিশুরা এক অখণ্ড, অকৃত্রিম, বিচিত্র

সম্ভাবনার বিগ্রহরূপে তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়। ফলে, তাঁদের চুলচেরা বিচারে শিশুর কোন আচরণই বাদ পড়ে না। তাঁরা লক্ষ্য করেন, কেমন করে কি কি উপায়ে শিশু শিক্ষা লাভ করে, কেমন করে কি কি খেলা তারা করে, বিভিন্ন বয়সে কি অনুপাতে তার মানসিক ক্রমবিকাশ ঘটে; অথবা তার ভাবাবেগ ও চিন্তাধারা কেমন করে রূপায়িত হয়ে উঠে—প্রতিটি মুহূর্তের শিক্ষা-দীক্ষায়। এই উদার দৃষ্টিকোণ থেকে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা শিশুকে বিচার করেন বলে তাঁরা শিশুর জীবন-বিকাশের গভীর ও নিগূঢ় রহস্যের কথা জানতে পারেন; কিন্তু নির্দিষ্ট পরিবেশের নিত্য পরিচিত কোন এক শ্রেণী-কক্ষের দেওয়ালে শিক্ষকের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে যায়। তাই শিশুর বিশ্বরূপদর্শন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু পরিচয়ের পরিধি সংকীর্ণ বলে শ্রেণী-কক্ষে ছাত্র শিক্ষকের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। অপর পক্ষে, মসস্তত্ত্ববিদ্‌রা অবসর সময়ে শিশুর বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু শিক্ষকদের সেখানে নিত্য সমস্যা সমাধানের অপরিহার্য তাগিদ নেই। তা ছাড়া, প্রতিদিনের প্রতিটি কাজের আদানপ্রদানের মধ্যে শিক্ষকরা শিশু পর্যবেক্ষণ ও তার বিভিন্ন আচরণের তুলনা করার সুযোগ পান। ঘরে-বাইরে যেখানে যখন খুশী শিশুর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে শিক্ষকরা জানতে পারেন শিশুকে। ফলে বিভিন্ন বয়সের শিশু বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে কিরূপ আচরণ করে, তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার যে অজস্র সুযোগ পান শিক্ষকরা, একজন সামান্য দর্শকের চোখে তা কিছুতেই ধরা পড়ে না।

অন্যদিকে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বিভিন্ন বয়সের শিশুর সার্বজনীন কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিলেও, পর্যবেক্ষণের সময় তাঁরা নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি শিশুকে পৃথক করে পরীক্ষা করতে পারেন; কিন্তু এত স্বচ্ছন্দে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে শিক্ষকরা সব সময় শিশুকে দেখতে পারেন না। এমন করে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে শ্রেণীর যুক্ত দায়িত্বকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শিক্ষক কোন দিন কোন বিশেষ ছাত্রকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন না, শ্রেণীগত কল্যাণের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। এই

অসুবিধা কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদদের নেই ; কাজেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মনস্তত্ত্ববিদরা কোন একটি শিশুকে বিশ্লেষণ করে পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করতে পারেন। এমন কি সুদক্ষ সহৃদয় শিক্ষক বহুদিনের মেলামেশার ফলেও যে শিশুকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি, তাকে নূতন করে আবিষ্কার করেছেন মনস্তত্ত্ববিদরা।

আবার এ-ও দেখা গেছে যে, নিখুঁত অধ্যাপনা সত্ত্বেও অনেক ছেলেই বই পড়ায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু কেন যে ছেলেরা এমন পিছিয়ে পড়ছে, সেদিকে কিন্তু শিক্ষকের খেয়াল থাকে না মোটে। তাঁরা ভাবেন, ছেলেগুলো একেবারে গাধা, কাজেই লেখাপড়ায় তাদের আশা কম,—এই মনে করে তাঁরা হাল ছেড়ে দেন। সেখানেই কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদদের গবেষণা শুরু হয়। তাঁরা ছেলেদের সেই পরান্মুখতার কারণ নির্ণয় করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি-গুলোকে শিশু-সংস্কারের কাজে লাগান। কাজেই শিক্ষকদের অনুসন্ধানের যেখানে শেষ, মনস্তাত্ত্বিকদের কাজ সেখানেই শুরু। এ রকম একটি দৃষ্টান্ত একবার আমার চোখে পড়ে। এমন একটি ১৬ বছরের মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, যে একটি পাঁচ বছরের ছেলের চেয়ে ভাল পড়তে পারতো না। এই সংগতি তার বিদ্যালয়ের অনেক কাজের অন্তরায় হয়েছে, বিশেষ করে তার ভাবপ্রবণতা বিকাশের ক্ষেত্রে। ফলে তার সর্বতোমুখী বিকাশের পথে এমন বাধা সৃষ্টি করেছে যে, তার জীবন ঘিরে জমে উঠেছে একটা অসন্তোষের হাহাকার। শেষ পর্যন্ত তার মানসিক পরীক্ষা নিতে হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, মেয়েটি বুদ্ধির বিচারে ঠিক কৌলীন্যের গোত্রে না উঠলেও, সে নিছক বোকা নয় ; তার এই ব্যর্থতার মূলে আছে সেই অতি শৈশবের বই না পড়তে পারার সলজ্জ প্রভাব। কিছু দিনের প্রচেষ্টায় দেখা গেল যে, মেয়েটি বেশ পড়তে শিখেছে ; হঠাৎ সে যেন এক লাফে একেবারে দশ বছরের স্তরে উঠে পড়েছে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যকলাপেও তার যথেষ্ট চারিত্রিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

সম্প্রতি মনস্তাত্ত্বিক technical জ্ঞানকে কাজে লাগানোর সুযোগ মেলে

এমন একটি ঘটনা ঘটে। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আমার কাছে একটি ছাত্রকে নিয়ে আসেন। ছেলেটি কোন কাজেই উৎসাহ পায় না, কোন কাজেই তার এতটুকু মনোযোগ নেই। ছেলেটির চোখে মুখে কী গভীর হতাশা! তাকে দেখে মনে হলো সে যেন জীবনযুদ্ধের পরাজিত সৈনিক। আমি তাকে একটা কাজের কথা বলতেই সে যেন শিউরে উঠলো। বল্লে: 'না, ও কাজ আমি কিছুতেই পারবো না।' বুঝলাম যে, 'পারবো না' কথাটাই ইদানীং তার বাতিকে পরিণত হয়েছে। এর পিছনে অবশ্য আছে তার আত্মনির্ভরতার একান্ত অভাব। সুতরাং শিক্ষকেরা কিছুতেই ঠিক করতে পারতেন না যে, সে নিরেট বোকা, না অলস প্রকৃতির। ফলে অন্যের সঙ্গে কেমন করে তাকে খাপ খাওয়ানো যায়, তাঁরা তা ভেবে পেতেন না। কিন্তু কিছুদিন একটু গভীর ভাবে তাকে পরীক্ষা করে টের পাওয়া গেল যে, বুদ্ধির পরিমাপে সে সাধারণ স্তরেই আছে। কাজেই বুঝা গেল যে, সাধারণ অনুপ্রেরণায় তার মনোনিবেশকে জাগ্রত করে তোলা কঠিন হবে না। কিছুটা বুদ্ধি থাকলেও, সে যে স্বভাবতঃই একটু অলস প্রকৃতির তা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু কিছু দিনের ব্যক্তিগত পাঠদান (individual teaching) ও কাজের মাধ্যমে উৎসাহিত করার ফলে ছেলেটি তার আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পেল। সেই আত্ম-বিশ্বাস ছেলেটির জীবনে যাদুমন্ত্রের কাজ করলো। অল্পদিনের মধ্যে লক্ষ্য করলাম যে, জ্ঞান লাভের যে আকাঙ্ক্ষা ছেলেটির মাঝে ঘুমিয়ে ছিল, সে পিপাসা দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ক্লাসের সতীর্থদের যোগ্যতার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলার আকাঙ্ক্ষাও জেগেছে তার। এই সব বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষককে মনস্তাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হতে-ই হবে।

এমনিতর ব্যক্তিগত গবেষণা আর পর্যবেক্ষণের ফলে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা শিক্ষকদের যে কার্যকরী পরিকল্পনা দেবেন, সেই শিক্ষা-প্রণালী হবে যেমন নিখুঁত, তেমনি ব্যাপক। আর সেই বৈজ্ঞানিক নির্দেশ ছাড়া শিক্ষকদের 'নান্য পন্থা'।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় শিশুর মন জানতে পারা যায় বটে, কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মত যাচাই করা যায় না। এই জন্যে মনস্তাত্ত্বিকদের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। কারণ, স্কুলের কোন বয়সের ছাত্রদের কাছে কতটুকু নৈপুণ্য আশা করা যায়, তা না জানলে শিক্ষকতার কাজে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সত্য বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, শিশু-মনের হদিস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিক্ষকেরই দৃষ্টিভংগী পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বিদ্যালয়ের আস্‌বাবের কথা উল্লেখ করা চলে। পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল যে, হাতলহীন বেঞ্চিগুলিই শিশুদের পক্ষে উপযোগী। এগুলিতে কিছুটা অর্থনৈতিক সমস্যা মিটলেও, ওগুলিতে আসলে কিন্তু শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির অন্তরায় ঘটত। তা ছাড়া ঐ বেঞ্চিগুলো সকলের দখলে ছিল বলে ওর প্রতি শিশুর মমত্ববোধ জাগতে পারত না; ফলে বেঞ্চিগুলি ভেঙে ফেলে ক্ষতি করবার প্রলোভন শিশুর পক্ষে জয় করা কঠিন হোত; কিন্তু একজন অথবা দুজনের উপযোগী বেঞ্চি যখন সে সমস্যা দূর করলো, শিক্ষকেরা তখন তার প্রয়োজনীয়তা কিছুটা উপলব্ধি করলেন। ফলে যখন থেকে শিশুর হেফাজতে বেঞ্চি ডেস্কগুলো এলো, তখন থেকে শিশুর জাগ্রত স্বাধিকার-বোধ শুধু অধিকারের আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলো না, তার সেই ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিগুলিও সংশোধিত হতে আরম্ভ করলো। ঠিক ঐ ধরণের আর একটা কারণে ছোট ছেলেমেয়েকে সূক্ষ্ম সূচিশিল্পের কাজ দিতে অনেকে মানা করেন। তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ এই যে, ওতে মেয়েদের চোখের, স্নায়ুতন্ত্রর, এমন কি মনোভাবেরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। এর প্রথম কারণ এই যে, শিশুর অপটু হাতে অশিক্ষিত চোখে কোন কিছুর স্থূল সৌন্দর্যটাই সহজে ধরা পড়ে; কিন্তু সূক্ষ্ম কারু কার্যের জন্য তাকে যে অতিরিক্ত মেহনত করতে হয়, সেটা তার পক্ষে ক্ষতিকর। তা ছাড়া তার ব্যবহারিক মূল্যও শিশুরা বোঝে না। হয় তো অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর দক্ষতা গুণে আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে শিশুদের দিয়ে ও কাজ করিয়ে নিতে

পারেন ; কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকরা সেখানে নজির দেখিয়ে বলবেন যে, ওটা ব্যতিক্রম মাত্র। তবে একথা ঠিক যে, ও ধরণের কঠোর অনুশীলন শিশুর দৈহিক সামর্থ্যের সঙ্গে খাপ খায় না। কাজেই তা বর্জনীয়।

অধুনাতন কালে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা আন্দোলন দেখা দিয়েছে। কি ভাবে নিম্নশ্রেণীতে শিশুদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, এ বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা কিছুটা আলোকসম্পাত করেছে। তা ছাড়া অভিজ্ঞতা থেকেও কিছুটা জানতে পারা গিয়েছে যে, কোন বিষয়ে হঠাৎ দক্ষতা লাভ করা শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, যে শিশু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, তার পক্ষে কোন বিষয়ে নিপুণতা লাভ করা কঠিন নয় কি? এইজন্য শিশুর আত্মপ্রকাশ কখনো তার ভাষা বা লেখায় নির্ভুল কিংবা নিখুঁত হোতেই পারে না। শিক্ষকদের পাঠ-প্রস্তুতি খুব উচ্চাঙ্গের হলেও শিশুর পক্ষে অতটা নৈপুণ্য লাভ করা কি সম্ভব? তবে পাঠদানের সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে নানা প্রসঙ্গে শিশুরা কথা বলার সুযোগ পায়। কারণ মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন যে, সংলাপ বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই শিশুর সত্যিকার শিক্ষা আরম্ভ হয়। হৈ-হল্লা, গল্প-গুজব-ই শিশুদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। তাই একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন যে, "The silent class room is the worst-possible training for written expression." অর্থাৎ নিস্তব্ধ শ্রেণী-কক্ষে শিশুদের রচনা লেখানোর অভ্যাস করানোর চেয়ে খারাপ শিক্ষা আর নেই। আমাদের দেশের শিক্ষকেরা এ কথা শুনলে কিন্তু শিউরে উঠবেন। কারণ ও-ধরণের শিক্ষা-প্রণালীতে আমরা অভ্যস্ত নই ; দ্বিতীয় কথা, ও-ধরণের আদর্শ পরিবেশ আমাদের বিদ্যালয়ে এখনো তৈরী হয়ে ওঠে নি। তবে এটুকু লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, যখন কোন বিষয়ে শিশুদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, অথবা নানা ভাবে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ মিলেছে, তখন কিন্তু ছেলেদের কাছ থেকে বেশ ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে দেখা গিয়েছে যে, শিশুদের মননশীলতা বেড়েছে যেমন, তেমনি নিখুঁত হয়ে উঠেছে তার যুক্তি-বিবেচনা। অনেক প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে ঐ মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে শিক্ষককে অনেক ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিকের মত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাই বলে সকলকেই যে মনস্তাত্ত্বিক হতে হবে এমন নয়, তবে শিক্ষকতার জন্য ও বিষয়ে অবশ্যই কিছুটা জ্ঞানার্জন করতে হবে, নইলে কিছুতেই অধ্যাপনার সমস্যা সমাধান হবে না। আর একটা কথা, যাঁরা ছেলেদের শিক্ষা দেন, যতদূর সম্ভব তাঁদের চোখ কাণ খুলে চলতে হবে, মনস্তাত্ত্বিকের দিব্য দৃষ্টি ভিন্ন শিক্ষার নূতন পথ সৃষ্টি হতে পারে না। এইজন্য শিক্ষকদের হতে হবে মোহমুক্ত, একান্ত নিরপেক্ষ। ফলে, শ্রেণী-কক্ষের গণ্ডীর বাইরে এসে তাঁরা যখন মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টি নিয়ে শিশুর দিকে ফিরে চাইবেন, তখন তাঁদের দৃষ্টি যাবে স্বচ্ছ হয়ে; তাঁরা কাজে নূতন উৎসাহ পাবেন এবং জ্ঞানের আলোকে সত্য পথের সন্ধান করে নেবেন।

শেখার মনস্তত্ত্ব এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তার প্রভাব

শৈশব শিশু-শিক্ষার উপযুক্ত সময়। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে শিশু যখন জগতের দিকে ফিরে চায়, তখন জগৎ-জীবন-রহস্য তার মনে অনন্ত কৌতূহল জাগায়। সে জগৎকে জানতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় সমস্ত কিছুকে। অনুভূতির মধ্যে দিয়েই শুরু হয় তার জানার পালা। অজস্র ভাবনা, অফুরন্ত কৌতূহল, নিত্য-নূতন কৌতুক শিশু-মনের জিজ্ঞাসাকে মুখর করে তোলে—এবং অলক্ষ্যে আরম্ভ হয় তার শিক্ষা। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি কেবল সজাগ হয়ে উঠে না, বস্তুজগৎ সম্বন্ধে তার একটা নিজস্ব ধারণা জন্মে। তাই এই বয়সে শিশুর জানার আগ্রহ, অনুকরণ স্পৃহা, স্মৃতি শক্তি, অধ্যবসায় এমন এক অদম্য উৎসাহ আর কৌতূহলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে, শৈশব থেকে কৈশোরের মধ্যে শিশু যে জ্ঞান আহরণ করে, পরিণত বয়সের আপ্রাণ চেষ্টায় তা সম্ভব নয়। কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অকারণ কৌতূহল যেমন কমতে থাকে, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মনের আগ্রহও

তেমনি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে : আর সে অফুরন্ত উত্তম থাকে না ; কাজেই মন আর বহিঃপ্রেরণায় তেমন করে সাড়া দেয় না। সেইজন্য শৈশবে শিশুর কৌতূহল বা ইচ্ছাকে অবদমন করতে নেই, যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তা না হলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হতে পারে ; কারণ :

The greatest amount of learning taking place during the period of unmaturity.

কাজেই শৈশবের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শিশু যাতে তার জীবনের সমস্ত সুযোগগুলোকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিলে, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন যে আপনা থেকেই গড়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভবিষ্যৎ জীবনের এই প্রস্তুতিকরণের অবাধ স্বাধীনতা, অফুরন্ত সুযোগ কেবল কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে মিলতে পারে, আর কোথায়ও তা সম্ভব নয়।

শিশুমন যখন থেকে বহিঃপ্রেরণায় সাড়া দেয়, তখন থেকেই আরম্ভ হয় তার শিক্ষা। তাই জীবনের জন্য শিক্ষা, শিক্ষার জন্য জীবন নয়। জীবনের প্রস্তুতি চলেছে নিরন্তর—কখনো তার প্রেরণা আসে বহির্জগৎ থেকে, আবার কখনো আসে ভিতর থেকে। এই যে বিচিত্র প্রেরণার সঙ্গে শিশুমনের বোঝাপড়া চলেছে, তা এতই অনন্ত এবং অফুরন্ত যে, তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলা অসম্ভব। এইজন্য নির্বাচনের বিশেষ প্রয়োজন ; কেমন করে তা সম্ভব ? কেন, মনের মাপকাঠিতে বাছাই হবে ভাল-মন্দ লাগার তারতম্য অনুসারে। সকল প্রেরণাই যে মনকে আলোড়িত, অনুপ্রাণিত করতে পারবে এমন নয় ; কারণ বহিঃপ্রেরণালব্ধ অনুভূতি মাত্রই প্রীতিকর বা আনন্দদায়ক হতে পারে না ; তা ছাড়া এই প্রীতি এবং অপ্রীতিকরের প্রশ্নটাও অনেকাংশে নির্ভর করে মানসিক অবস্থার উপর। সুতরাং এই যে বহির্জগৎ আর অন্তর্জগতের মধ্যে প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান চলছে, তাকে গ্রহণ এবং বর্জন যা কিছু করছে মন। কাজেই এই গ্রহণ এবং বর্জন যদি শিক্ষার মূলনীতি হয়, তবে সে যে মনের অভিরুচির

রঙে রূপায়িত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন উঠে যে, শেখার পদ্ধতি বলতে তবে আমরা কি বুঝবো? বর্জন, না গ্রহণ? ও দুটোর কোনটাই নয়, সে হচ্ছে নির্বাচন—একেবারে ভিন্ন প্রক্রিয়া। তবে গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্য দিয়েই যে নির্বাচন সঠিকভাবে মনের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত হবে, তাকেই আমরা শিক্ষা বলবো। অবশ্য এই শেখার ব্যাপারটা অভ্যাসের দ্বারাই বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত হয়। তাই শেখার পদ্ধতি কি, তার উত্তরে একজন মনস্তাত্ত্বিক বলেছেন যে,—

"Learning is nothing but making the responses appropriate."

এখানেই বাছাই-এর কথা ওঠে, কারণ এই responseকে appropriate করতে হলে অনেক অবান্তর অপ্রীতিকর বিষয়কে বাদ দিয়ে, যা মনকে নাড়া দেয়, যা ভাল লাগে, যে প্রেরণায় প্রাণ সাড়া দেয়, তাকে বেছে নিতে হবে। অবশ্য আদিম সহজাত প্রবৃত্তিগুণেও মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা।

তবে শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে উদ্যম। প্রচেষ্টা ভিন্ন কিছুই শেখা যায় না। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা দেখি যে, কোন নূতন বিষয় আয়ত্ত করবার সময় আমরা ভেবে চিন্তে কোন নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করি না। বরং বার বার চেষ্টা করে একটা উপায় নিধারণ করবার প্রয়াস পাই। চলতি কথায় যাকে দেখে বা ঠেকে শেখা বলা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অনেকটা সেইরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এই যে পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার দ্বারা শেখা একে অনেকে নির্বাচন-নীতি বলেছেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে একে বলা উচিত বাছাই প্রথা। যতদূর সম্ভব ভুল বিষয়বস্তু বা পন্থা পরিহার করে নির্ভুল উপায়ে কিছু শেখার চেষ্টা করারই নাম শিক্ষানুশীলন।

এই প্রসঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক থর্নডাইকের নাম উল্লেখযোগ্য, ইতর প্রাণীদের নিয়ে গবেষণামূলক পরীক্ষা করে তিনি যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করে গিয়েছেন, তা শেখার পদ্ধতি (laws of learning) নামে অভিহিত। এখন সেগুলি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

পরিণাম পরিমিতিই হচ্ছে শেখার প্রথম নীতি। এই পদ্ধতির পরিমিতির প্রভাব কি, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে থর্নডাইক্ বলেছেন যে, কোন বহিঃপ্রেরণার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মন যেখানে সহজে সাড়া দেয়, সেখানেই বুঝতে হবে যে পরিণাম পরিমিতির (laws of effect) প্রভাব বিদ্যমান। যে কোন অবস্থায় প্রেরণার সঙ্গে যখন মন শুধু সাড়া দেয় না, মানসিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে একটা সন্তোষজনক সংযোগ স্থাপিত হয়, তখন সেই অনুভূতি আমাদের স্মৃতিপটে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যায়; সেখানে আপনা থেকেই এমন একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে যে তখন সেই ঘটনা-পরম্পরা আমাদের ভাল লাগে, অর্থাৎ তা আমাদের মনকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে। পক্ষান্তরে সম্পর্কটি যদি বিরক্তিকর বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে সে অনুভূতি আমাদের মনে কোনই রেখাপাত করে না। বরং মন স্বেচ্ছায় সেই অপ্রীতিকর অংশটুকু বর্জন করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, পূর্ব স্মৃতির তিক্ত বা মধুর অভিজ্ঞতার উপরই ভাল মন্দ লাগার তারতম্য নির্ভর করে। তবে নিয়মিত একটা কিছু করার ফলে যা অভ্যাসে পরিণত হয়, তাকে পরিহার করা কঠিন। প্রথম দিকে হয়তো বা প্রচেষ্টার ফলে আচরণের কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা যায়, তা বলে কিন্তু প্রত্যেক প্রবৃত্তিকেই বদলানো যায় না। যেমন স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ার কথাই ধরা যাক। শ্বাস বা পাক যন্ত্রাদির ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর মোটেই নির্ভর করে না; ও প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, তার উপর মানুষের কোন হাত নেই। হাঁচি, কাসি, হাইতোলা প্রভৃতি অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলোও বহুকষ্টে সংযত করতে হয়। এই সামান্য প্রক্রিয়াগুলোকে নিরুদ্ধ করতে না জানি কী সচেতন প্রচেষ্টাই করতে হয়। অবস্থাবিশেষে হাস্য-প্রবণতা দমন করাও যায়, আবার বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোযোগ দেওয়াও সম্ভব। এই তো গেল পরিণাম পরিমিতির কথা।

এখন পৌনঃপুনঃ বা ব্যবহারিক নীতির (law of frequence, use or

disuse) জগতে আসা যাক। প্রয়োজন-সর্বস্ব জৈবিক জীবনে অপ্রয়োজনের স্থান নেই; কারণ সেখানে আছে শুধু জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম, আর নৈমিত্তিক দাবীদাওয়া মেটানোর প্রচেষ্টা। তাই সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রয়োজনের তাগিদে যখন আমাদের আগ্রহ জাগ্রত হয়, তখন আমরা সে বিষয় সহজেই আয়ত্ত করতে পারি। এই যে প্রয়োজনের তাগিদে কিছু করা, যে কোন সুযোগকে জীবনের কাজে লাগানো,—এই প্রচেষ্টাকে থর্নডাইক বলেছেন ব্যবহারিক নীতি। এ পদ্ধতির মধ্যে অবশ্য দুটি প্রধান দিক আছে —তার একটি হচ্ছে ব্যবহার, অন্যটি হচ্ছে অব্যবহার। অভ্যাস, অনভ্যাসের দ্বারাই কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যবহারিক নীতি। তাই দেখা যায় যে, বহি-প্রের্রণার সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান থাকলেই অভ্যাসের দ্বারা যেমন একটা আচরণ বদ্ধমূল হয়ে উঠে, অনভ্যাসের দরুণ নিশ্চয় সে সম্পর্কের গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে সন্তোষজনক বা অপ্রীতিকর মনোভাবের কথা ভুললে চলবে না; কারণ নিত্য ব্যবহারের ফলে যে প্রচেষ্টা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ ভাল লাগার ফলে বহির্জগতের সংগে যেখানে মনের একটা নিবিড় আত্মিক যোগ ঘটেছে—সেখানেই আছে একই প্রক্রিয়ার বহুদিনের পুনরাবৃত্তি। এ ছাড়া আরো দুটি প্রক্রিয়া আছে, যা একান্ত অলক্ষ্যে আমাদের স্মরণের মণিকোঠায় প্রতিদিনের চিহ্ন রেখে যায়—তা হচ্ছে ঘটনার আতিশয্য (Intensity) আর নূতনত্ব (Recency)। অর্থাৎ ঘটনার প্রভাব মনে যতই রেখাপাত করে, ততই ঘটনাপ্রবাহের স্মৃতি আমাদের স্মরণের সিংহাসন দখল করে বসে; আর এই প্রক্রিয়া যতই ঘন ঘন চলতে থাকে—বিস্মরণের যবনিকা যেমন দূরে সরে যায়—ততই স্মৃতির শাখায় স্মরণের ফুল ফুটে ওঠে।

কার্যতৎপর নীতিই (law of readiness) হচ্ছে শেখার তৃতীয় স্তর। কার্য-কারণ ভিন্ন কোন কিছুই সম্ভবপর নয়; তবে কাজ করবার যে কোন অভি-প্রায়ের মধ্যেই একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকা প্রয়োজন, নইলে প্রচেষ্টা অসমাপ্ত থেকে যাবার আশঙ্কা আছে। কাজেই প্রস্তুতির গোড়াপত্তন ভাল না হলে কাজ

যে ফলপ্রসূ হবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইজন্য অনেকে এই নীতিকে বলেছেন 'প্রস্তুতি' অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয়। কার্যতৎপর-নীতির মূল কথা এই যে, কাজের সঙ্গে যেখানে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, সেখানেই শিক্ষার আগ্রহ বেড়ে যায়। এখানে অবশ্য আবার সেই ভাল-মন্দ লাগার প্রশ্নও আছে। কাজেই এক কথায় প্রস্তুতি বলতে আমরা বুঝি যে, when any conduction unit is in readiness to conduct, for it to do so is satisfying when a conduction unit is not in readiness for it to conduct is annoying.

অর্থাৎ যে চলমান কর্মপ্রবাহে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে উঠে, তাকে আমরা তৃপ্তিকর সুখানুভূতি বলতে পারি, কিন্তু তার উল্টো প্রক্রিয়াকে অপ্রীতিকর উপলব্ধি বলা চলে। সেই কারণে যখন কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়, তখন সেই কাজ সমাধা করতে পারলেই মন তৃপ্তির আনন্দে ভরে উঠে, অন্যথায় সে কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। এই তিনটি প্রধান নীতির সঙ্গে থর্নডাইক যথাক্রমে আরো পাঁচটি শিক্ষার তথ্য জুড়ে দিয়েছেন, যথা—গুণিতক অনুভূতি (multiple response to the same external situation) অর্থাৎ একই বহিঃপ্রেরণার সঙ্গে মন যেখানে একাধিকবার সাড়া দেয়, যেখানে প্রীতির সম্পর্কের অবাধ লেনদেন চলে—তাকেই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি বা গুণিতক বলে। যেমন শয়নকক্ষে এসেই নববিবাহিতা মেয়েদের যেই প্রবাসী স্বামীর কথা মনে পড়ে যায়, অমনি তারা স্বামীর আলোকচিত্র বার করে তন্ময় হয়ে দেখতে আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে এই আচরণ তাদের নৈমিত্তিক অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রবণতা (Attitude set or disposition)। কোন বিষয়ের প্রতি গভীর আসক্তি থাকলে, সে বিষয় আয়ত্ত করতে বিশেষ সময় লাগে না, বরং দিনদিন তার প্রতি অনুরাগ বেড়ে যায়। যেমন, ধরা যাক, ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, শিল্প এবং সঙ্গীত-প্রীতি—এ অভ্যাসগুলি এমন

করে মানুষকে পেয়ে বসে যে, সাধনা-নিরত যোগীর মতই এই প্রবণতায় মানুষ অনেক সময় পার্থিব জগতের কথা ভুলে যায়। ফলে, এমন একাগ্রচিত্তে সে তার সাধনায় মশ্‌গুল হয়ে যায় যে, সে-সাধনায় তার সিদ্ধি যে অবশ্যম্ভাবী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জন্মগত স্বাভাবিক প্রবণতাগুণেও অনেক কিছু শিখতে পারা যায়।

তৃতীয়তঃ হচ্ছে আংশিক প্রক্রিয়া (partial activity)। অর্থাৎ যে বহি-প্রের্রণা আমাদের অনুভূতিতে গানের রেশের মত একটা মধুর স্মৃতির ইঙ্গিত রেখে যায়, আর সেই অর্ধ-চেতনাকে আমাদের সজ্ঞান-মনে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি, ফলে আমাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়ে উঠে; এবং আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। শিক্ষার এই পরোক্ষ নীতিকেই আংশিক প্রক্রিয়া বলে।

চতুর্থতঃ হচ্ছে সাদৃশ্যীকরণ (law of assimilation or analogy)। যে কোন জানা শিল্প বা কৌশলের অনুরূপ অন্য কোন বিষয় আয়ত্ত করতে বেশী সময় লাগে না। কার্যবিধির মধ্যে যেখানে সাদৃশ্য বিদ্যমান, অথবা একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের যদি খুব মিল থাকে, তবে একটির বিষয় ওয়াকিবহাল হতে পারলে, সহজেই অন্যটির বিষয় জানা যায়। যেমন গান-বাজনার কথাই ধরা যাক। সঙ্গীতের তাল-লয়-মান সম্বন্ধে যাব নির্ভুল ধারণা জন্মেছে, চেষ্টা করলে সে সহজেই সঙ্গৎ বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে। এই যে শিক্ষার বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে একটা পারম্পরিক যোগাযোগ রয়েছে—একেই সাদৃশ্যীকরণ বলে।

পঞ্চমতঃ হচ্ছে পরিবেশ বদল (law of shifting association) অর্থাৎ বৈচিত্র্যের আনন্দের মধ্য দিয়ে অনেক সময় আমরা অনেক নূতন বিষয় শিক্ষালাভ করতে পারি। দিনের পর দিন একই বিষয় পড়তে পড়তে যখন অবসাদ আসে, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির মধ্যে প্রাণ যখন হাঁপিয়ে উঠে, তখন নূতন বিষয়ের অবতারণার দ্বারা নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে শেখার ঝিমিয়ে আসা আগ্রহকে যে পুনর্জীবিত করা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ

নেই। এইজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌রা দেশভ্রমণকে শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করেন। দেশ-দেশান্তরের বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে শিশু যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তার যে বাস্তব জ্ঞান জন্মে,—বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পুস্তকপাঠের সেই গতানুগতিক উপায়ে তা লাভ করা অসম্ভব। এই যে দৃশ্যান্তরের সঙ্গে শিশুর জানার পরিধি পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়, একেই পরিবেশ বদল বলে।

শিক্ষার মনস্তত্ত্বের পরই শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতিকরণের কথা এসে পড়ে। কি করে শিখতে পারি বা শেখার পদ্ধতি কি, তা জানার পরেই শিক্ষণ-ক্ষমতার কথা উঠে। অর্থাৎ কত বেশী এবং কতদূর পর্যন্ত শিখতে পারা যায়? যদি সকলকেই সমান সুযোগ দেওয়া হয়, তা হলে শিক্ষার মান কি সর্বত্রই একই হবে? অথবা অবস্থাভেদে বিভিন্ন হবে? অভ্যাসকালীন শিক্ষার হার কি একই রূপ থাকে? না, কখনো কম, কখনো বা বেশী হয়? জ্ঞান ও কৌশল কি একই ভাবে আয়ত্ত হয়?

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ও বিষয়ে বাঁধা-ধরা কোন নিয়ম নাই। এক ঘণ্টায় যতটা শিখতে পারা যায়, দশ ঘণ্টায় যে তার দশগুণ শিখতে পারা যাবে এমন নয়। শেখার আগ্রহ, মনোযোগ, অনুকূল পরিবেশ, শেখাবার ধারা, পুঁথি-সঞ্চিত-জ্ঞান, বয়স, শারীরিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতিকরণের তারতম্য ঘটে। বংশগত ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানার্জন ক্ষমতাকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে; অর্থাৎ শেখার হার অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তি-সামর্থ্যের তারতম্যের উপর। তা ছাড়া সমান তালে একইভাবে সমস্ত কিছু শেখা যায় না। অর্থাৎ এক ঘণ্টায় যা শেখা যায়, দশ ঘণ্টায় তার দশগুণ শেখা যাবে, তা কিন্তু সম্ভব নয়! নূতন বিষয় শেখা অপেক্ষা পুরাতন বিষয় আবার ঝালিয়ে নেওয়া অধিকতর সহজ। কোন জিনিষ গোড়ার দিকে যত তাড়াতাড়ি শেখা যায়, পরে কিন্তু অত তাড়াতাড়ি শেখা যায় না। প্রত্যেকেরই শিক্ষাজীবনে এমন এক সময় মাঝে মাঝে আসে, যখন কোন কিছুই শিখতে পারা যায় না; অথবা যা শেখা যায়, তা নিতান্তই

তুচ্ছ। এই যে মানসিক নিষ্ক্রিয়তা, একে প্লেটো বা চড়াই বলে। এই প্লেটো সম্বন্ধেও আবার দুটি মতবাদ আছে। কেউ বলেন যে, শিক্ষণীয় বিষয়টি ভাল করে শেখাবার জন্য চড়াই-এর প্রয়োজন। আবার অনেকে মনে করেন যে, শিখতে শিখতে যখন অবসাদ আসে, তখনই দেখা দেয়, মানসিক নিষ্ক্রিয়তা; কিন্তু আবার যখন বহিঃপ্রেরণায় আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত হয়, তখনই চড়াই অতিক্রম করা যায়। যতদূর মনে হয় যে, বিষয়টির প্রাথমিক ধারণাগুলি আয়ত্ত হলে যখন প্রথম জানার কৌতূহল প্রশমিত হয়, তখন কাজে অবসাদ আসে—এই উভয়বিধ কারণেই প্লেটোর আবির্ভাব হয়। যা হোক এটা ঠিক, যে কারণেই প্লেটোর আবির্ভাব ঘটুক না কেন, তা অতিক্রম করতে নূতন করে আগ্রহের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু কতটা শিখতে পারা যায়, তাও জানা দরকার। সংক্ষেপে বলা চলে যে, কতটা শিখতে পারা যায়, তার একটা দৈহিক ও তাত্ত্বিক সীমা আছে। তার অতিরিক্ত নূতন কিছু শেখা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ অভ্যাস যতই বেশী হোক না কেন, সমস্ত বিষয়েই পারদর্শিতা লাভ করা যাবে এমন নয়; তা ছাড়া আদর্শের কাছাকাছি যাওয়া যায় বটে, কিন্তু আদর্শকে ছুঁতে পারা যায় না। তৃতীয়তঃ কৌশল উঁচুদরের হবে, অনভ্যাস ঘটলে তা তত শীঘ্রই ভুলে যাবার সম্ভাবনা।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, কিরূপে অভ্যাস করতে হবে? অনেকক্ষণ ধরে কয়েক বার, না কিছুক্ষণের জন্য অনেক বার? পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, নবায়ত্ত কৌশলটি ভুলে যাবার আগেই পুনরভ্যাস করলে সুফল পাওয়া যায়। কোন কৌশল বা বিষয়কে শরগত করতে হলে মনোযোগ সহকারে বার বার অভ্যাস করতে হয়।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে কিভাবে শিখতে হবে? সমস্ত বিষয়টাই কি এক সঙ্গে, না একটু একটু করে ধীরে ধীরে? এক সঙ্গে অনেকগুলি শিশুকে অর্থবোধক কোন একটি কবিতা মুখস্থ করতে দিয়ে শিশুদের মনোযোগ আকৃষ্ট

হতে পারে। তবে দলগত ভাবে কিছু করা এটা বয়স্কদের কাছে অনেকটা সহজসাধ্য হলেও, শিশুদের ক্ষেত্রে সব সময় প্রযোজ্য নয়। তা ছাড়া মুখস্থ করার সময় বেশী দীর্ঘ হলে শিশুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে।

অপর পক্ষে অর্থহীন ছড়া কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে ধীরে ধীরে একটু একটু করে শেখাতে হয়। এই নীতি অবলম্বন করে দেখা গিয়েছে যে, মুখস্থ করানোর সময় বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। শেখার পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা যাঁদের আছে, তাঁরাই জানেন যে, শিশু-শিক্ষা ব্যাপারে এই পদ্ধতি বা তত্ত্ব কত ফলপ্রসূ। শিশুর আগ্রহ, অনুরাগ, মনোভাব, ভাবাবেগ এবং অভিরুচি অনুসারেই শিশুর উপযোগী শিক্ষা দিতে না পারলে, শিক্ষার প্রতি শিশুর এমন বিতৃষ্ণা আসতে পারে, যাতে কোন শিক্ষাই কার্যকরী না হতে পারে। কোন্ বয়সের ছেলে মেয়ে কতখানি এবং কি বিষয় শিখতে পারে তা শিক্ষকদের জানতে হবে ; এদিকে দৃষ্টি রেখে যে শিক্ষাই দেওয়া যাক না কেন, শিশুর পক্ষে তা গুরুপাক হবে না, বরং তা হবে একান্ত স্বাভাবিক। শৈশব থেকেই আরম্ভ হয় শিশুর শিক্ষা। চপলমতি শিশুদের মন কাদার মত কোমল, কাজেই তার উপর বহিপ্রেরণা যে স্থায়ী ছাপ রেখে যাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; কারণ, শিশু-বয়সই শিক্ষার বয়স। কাজেই এই বয়স থেকে শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে হবে এমন অনুরাগ, যার ফলে অন্তরের তাগিদে শিশু তার শিক্ষাকে জীবনের অভিন্ন অংশ বলে বুঝতে শিখবে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শময় পৃথিবী প্রতিনিয়ত শিশুর মনে যতই কৌতূহল ও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলছে, ততই বহিপ্রেরণার প্রতিক্রিয়ায় শিশু বেশী করে সাড়া দিতে শিখছে। শিশু কি ভালবাসে, কিসের প্রতি তার বিতৃষ্ণা—ব্যক্তিগতভাবে তা জানতে হবে, নইলে কোন শিক্ষা-পদ্ধতিতেই কোন ফল পাওয়া যাবে না।

প্রাথমিক শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাগুলি একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, উক্ত নীতিগুলি কতদূর প্রযোজ্য। শিক্ষা দেবার পূর্বেই দেখতে হবে যে, শিশু গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে কিনা। শিশু

যখন যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে, তার জানার ইচ্ছা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে, তখনই বুঝতে হবে শিশু শিক্ষালাভ করবার উপযুক্ত। সেই সময় শিশু যা শিখবে, তা তার মনে গভীর রেখাপাত করবে। এইজন্য চাই পরিবেশ সৃষ্টি, শিশুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সমস্ত কাজে শিশুকে প্রাধান্য দেওয়া—শিশুশিক্ষার কাজে নেমে এই সত্য আমরা বার বার উপলব্ধি করেছি। এইজন্য আমরা প্রথম প্রথম শিশুর চাহিদার অফুরন্ত রসদ যোগাবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। যা শিশু ভালবাসে, সে বিষয়ে তার আগ্রহকে সজাগ করে তুলবার চেষ্টা করেছি, ফলও পেয়েছি আশানুরূপ। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলে পড়িয়ে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করে দেখাবার চেষ্টা করবো যে, শিখবার পদ্ধতি তাদের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য হয়েছে।

প্রথমে হাতে-কলমে শিক্ষার কথা ধরা যাক। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে গিয়ে আমরা অনুভব করলাম যে, হাতে-কলমে কাজ করার আনন্দ শিশুকে এমন অনুপ্রাণিত করে যে, শিশুর জানার ইচ্ছা আপনা থেকেই যেন প্রবল হয়ে উঠে। শিশু যাতে বেশী আনন্দ পায়, সে তাই মন প্রাণ দিয়ে শিখতে, জানতে, অনুভব করতে চায়। এখানেই trial and error method আরম্ভ হয়। শিশু ঠেকে ও দেখে শেখে। প্রথম অবস্থায় যে-শিশুর ভালমন্দ সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, সে শিশু জ্ঞানার্জন করে স্পর্শানুভূতির উপর নির্ভর করে। যে ঘটনা তার কাছে অপ্রীতিকর বলে মনে হয়, সে তা ক্রমে ক্রমে বর্জন করতে শেখে। আবার অনেক সময় বার বার ভুল করতে করতে হঠাৎ যখন সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে সত্যি পথের সন্ধান সে পায়, তার তখন প্রাণে আনন্দ ভরে উঠে। এমনি একটি ঘটনা সেদিন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আমাদের পাঠশালার মুকুল কিছুতেই কাঁচি ধরে গরু ঘোড়ার ছবি (লিনোকাটের সাহায্যে এঁকে দেওয়া) কাগজ থেকে কাটতে পারত না। কাটতে গেলে হয়ত গরুটার গলা, না হয় হাতীটার শুঁড় কেটে ফেলত। যতদিন সে ভাল করে কাঁচি ধরতে

শেখেনি, ততদিন কিন্তু সে ছবি কাটায় আনন্দ পেতো না; তারপর সেদিন দেখলাম মুকুল গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাঁচি নিয়ে কি যেন কাটছে। কাছে যেতেই সে উৎসাহের সঙ্গে আমায় দেখালে যে, সে হাতীর ছবি কোন রকমে কেটেছে। দেখলাম তার চোখে মুখে কি আনন্দ দীপ্তি। সে আমাকে বল্লে: কাঁচি দিয়ে ছবি কাটতে ভারী মজা লাগে মাষ্টার মশাই; কাঁচিটা আমায় দেবেন, বাড়ি গিয়ে কাগজের অনেক হাতী কেটে আনবো।

বুঝলাম অনেকবার ভুলচুক করে কাঁচির ব্যবহার সে শিখেছে, তাই তার ও-কাজে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে। শিশুরা যে কত অনুকরণপ্রিয় এবং make belief খেলায় যে কত আনন্দ পায়, তা উপলব্ধি করেছি অনেকবার। এই ধরণের প্রীতিকর খেলাধূলায় শিশুদের সাড়া দিতে দেখেছি গভীরভাবে। যে পরিবেশের সঙ্গে সে পরিচিত, যে জীব জানোয়ার সে দেখেছে, তাদের অনুকরণ করে কিছু করতে বল্লেই ছেলেদের মধ্যে জাহির করার প্রতিযোগিতা নিজেদের লেগে যায়—কে কত ভাল করে তার অনুকরণ করতে পারে।

কোন কঠিন ব্যায়াম অভ্যাস করানোর পর অনেকদিন সে ব্যায়ামটি অভ্যাস না করিয়ে, পরে ক্লাস নিতে গিয়ে দেখছি যে, সে অঙ্গভঙ্গি শিশুরা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু হাঁসের মত বা ব্যাঙের মত চলার স্মৃতি তাদের মনে দাগ কেটে বসে গেছে। ছড়া মুখস্থ করানোর সময় দেখেছি যে, যেগুলি তাদের এক সপ্তাহ ধরে শেখান গেছে, সেগুলিই তারা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শিখেছে। কিন্তু যেগুলি কিছুদিন অন্তর শিখাবার চেষ্টা করেছি, সেগুলি আয়ত্ত করতে ছেলেদের অনেক বেশী সময় লেগেছে। শিক্ষার প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের কোন ধারণা শিশুদের মনে নেই, তবে কোনটি প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর তা ছেলেরা বেশ বুঝতে পারে। এই দিকে দৃষ্টি রেখে ছেলের উপযোগী কয়েকটি খেলা শিখিয়ে পূর্বের চেয়ে ভাল ফল পেয়েছি। সেদিন দৌড়ে গাছ ছুঁয়ে এসে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াতে বলতেই দেখলাম 'বেলা' বলে একটি মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে; অন্যেরা তখন দৌড় দিয়েছে।

কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, আগের দিন দৌড়াতে গিয়ে সে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে, তাই ওর এ-খেলার প্রতি ভয় জন্মে গেছে। তাই সে এ-খেলা শিখতে নারাজ।

দীর্ঘ কবিতা একসঙ্গে শিশুরা যে মুখস্থ করতে পারে না তা পরীক্ষা করে দেখেছি। অর্থহীন দীর্ঘ কবিতা একটু একটু করে অনেকদিন ধরে শিক্ষা দিলে শিশুরা শিখতে পারে। এক্ষেত্রে ড্রিলিংএর বিশেষভাবে প্রয়োজন।

সময়ের ব্যবধানে শিশুরা অনেক কিছুই ভুলে যায়। ছুটির পর এসে এ সত্য আমরা ভালভাবে উপলব্ধি করেছি। ছুটির আগে প্রাণপাত পরিশ্রম করে যা তাদের শিখিয়েছিলাম, যেমন সংখ্যা গণনা করা, তিনের ঘরের খানিকটা নামতা, বৃষ্টিপড়ার গান প্রভৃতি। এসে দেখি ছেলেদের অনেকের মন থেকেই তার অনেক কিছুই বিশেষ করে সংখ্যার ধারণা মুছে গিয়েছে এবং অল্পবিস্তর অনেক কিছু সুঅভ্যাসই তারা ভুলে গিয়েছে। যদিও কিছুদিন পূর্বে অনেক অনুশীলন করেই সেগুলি তারা শিখেছিল। এর কারণ এই যে, সময়ের ব্যবধানে শিশুর স্মৃতি থেকে অনেক দাগই মুছে যায়। এইজন্য ক্ষেত্র বিশেষে ঘন ঘন অনুশীলন বা অভ্যাসের দ্বারা শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

উপসংহারে এই কথাই বলা চলে যে, শিশুকালই শিক্ষার উপযুক্ত সময়। সুতরাং শিশু-জীবনের চাহিদা এবং অনুরাগের দিকে দৃষ্টি রেখে শিশু-বিদ্যালয়ে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে, যাতে শিশুর শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ সম্যকরূপে জাগ্রত হয়। শিশুর মন তৈরী না হলে, শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে অরণ্যে রোদনই হবে।

খেলার মনস্তত্ত্ব

যেখানে জীবন আছে, সেখানে আছে খেলার প্রেরণা। প্রাচীনত্বের দিক থেকে খেলাধূলা জীব-জগতের সমসাময়িক। জীবনের প্রথম সূত্রপাত থেকে

শুরু হয়েছে খেলাধূলার মহড়া। প্রকাশভঙ্গি তখন অবশ্য ছিল আদিম ও অকৃত্রিম—যেখানে আদি মানুষের রুদ্ধ প্রাণের আবেগ মূর্ত হয়ে উঠেছিল লীলায়িত ছন্দে। খেলা শুধু মনুষ্য-জীবন-কেন্দ্রিক নয়, জীবজগতের মধ্যেও খেলার রেওয়াজ দেখা যায়। এইজন্য ক্রীড়ামোদীরা বলেন যে, 'প্রাণধর্মই খেলার মর্ম'—অর্থাৎ যখন প্রাণের চটুল চাপল্য খেলার খেয়ালে রূপায়িত হয়ে আনন্দ-ছন্দে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির মধ্যে বিধৃত হয়ে উঠে, তখনই জীবনের নূতন উপলব্ধি আরম্ভ হয়—খেলার কষ্টিপাথরে সেখানে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নিত্যকালের যাচাই চলে। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায় যে, ব্যাবিলন, মিশর, পেরুভিয়া প্রভৃতি দেশে যে খেলাধূলার প্রচলন ছিল, সে যুগের চিত্র-চিত্রণে, শিশুদের খেলনায় ও ভাস্কর্যে তার নিদর্শন মেলে—কোথাও পাষাণে খচিত কিরাত চিত্রে, খেলনায় অথবা দেহীর সুঠাম দেহ-ভাস্কর্যে।

সিনেমার পর্দায় আমরা যেমন সমাজের বিচিত্র জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই, খেলার দর্পণেও আবার তেমনি শিশুমনের চেহারা ধরা পড়ে। খেলার জগৎ শিশুর নিজের প্রাণের জগৎ—সেখানে ছুটির অবাধ খুশীর রাজ্যে যে প্রাণের আদান প্রদান চলে, তা জীবনপ্রবাহের স্বরূপ ; সে প্রাণের উৎসবে প্রাণ হতে প্রাণে উৎসারিত হয়ে উঠে জীবনের জয়োচ্ছ্বাস, অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে ঝংকৃত হয়ে উঠে কলমুখর আনন্দের সুর। তাই অনেকে বলেন যে, খেলা-ধূলার ছাঁচে লীলাময়ের অদৃশ্য হাতে ঢালাই হচ্ছে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন। কাজেই খেলাধূলাকে শিশু-জীবনের বহিরঙ্গের অনুষ্ঠান বলে মনে করলে চলবে না ; শিশুর আত্মিক ও দৈহিক বিকাশের সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত খেলার নিবিড় যোগ আছে। একথা প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌রাও স্বীকার করে বলেছেন যে, শিশুর দৈহিক, সামাজিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য খেলার প্রয়োজন আছে। খেলার মধ্যে শিশু-মনের পুঞ্জীভূত অনুভূতি, আবেগ, হাসি-কান্না, কল্পনা-অনুরাগ প্রকাশের পথ খুঁজে পায়, কর্মকুশল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছন্দময় নৈপুণ্য লাভ করে। এইজন্য শারীরিক শিক্ষা জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষা নামে অভিহিত (Physical education is life education).

খেলাই জীবন। শিশু যে বেড়ে উঠেছে, তার জীবনে একটার পর একটা পরিবর্তন আসছে—তা শিশুর খেলার সামগ্রী নির্বাচনের মধ্য দিয়েই প্রকট হয়ে উঠে, তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই। জল, বাতাস, খাদ্য, আলো যেমন জীবন ধারণের অপরিহার্য অঙ্গ, শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির জন্যও তেমনি খেলাধূলার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। খেলাকে বাদ দিলে শিশুর স্বাভাবিক জীবনের গতি ব্যাহত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, খেলাধূলার জগতে যে-শিশু কোনদিন প্রবেশ করে নি, তার জীবনে অপূর্ণতার উৎকট অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। সে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে অসামাজিক আত্মকেন্দ্রিক অমানুষ হয়ে উঠেছে—সঙ্কীর্ণতার অন্ধকারে তার প্রাণ নিরানন্দে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। একটি ইংরাজী প্রবাদেও ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে—All work and no play make jack a dull boy.

সদাচঞ্চল শিশুর আগ্রহ অধিকক্ষণ কোন কাজেই স্থায়ী হয় না; সে নিত্য নূতন পরিকল্পনার রসদ চায়, তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি কাজের তাগিদে এমন দুর্নিবার হয়ে উঠে যে কিছুতেই তা শান্ত হতে চায় না। তার আকাশে বাতাসে চরে বেড়ানো মন কেবলি বলেঃ "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।" কিন্তু সেই অন্য কোথার অনুসন্ধানের কৌতূহল খেলাধূলার মধ্যেই তার সে জিজ্ঞাসার সদুত্তর পায়, নিরন্তর ঘুরপাক খাওয়া অস্থিরতা আনন্দলোকের পথ খুঁজে পায়। খেলার মধ্যে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের শুধু যে প্রস্তুতি চলে তা নয়, শিশুর আত্মোপলব্ধিও ঘটে। তা ছাড়া খেলার জগতে শিশু নিজেকে এমনভাবে উজাড় করে দেয় যে, খেলার মাঠকে শিশু-পরীক্ষার গবেষণাগার বলা চলে। কাজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, শিশুকে বাঁচার মত করে বাঁচতে দিতে হলে পুতুলের দেশে, খেলার রাজ্যে তাকে নিয়ে যেতে হবে। জন্মের পর থেকেই শিশুর অঙ্গ সঞ্চালন শুরু হয়। ভারসমতা রক্ষা করার সময় থেকে শিশু খেলার মধ্যে চিত্তবিনোদনের আনন্দ পায়—এটুকু না হলে শিশুর ক্রমবর্ধমান মনের চাহিদা কিছুতেই মেটানো সম্ভব নয়।

খেলার সামগ্রী নির্বাচনের মধ্যে শিশুর উত্তর-জীবনের আভাস মেলে। মনের বিভিন্ন গঠন অনুসারেই শিশু তার খেলার জিনিস বাছাই করে। এ বিষয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশ খানিকটা পার্থক্য দেখা যায়। খেয়ালের খেলায় শিশুর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ জীবনে যে সৈনিক হবে, যে হবে বৈজ্ঞানিক বা নাবিক—তাদের খেলার সরঞ্জামও হবে সেই অনুপাতে বিভিন্ন। এমনি করে খেলার কষ্টি-পাথরে শিশুর সমগ্র জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আনুমানিক ধারণা জন্মে। তাই খেলা ও জীবনের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে একজন মন্তব্য করেছেন যে, Play is the child's means of living and understanding life.

এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলেই অনেক তত্ত্ব কথা এসে পড়ে। জীবন ও খেলার সম্পর্ক নিয়ে অনেক মনীষী মাথা ঘামিয়েছেন। সেই খেলার তত্ত্ব ও জীবনের সত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেকে বলেন যে, কোন একটি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই শিশু খেলা করে, অর্থাৎ একটা play motive হচ্ছে সমস্ত খেলার প্রেরণা।

জার্মাণ কবি শীলার খেলার সঙ্গে জীবনের যোগ কোথায় নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে, একটা অপ্রয়োজনের আনন্দের উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে খেলা-ধুলার। প্রাণশক্তি যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে, কাজের জন্য যখন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উন্মুখ—সেই অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই খেলা-ধূলার মধ্যে। একে তিনি উদ্বৃত্ত শক্তি বা সারপ্লাস এনারজির তত্ত্ব বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এর মধ্যে জীবন সম্পর্কিত কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য নেই। দৈনন্দিন জীবনে একটানা কাজের মধ্যে প্রাণ যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন ভিতর থেকে চিত্তবিনোদনের তাগিদ আসে। এই প্রেরণার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে খেলার অভিপ্রায়। একে তিনি বলেছেন, the aimless expenditure of an exuberant energy." জার্মাণ শারীরিক শিক্ষার জনক গুডস্‌ম্যুথও শীলারের অভিমতকে সমর্থন করেছেন।

চিত্ত-বিনোদন-নীতিবাদীরা কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, যখন দেহ মনে একটা অবসাদ বোঝার মত চেপে বসে, সেই জড়তার আলস্য থেকে দেহ, মন, এমন কি সমস্ত ইন্দ্রিয় মুক্তি চায়, তখনই সে নিছক আনন্দের পথ বেছে নেয়। খেলার মধ্যে সেই নির্দোষ আনন্দ আছে, যা সমস্ত ক্লান্তির গ্লানিকে মুছে দিয়ে মনকে নূতন উৎসাহে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারে। দুঃখের সংসারে আনন্দের সঞ্জীবনী সুধা যদি কিছু থাকে, তা' খেলার স্ফূর্তি। শহরের রুদ্ধ আত্মার শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য যেমন কৃত্রিম পার্কের প্রয়োজন, তেমনি কর্মব্যস্ত মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য খেলাধূলার একান্ত প্রয়োজন। ইংরাজ দার্শনিক লর্ড ক্যামুষ্ট বলেছেন যে, "Play is necessary for man in order to refresh himself after labour." কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, শ্রমশান্ত দেহে খেলাধূলার পরিশ্রম বিষবৎ কাজ করে। ধারণাটা সম্ভবত ঠিক নয়।

কর্মনীতিবাদীরা কিন্তু খেলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, হাতে কলমে কাজ করার সার্থকতা যথেষ্ট। প্রতিদিনের অভ্যাস, প্রতি মুহূর্তের শ্রম—মানুষকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত করে তোলে। অভিজ্ঞতার ধূলায় কোন কিছুই হারিয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথও ঠিক সেই কথাই বলেছেন, "জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পূর্ণের পদ পরশ তাহার পরে।" প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ক্যারল গ্রোস কিন্তু Practice theory-র পক্ষপাতী। তিনি খেলাধূলা সম্বন্ধে একটি চমৎকার কথা বলেছেন যে, "We do not play because we are young but are young in order that we may play."

এই খেলাধূলার মধ্যে ষ্টার্নলি হল একটা ধারাবাহিকতা অর্থাৎ জীবন বিবর্তনের রূপ দেখতে পেয়েছেন। খেলাধূলার মধ্যে বংশগত যে অভিপ্রায় আছে, তাকে তিনি বলেছেন খেলার ক্রম-বিবর্তন। অপ্রয়োজনের তাগিদে মানুষ কখনও খেলার জন্য অনুপ্রেরণা পায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ খেলাধূলার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। এমনি করে খেলার

মাধ্যমে মানুষের সমগ্র জীবনের পুনরাবৃত্তি চলে,—একে তিনি culture epoch of life বলেছেন। মানুষ শৈশবের বিস্ময়, কৈশোরের রূপকথা, যৌবনের কল্পনা প্রভৃতি বহু স্তর অতিক্রম করে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার কর্মজীবনে প্রবেশ করে। খেলার মধ্যে—অনুকরণে, আচরণে, অঙ্গভঙ্গিতে শিশু মনুষ্য-জীবনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে।

অ্যাথিলটনও বলেছেন যে, খেলা হচ্ছে জীবনমুখী। শুধু কি তাই, জীবনের সঙ্গে খেলার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "Play activity is of such a natural type that it would satisfy the need of growing boy or in other word, it is the hunger for growth." অর্থাৎ খেলাধূলাই জীব-দেহের প্রয়োজন মেটায়। ক্যাথার্‌সস্‌ নীতিবাদীরা বলেন যে, "Play is a safety valve for pent-up emotions." অর্থাৎ মনের বিচিত্র অভিপ্রায় খেলার মধ্যে রূপ পায়। যুদ্ধের খেলার মধ্যে শিশুর ক্রোধ পরিতৃপ্তির নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে, অনেক প্রবৃত্তির হাত থেকে শিশু রেহাই পায়। জোলাপ যেমন অন্ত্রের গ্লানি ভার দূর করে যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিমুক্ত করে তোলে দেহকে, খেলাও তেমনি distressing emotions থেকে প্রাণশক্তিকে অব্যাহতি দেয়।

এখন তত্ত্ব-মীমাংসায় আসা যাক। খেলা ও জীবন সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ গড়ে উঠেছে, তার কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সারগ্রাস নীতি খেলার আর যা ব্যাখ্যা দিক না কেন, ক্রীড়ামোদীদের ব্যক্তিগত জীবনের ভালমন্দ লাগার কোন কথা নেই সেখানে। কেন যে একটি বিশেষ খেলার প্রতি কোন একজনের বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়, সে প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। চিত্তবিনোদন-নীতিবাদীরা বয়স্কদের খেলা-প্রীতির বিষয়ে সন্তোষজনক কথা বলেন। কিন্তু শিশুর ক্রীড়া-মাদকতার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। কারণ, লাভালাভের উদ্দেশ্যেই যে শিশু খেলাধূলা করে, এমন নয়। তা ছাড়া, কেন সকলে একই খেলা ভালবাসে না, কেন অতিশয় ক্লান্ত হয়েও শিশুরা খেলা থেকে নিবৃত্ত হতে চায় না, তার কোন কথাই সেখানে আলোচনা করা হয় নি।

এদিক থেকে Practice theory অনেকটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু সেখানে Play desire-এর কথা বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ বয়স্করা কখনও কিছু না জেনে খেলায় যোগদান করে না। অথবা আমরা কেন খেলাধূলায় আত্মনিয়োগ করি, সে প্রশ্নের কোন আলোচনা নেই উক্ত তত্ত্ব-কথায়।

পুনরাবৃত্তি-তত্ত্ববাদীরা যদিও বলেছেন যে, আদিম ক্রিয়া-কলাপের প্রতি শিশুর স্বভাবজাত আগ্রহ আছে; কিন্তু খেলার বিবর্তন ধারায় সব মানুষই একই পথে অগ্রসর হয় না, কাজেই ঐ ব্যাখ্যাকেও সঠিক বলা চলে না।

শেষ কথা এই যে, খেলাধূলার মধ্যে সাধারণতঃ আমরা দুটি দিক দেখতে পাই—একটি হচ্ছে means of living or preparation for life, আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে understanding life. জীবনের প্রস্তুতিকরণ আর জীবনকে জানবার বা উপলব্ধি করার শক্তির সব চেয়ে বড় অনুপ্রেরণার সুযোগ মেলে খেলার মধ্যে। প্রাচীন কালে যখন মননশীলতার প্রাধান্যের উপর জোর দেওয়া হতো, তখন অবশ্য খেলার সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে নি। কিন্তু বর্তমান যুগে স্বীকৃত হয়েছে যে, জীবনের সংগে যখন খেলার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তখন খেলা যে জীবনের পরিপূরক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, উল্লিখিত মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

খেলার মধ্যে যে কি কি সদভ্যাস গঠিত হয়, এখন তা আলোচনা করা যাক। খেলার অনুশীলনের মধ্যে মোটামুটি চার প্রকার সদভ্যাস বা আচরণ গঠিত হয়। যথা, (১) শারীরিক, (২) মানসিক, (৩) অর্থনৈতিক, এবং (৪) সামাজিক।

নিম্নে গুণাবলীর তালিকা দেওয়া হল:

(১) **শারীরিক:** নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, দৈহিক যোগ্যতা (Physical fitness), ভার-সাম্য রক্ষা (body balance), চটপটে ভাব (smartness), সহনশীলতা প্রভৃতি।

(২) **মানসিক:** আত্মপ্রত্যয়, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, একসংগে

কাজ করার শক্তি, একতা, দলপ্রীতি, বিচার-শক্তি, নিঃস্বার্থপরতা, সহযোগিতা, সাধুতা, সাহস ও কার্যকুশলতা।

(৩) **অর্থনৈতিক ঃ** ঔষধের ব্যয়ভার থেকে মুক্ত সুস্থ দেহ। এ প্রসঙ্গে এই কথা বলা চলে যে, It is certainly good economy to make a boy and girl healthy and strong. It makes them good children, good workers, good parents and citizens. This means less expense on medicine, doctor's fee, more earning because of their sound health and skilful handing of working materials etc.

(৪) **সামাজিক ঃ** সংঘ-চেতনা (team spirit)। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতা, সকলে মিলে কাজ করা, আনুগত্য, দলের প্রত্যেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব, পরিমার্জিত খেলোয়াড়ী মনোভাব (good sportsmanship)। এক কথায় খেলার লক্ষ্যই হবে খেলা। সদুপায়ে বিজয়ের ইচ্ছা, পরাজিত হলেও অসংযত, অশিষ্ট আচরণ না করা, তা ধৈর্য, সংকীর্ণতা ও নীচতা দোষ থেকে মুক্তি ঔদার্য।

এই প্রসঙ্গে দেখানো যেতে পারে যে, কি করে খেলাধূলার অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ জীবনে রাষ্ট্রিক পারদর্শিতা লাভ করা যায়, অর্থাৎ খেলাধূলার নৈপুণ্যের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রিক সংগঠনী শক্তি পরোক্ষভাবে গড়ে উঠে। নিম্নে তার-ই একটি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

খেলার প্রস্তুতিকরণের সংগে রাষ্ট্র সংগঠনের সম্পর্ক

খেলাধূলা	রাষ্ট্র
(১) প্রত্যেক টিম সমগ্র একটি দল হিসাবে খেলে, একটি বা দুটি ভালো খেলোয়াড় নিয়ে জিততে পারা যায় না—সমবেত প্রচেষ্টার উপরই জয় পরাজয় নির্ভর করে।	(১) রাষ্ট্রও একটি দল বা unit হিসাবে কাজ করে—অর্থাৎ কোন সামগ্রিক শক্তির সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্রশক্তি কার্যকরী হতে পারে না।

খেলাধুলা	রাষ্ট্র
(২) ঠিক করে খেলোয়াড়ের মত খেলো (play the game).	(২) অর্থ, সম্মান, যশ, সদুপায়ে অর্জন করো।
(৩) সাহস এবং উদ্দীপনা।	(৩) কর্মপ্রেরণা এবং দায়িত্ব গ্রহণের সংসাহস।
(৪) খেলাধূলার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যে আইনকানুনের প্রয়োজন—খেলার মধ্যেই তার গোড়াপত্তন হয়।	(৪) রাষ্ট্র-নীতি প্রণয়নের উপযুক্ত স্থান ব্যবস্থাপক সভা।
(৫) খেলার বিধান লঙ্ঘন করো না—বরং নিয়মকানুন মেনে চলো।	(৫) আইন অনুসারে চলাই বিধেয়।
(৬) ক্রীড়া পরিচালক-ই খেলার বিধিবিধান প্রয়োগ করেন—শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সুপরিচালনার জন্য।	(৬) রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা এবং শান্তি-রক্ষার জন্য আছে পুলিশ, বিচারক আইন সভা।
(৭) আইন অমান্যের পরিণাম—বহিষ্করণ, অথবা সতর্ক করে দেওয়া।	(৭) জরিমানা, কিংবা শাস্তি—হাজত-বাস।

এই তো গেল খেলার সঙ্গে রাষ্ট্রিয় সম্পর্কের কথা। এখন খেলার সঙ্গে শিশু-মনের যোগাযোগের কথা আলোচনা করা যাক। আমরা জানি যে, মনের গঠন অনুসারেই মানুষ বিশেষ করে শিশুরা খেলার সামগ্রী বেছে নেয়। Make belief play-র মধ্যেই আভাস পাওয়া যায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের। কারণ খেলার মধ্য দিয়ে শিশু বার বার নিজেকে জাহির করতে চায়, প্রকাশ করতে চায় প্রাণশক্তিকে। এ বিষয়ে বয়সের তারতম্য অনুসারে ছেলে-মেয়েদের খেলার অভিরুচি বদলায়। তাই সাধারণতঃ দেখা যায় যে, একদল ছেলে যখন বল খেলার আনন্দে হৈ চৈ করছে, ঠিক সেই সময় উঠানের এক কোণে মেয়েরা খেলাঘরে সংসার পেতে বসেছে। প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারেই

রুচির পরিবর্তন ঘটে। এমনিতর খেলার সামগ্রী নির্বাচনের মধ্যেই ছেলে-মেয়েদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যটুকু ধরা পড়ে। বিশেষ-অবস্থার মধ্যে সকলের মধ্যেই যে কোন একটা সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এমন নয়। যে ছেলে ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হবে, সাধারণ খেলায় সে আনন্দ পাবে না—সে হয়তো মাটি, বালি, জল, কয়লা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত হবে। অর্থাৎ শৈশব-আচরণ থেকে আমরা শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করতে পারি। বিবেকানন্দ যে একজন মস্ত বড় সাধক হবেন, তা বার বার তাঁর সেই "ধ্যান ধ্যান" খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। উপসংহারে এই কথা বলা চলে যে, শিশুর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের অনেক লক্ষণ-ই ক্রীড়া-নিরত শিশুর আচরণের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। কারণ সেই খেলার সতর্ক মুহূর্তে শিশু হারিয়ে ফেলে আপন সত্তাকে, উজাড় করে দেয় নিজেকে। শিল্পী, কবি, যোদ্ধা, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি খ্যাতনামা মনীষীদের শৈশব-জীবনের বিচিত্র কাহিনী থেকেই এর অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়।

গল্প বলা

গল্প পেলে আমরা আর কিছু চাই না। ছেলে বুড়ো সকলেই গল্প শোনবার জন্য পাগল। গল্প ভালবাসে না এমন লোক নেই বল্লে-ই চলে; কিন্তু গল্প বলার কৌশলটা আমরা ক'জনে-ই-বা আয়ত্ত করতে পেরেছি? আমরা যদিও হামেসা গল্প গুজব করি, তথাপি ও ব্যাপারটা যে কি গোলমেলে, ছোটদের আসরে গল্প বলতে বসলেই তা' বেশ টের পাওয়া যায়। গল্প শুনতে শুনতে ছেলেরা এমন সব প্রশ্ন করে বসে, যার উত্তর দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। অনেক সময় গল্প বলার দোষে ছেলেরা 'ধান শুনতে কান' শুনে বসে; ফলে গল্প বলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আবার এমনও দেখা যায়, যে, গল্পটা ঠিক অনুধাবন করতে না পারার দরুণ, ছেলেরা ক্রমাগত

প্রশ্ন করছে ; কথায় কথায় 'তার মানে কি', 'কেন হোল'—ইত্যাদি নানা অবান্তর কথায় বক্তাকে কেবল-ই বাধা দিচ্ছে, কাহিনী এগুতে চাচ্ছে না ; তখন বুঝতে হবে যে, গল্প বলার মধ্যে ভাষা বা ভঙ্গীগত কোথাও নিশ্চয় একটা গলদ রয়ে গিয়েছে, যার ফলে শিশুচিন্তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, খেই হারিয়ে যাচ্ছে কল্পনার। এইজন্যে গল্প বলার আগে শিশুর চাহিদা আর গল্প বলার রীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

॥ গল্প কি ॥

এখন অবশ্য গল্প কি, সে কথাই আলোচনা করা যাক। ডাঃ জন্‌শন 'নিছক অলস কাহিনী' বলেই গল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু গল্প কি শুধু অলস কাহিনী? এতে কি জীবনের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ বা রসানুভূতির কথা নেই? বাস্তবে যা ঘটছে, তা' কি গল্পের বিষয়বস্তু নয়? গল্প কি শুধু তবে কাল্পনিক কাহিনী? ঠিক তা নয়; গল্প হচ্ছে facts of experience. অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতা লব্ধ কাহিনী ফলাও করে আর পাঁচ জনের কাছে বলা চলে, সেই তো গল্প। কিন্তু আমরা যা' দেখছি, হুবহু সে কথা বলতে গেলেই গল্প হবে না। রসোত্তীর্ণ না হলে, কোন কাহিনীই গল্প হয়ে উঠে না।

কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, গল্পের মধ্যে ঘটনার ঘনঘটা বা তত্ত্বকথা না থাকলেও, একটা রসঘন আনন্দ মূর্তি আছে। সে আনন্দ শুধু কথক বা লেখকের নিজের জন্য নয়, শ্রোতা বা পাঠকদের জন্য তা' সঞ্চিত থাকে। তাই কাউকে ভাল 'গল্প-বলিয়ে' বা 'কথক' হতে হলে গল্প বলার আর্ট বা কলা-কৌশলকে আয়ত্ত করতে হয়। তার আগে কিন্তু ভাল করে জানতে হবে গল্পটিকে। কারণ গল্পের সঙ্গে যদি কথকের প্রাণের যোগ না ঘটে, সে যদি নিজেকে উপভোগ করতে না পারে, তবে গল্পের রস ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে না। গল্পের সঙ্গে যে কথক নিজেকে মিশিয়ে ফেলে আপন উপলব্ধির রঙে গল্পকে অভিষিক্ত করে তুলতে পারে, সেই তো সত্যিকার উঁচুদরের গল্প-বলিয়ে। কারণ Good story-teller enjoys his own story. আখ্যান

বস্তু ভাল ভাবে না জানা থাকলে, গল্প বলতে গিয়ে হঠাৎ কাহিনীর খেই হারিয়ে যেতে পারে ; অথবা একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। তা' ছাড়া ঘটনার প্রবাহ মাঝে মাঝে এমন ভাবে আটকে যেতে পারে, যাতে গল্প জমা তো দূরের কথা, রসসৃষ্টির অভাবে ভাল গল্পও মাঠে মারা যাবে।

॥ গল্প বলা ॥

কাজেই গল্পের উপাদানগুলি যে কি, তা একটু জানতে হবে। গল্পকে বিশ্লেষণ করলে প্রধানতঃ তিনটি অংশ পাওয়া যায়, যথা—(১) কাহিনী, (২) গল্পের চিত্রাংশ, (৩) গল্পের ভাষা বা শব্দ-ভাণ্ডার। গল্পের কাহিনীর মধ্যেও আবার ঘটনার উত্থান, পতন ও সমাপ্তি বা পরিণতি আছে। তাই হঠাৎ গল্প আরম্ভ করা ঠিক নয়। গল্প বলার জন্যে প্রথমেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। গল্পের আবহাওয়া সৃষ্টি হলেই কাহিনীটি ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়ে ঘটনার চূড় (climex) পেরিয়ে সহজ স্বাভাবিক সমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছতে পারে। কাহিনীর এই শুরু থেকে সারা পর্যন্ত একটা অচ্ছেদ্য নিবিড় যোগ আছে। আরম্ভ থেকে চূড় পর্যন্ত কাহিনী হবে দীর্ঘ, কিন্তু চূড় থেকে সমাপ্তির অংশটুকু হবে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। গল্পের কাহিনীকে চূড়ে পৌঁছে দিয়েই অল্পের মধ্যে সমাপ্তিতে টানতে হবে। তা' না হলে গল্প কিছুতেই জমবে না।

॥ গল্পের কাঠামো ॥

এইজন্যে গল্পের আরম্ভ হবে নাটকীয় ভঙ্গীতে। তা' হলে শ্রোতাদের চমক লাগিয়ে দিয়ে তাদের মনকে আকৃষ্ট করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। কাহিনী থেকে শ্রোতাদের মনে যে কৌতূহলের সৃষ্টি হবে,—সেই উৎকণ্ঠা যখন শ্রোতাদের গল্পের শেষ পরিণতিতে টেনে নিয়ে যাবে, তখনই শ্রোতাদের চমক ভাঙ্গবে, তারা আবিষ্কার করবে গল্পের সত্যস্বরূপকে। গল্পের এইটুকু

সৃষ্টির জন্যেই কাহিনীর আরম্ভের সঙ্গেই ঘটনার উত্থান, পতন আর সংলাপ কত কিই না জুড়ে দিতে হয়।

॥ কাহিনী ॥

কাজেই গল্পটাকে ভাল করে জানতে হলে গল্পের বিভিন্নাংশকেও জানতে হবে। কারণ ঠিকমত গল্পের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তা ছাড়া সঠিক গল্পটি না জানার দরুণ মাঝে মাঝে শ্লথ হয়ে আসতে পারে গল্পের গতি, থেমে যেতে পারে কাহিনীর মূল সুরটি! ফলে এমনি করে থেমে থেমে গল্প এগুতে আরম্ভ করলে, শিশুদের কাছে তা' অস্বাভাবিক শোনাবে। গল্প বলার সময় ও বিষয় একটু সতর্ক হতে হবে।

॥ চিত্রাংশ ॥

কাহিনীর পরেই গল্পের চিত্রাংশের কথা উঠে। প্রত্যেক গল্পের মধ্যে যে বাণীমূর্তি রয়েছে, শিশুকল্পনায় তা' ধরা পড়ে। তাই গল্প শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মনে একটা ছবি আঁকা হয়ে যায়; তাদের মনে সৃষ্টি হয় ঘটনার ছায়া-মেদুর আবহাওয়া—ফলে গল্পটি ভুলে গেলেও ছবিটি কিন্তু তাদের মন থেকে মুছে যায় না। চলচ্চিত্রের মতই টুক্‌রো টুক্‌রো ছবির সুগ্রথিত কাহিনীই কি গল্প নয়? এইজন্যে কথককে কথার মারপ্যাচে সৃষ্টি করতে হবে কল্পনার ছবি। বলার গুণে গল্পের ছবিগুলি যখনই শ্রোতাদের সামনে ভেসে উঠে, তখনই তো জমে উঠে গল্পের আসর।

তা ছাড়া গল্পের চিত্রাংশই স্মরণের যোগসূত্র। গল্প সব সময়ে মুখস্থ থাকে না, কিন্তু ছবিটা মনে থাকলেই তা থেকে গল্প বলা যায়। কাহিনীর সূত্রটি হারিয়ে গেলেও কোন রকমে জোড়া-তালি দিয়ে গল্পটা বলা চলে, কিন্তু সেটাই কি গল্প বলার শেষ কথা? গল্প বলার মধ্যে থাকবে কথকের কল্পনা, সহানুভূতি আর অভিজ্ঞতার রঙ্। কারণ সত্যিকার গল্প হবে অভিজ্ঞতা-প্রসূত—জীবন্ত

কাহিনী। অর্থাৎ We tell what we see. কিন্তু আমরা যা' দেখি তাই কি গল্প? ঠিক আমরা যা দেখি, তাই বলতে গেলে খবরাখবর হতে পারে, কিন্তু গল্প হয়ে উঠে না। এইজন্যে গল্প বলার একটা বিশেষ ঢঙে কাহিনীকে ঢালাই করতে হয়, তা না হলে স্রষ্টার রসে সৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠে না।

॥ গল্পের রূপায়ন ॥

একটি অতি সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করা যাক, যেমন—

···ছাতাটি বন্ধ করে এক ভদ্রলোক ট্রামে উঠলেন······উঠেই কোন দিকে দিক্‌পাত না করে একটি সীটে ধপ্ করে বসে পড়লেন···

এ একটি অতি সাধারণ ঘটনা···এখানে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বা এমন কোন চাঞ্চল্য তার গতিবিধির মধ্যে নেই, যা অন্য যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

কিন্তু······

হঠাৎ একজন হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রামে উঠে ধপাস্ করে বসে পড়লো···তার জামা কাপড়ে রক্তের দাগ···এখানে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত উৎকণ্ঠা এবং উত্তেজনা খুব আছে; কাজেই এই ঘটনার যোগসূত্র ধরে গল্প শুরু করা যেতে পারে······

॥ শব্দ সম্পদ ॥

এবার গল্পের শব্দ সম্পদের কথায় আসা যাক। প্রত্যেক গল্পের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। গল্পের প্রকৃতি অনুসারেই তার ভাষা বদলায়। কেতাবের ভাষায় গল্প বলা চলে না; গল্প পরিবেশনের সময় নিজের কথায় আপন মনের রসে রসায়িত করে ছোট অথচ সহজ কথায় তা উপস্থিত করতে পারলেই গল্প উপভোগ্য হয়ে উঠে। গল্পের মধ্যে কোন ছড়া বা কবিতা থাকলে তা অবশ্য রদবদল করা ঠিক নয়, ওগুলি অপরিবর্তিত রাখাই উচিত। এখন কথা হচ্ছে

আখ্যানাংশ, চিত্রাংশ যার আয়ত্ত হয়েছে, তাকে শব্দ সম্পদের জন্ম ভাবতে হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে গল্প বলার জন্যে কি উপকরণের প্রয়োজন? গল্প বলার জন্য কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম দ্বিবিধ উপাদানেরই প্রয়োজন হয়। অকৃত্রিম উপাদান কথকের নিজস্ব সম্পদ, তার জন্য অবশ্য কিছুটা অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। উপাদানগুলি যথাক্রমে :—

গল্পের উপকরণ ॥

(১) বাঙ্ময় কণ্ঠস্বর মধুর হবে।

(২) কথ্য ভাষার উপর দখল থাকবে।

(৩) শিশুর মনস্তত্ত্বকে জানতে হবে।

(৪) শিশু-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

(৫) নাট্যরস বোধ থাকবে।

॥ কৃত্রিম উপাদান ॥

(ক) পরিবেশ সৃষ্টি

(খ) গল্পের অনুকূল শ্রেণী-সৌষ্ঠব

(গ) রেখা-চিত্র, কাটা কাগজের ছবি

(ঘ) খেলাধূলা, নৃত্য ও নাটকীয় ভঙ্গী

গল্পের উপকরণগুলি শুধু জান্‌লেই চলে না; গল্প বলার জন্য রীতিমত অনুশীলনের প্রয়োজন। গল্প বলার সুকঠিন কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হলে নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা নিম্নলিখিত সুঅভ্যাসগুলি গঠন করতে হয়, যথা—

॥ গল্পানুশীলন ॥

(১) কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ

(২) শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ

(৩) গল্পবলায় বিরতির প্রয়োজন

(৪) বক্তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব

(৫) অভিনয়ের অবকাশ

ঐ ছাড়া জানতে হবে কি কি উপাদানে গল্প রচিত হবে। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চাহিদা যেমন বদলায়, গল্পের প্রকৃতিও তেমনি বয়সের সঙ্গে বিভিন্ন হবে। কাজেই শিশু-মনস্তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে গল্প বলতে হলেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে :—

॥ গল্পের উপাদান ॥

(১) গল্প থেকে ভয়ের বিষয়বস্তুটুকু পরিহার করতে হবে।

(২) বাক্যাংশগুলি যতদূর সম্ভব সহজ সরল এবং শিশুর পরিচিত হওয়া উচিত।

(৩) সম্ভব হলে যুক্তাক্ষর বর্জন করতে হবে।

(৪) বয়স অনুযায়ী গল্পের প্রকৃতি ও উপাদান ভিন্ন হবে।

(৫) গল্পগুলি কাল্পনিক ও চিত্তাকর্ষক হবে।

(৬) গল্পের আয়তন হবে স্বল্প এবং তাতে সংলাপ থাকবে।

(৭) গল্পের একটা সামাজিক ও নৈতিক মূল্য থাকবে।

(৮) গল্পের বিষয়গুলি হবে আনন্দমূলক এবং মাঝে মাঝে দু'এক ছত্র সমিল কবিতাও থাকবে।

॥ গল্পকে রূপান্তরিত করা ॥

গল্পের বিষয়বস্তুর পরেই গল্প নির্বাচনের কথা উঠে। নির্বাচনই গল্পারম্ভের প্রথম পর্ব। গল্প মনোনয়নের পরই দেখতে হবে যে, গল্পটি নেহাৎ ছোট, না বড় ? কারণ প্রয়োজনবোধে গল্পকে সময়োপযোগী করে বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলতে হয়। গল্প বড় হলে তার অবান্তর অংশ বাদ দিয়ে ছোট করে নিতে হয়; আর নিতান্ত ছোট হলে কল্পনার রঙ চড়িয়ে তাকে

বড় করে তুলতে হয়। এ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন যাই হোক, গল্প গ্রহণোপযোগী হলেই চলবে। আর গল্প বড় হলে—

(ক) পার্শ্ব চরিত্র ছেঁটে বাদ দিতে হবে।

(খ) অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাও বাদ দিতে হবে।

(গ) দীর্ঘ সংলাপ সংক্ষিপ্ত করতে হবে।

তা বলে গল্প ছোট করতে গিয়ে ঘটনার পারম্পর্য ও যৌক্তিকতাকে ক্ষুণ্ণ করলে চলবে না। গল্প বাড়ানো বা কমানোর সময় দেখতে হবে যে, গল্পের যোগসূত্রে যেন একটা ধারাবাহিকতা এবং যৌক্তিকতা বজায় থাকে; নচেৎ গল্পের মূল সুর ব্যাহত হবে, থাপছাড়া হয়ে যাবে কাহিনী।

॥ গল্পের শ্রেণীবিভাগ ॥

এর পরেই আসে গল্পের শ্রেণীবিভাগের কথা। বয়সের স্তর ভেদেই গল্পের পর্যায় সৃষ্টি। প্রথম প্রাক্ পঠন শৈশব অবস্থার (১-৫) কথাই ধরা যাক্। ১-৩ বছরের শিশুদের গল্পের ভাষা হবে খুব সহজ এবং ছান্দিক। অর্থাৎ খুব ছোটদের গল্প হবে ছড়া আর ছন্দে ভরা—যার মধ্যে থাকবে আনন্দের দোলা, ভাব আর পুনরাবৃত্তি।

প্রথম বিভাগ

যেমন— নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে।

বা যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে ইত্যাদি।

এখানে যদিও কোন সংগত অর্থ নেই, ঘটনার জটিলতা নেই, পারম্পর্য নেই অথচ এই স্রোতের মত ভেসে যাওয়া কাহিনীর স্বতোৎসারিত গতি, শিশুকে আনন্দ দেবে।

দ্বিতীয় বিভাগ

৩-৫ বৎসরের শিশুর পরিচিত পরিবেশের কাহিনীই হবে তার গল্প। এই

বয়সে শিশুর শব্দভাণ্ডার কিছুটা বেড়েছে, গল্পের কথা সে বুঝতে শিখেছে। কিন্তু সে কি চায়, কিসে আনন্দ পায়, তা সে বুঝতে ও বলতে পারে। এই বয়সের কৌতূহল প্রবল, সে প্রশ্ন করে সমস্ত জানতে চায়। পাখী উড়ে কেন? পুতুলের মা নেই কেন? আমি তার মা হবো, ইত্যাদি কথা সে বলে। কাজেই এই পরিচিত পরিবেশের বিষয়বস্তু তার কাছে আকর্ষণীয় হবে। তাই এই চেনা পরিবেশের কথা দিয়েই তাদের গল্পের পসরা সাজাতে হবে। পুতুল বা জীবজন্তুর মুখেই তাদের ভাষা দিতে হবে। যেমন—ছোট কুকুরের ছানাটি মাকে হারিয়ে কেঁউ কেঁউ করছিল; একটা ফুটফুটে ছোট মেয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বল্লে, কাঁদছ কেন ভাই! ইত্যাদি গল্প বলা চলবে। এতে শিশুদের প্রক্ষোভ ও সহজাত প্রবৃত্তি কিছুটা সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠবে; এবং শিশুর ভাব-প্রবণতাও স্ফূর্ত হবে। এ ছাড়া শিশু নিজ অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে ভালবাসে। কাজেই এ ধরণের গল্প তার পরিবেশ অনুযায়ী হবে, অর্থাৎ শিশুর বাড়ী, গ্রাম বা শহরকে কেন্দ্র করে গল্প রচিত হতে পারে। এ বয়সে শিশুদের গল্প বলাতেও হবে; কারণ এখন তারা নীরব শ্রোতা নয়, বক্তাও হতে চায়।

তৃতীয় বিভাগ

পাঠারম্ভের অবস্থা হচ্ছে ৬-৮ বৎসরের মধ্যে। একে বাল্যাবস্থা বা শৈশবোত্তর কালও বলা চলে। এ বয়সে শিশুর অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে, কল্পনাশক্তিও জাগ্রত হয়েছে এবং কিছুটা বিচার-বিবেচনা শক্তিও হয়েছে। কাজেই এই বয়সের শিশুদের কাছে রূপকথার গল্প বলা চলে; তবে এ বয়সের রূপকথার গল্প হবে অপেক্ষাকৃত সহজ স্বাভাবিক। কোন ঘটনার মধ্যে কোথাও জটিলতা বা ঘোরাল কিছু থাকবে না। গল্প শুনতে শুনতে শিশুরা যেন ভেবে নিতে পারে যে, এর পর এই জিনিস আসবে, তা হলে গল্পটি অনুধাবন করতে শিশুদের তেমন বেগ পেতে হবে না। শিশুর কৌতূহল গল্পের

শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে শিশুর মনকে; গল্পের আকর্ষণ এবং আনন্দ দুই থাকবে শিশুর কাছে—এই ধরণের গল্পই এ বয়সের উপযোগী হবে।

চতুর্থ বিভাগ

বাল্যোত্তর (Primary school period) ৮-১১ বৎসর—

এই বয়সে শিশুর চেতনা যেমন সজাগ হয়ে উঠতে থাকে, মনও তেমনি হয়ে উঠে বহির্মুখী। দলগত মনোভাবও প্রবল হতে থাকে—শিশুমাত্র মিলে মিশে খেলা করতে চায়। দলগত খেলাধূলা, মারামারি প্রতিযোগিতাই এই বয়সের শিশুরাই ভালবাসে। কাজেই এই বয়সের শিশুদের উপযুক্ত গল্প হবে :—

(ক) রবিনহুডের গল্প, বিশে ডাকাতের, ভোম্বল সর্দার, গালিভার এবং ছাত্রাবাসের গল্প।

(খ) ছোট ছোট আদর্শ বা উদ্দেশ্যমূলক কাহিনী, জীবনী এবং নীতিগল্প।

(গ) তা ছাড়া প্রকৃতির গল্প প্রভৃতি।

পঞ্চম বিভাগ

কৈশোর অবস্থা (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বয়স বা বয়ঃসন্ধিকাল)

ছেলেদের ১১-১৪ } আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবশ্য ১১ বছর
মেয়েদের ১১-১৩ } থেকেই বয়ঃসন্ধিকাল উপস্থিত হয়ে যায়।

এই বয়সে গল্প শোনানোর চেয়ে পড়তে দেওয়াই ভাল। কৈশোরের গল্পে নীতিকথা, আদর্শ হাস্যরস, বীরপূজা কোন কিছুই বাদ যাবে না। এই বয়সে গল্প বলার চেয়ে জানার পথের সন্ধান দিতে হবে—বই পড়ে শিশুরা আরও জ্ঞান আর আনন্দ আহরণ করবে।

এ ছাড়া ছোটদের গল্পে থাকবে পুনরাবৃত্তি। কোন একটা বক্তব্যের শেষে একই কথা বার বার ঘুরে ফিরে আসবে; তাহলে শিশুরা আনন্দ পাবে,

গল্লাংশের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটবে ; জানা জিনিসের পুনরাবৃত্তি থেকেই গল্পের অনেকাংশই শিশুর কাছে পরিচিত বলে মনে হবে। কাহিনী অবশ্য হবে বর্ণনা-বহুল নয়, ঘটনাবহুল—কারণ ঘটনার ঘনঘটায় কাহিনী আপনা থেকেই জমে ওঠে।

ঘটনার বহুলত্বই হবে শিশু-গল্পের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। গল্পটি ঘটনায় ঘটনায় ঠাসা হবে, কিন্তু মোটেই এলোমেলো হবে না। জানা বিষয়বস্তু থেকেই অজানায় শিশু-কল্পনা ছুটে যায়। তাই পরিচিত জিনিস, কথা, শব্দ প্রভৃতিকে অবলম্বন করেই শিশুদের উপযোগী গল্প রচনা করতে হবে।

এ ছাড়া শিশু-গল্প হবে সহজ চিত্র-বহুল। পরিচিত পরিবেশের চিত্র অথবা কোন জানা বা পরিচিত বস্তুর মাধ্যমেই রূপায়িত হয়ে উঠে শিশু-কল্পনার চিত্র।

যেমন—উই টিপিকে কেন্দ্র করেই শিশুদের মনে পাহাড়ের ধারণা দেওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গল্প বলার ভঙ্গী কি হবে ? অর্থাৎ কি ভাবে গল্প বলতে হবে ? এক কথায় গল্প বলার ভঙ্গী হবে সহজ, সরল। অর্থাৎ কথা বলায় কোন অস্পষ্টতা দোষ থাকবে না।

॥ গল্প বলার ভঙ্গী ॥

গল্প বলার ভঙ্গী হবে—

(১) সরাসরি (direct)

(২) সহজ সরল (simple)

(৩) নাটকীয় (dramatic)

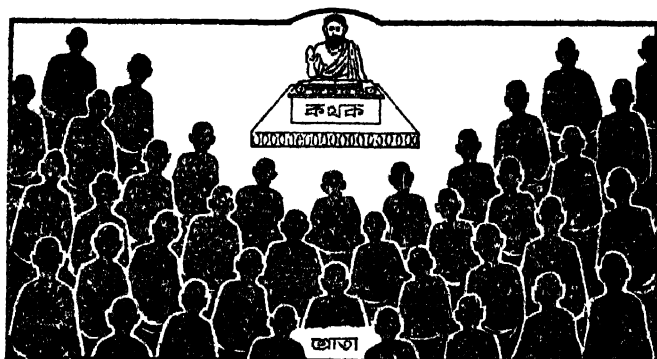
(৪) অভিব্যক্তি যেন অতি নাটকীয় না হয়।

অর্থাৎ হাসি কান্না, রাগ, ভয় ও আনন্দের ভাব যেন বক্তার মুখের ভঙ্গীতেই প্রকাশ পায় ; এর জন্যে অভিনয়ের আশ্রয় নেওয়াটা ঠিক নয়। কারণ বেশী নাটকীয় ভাব ছেলেদের হাসির উদ্রেক করতে পারে, কাজেই তা বর্জনীয়।

॥ শ্রেণী বিভাগ ॥

শ্রেণী সাজানোর ব্যবস্থাই হচ্ছে গল্প বলার শেষ পর্ব।

গল্পের শ্রেণীতে শিশুরা বসবে অর্ধচন্দ্রের মত হয়ে, আর কথক বা শিক্ষক বসবেন অর্ধবৃত্তের সামনে। এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, কথকের মুখ যেমন শিশুরা দেখতে পায়, 'কথক'-ও তেমনি এক নজরে দেখতে পান সকল শিশুকেই। তা ছাড়া এমন ভাবে ছেলেদের বসবার ব্যবস্থা করতে হবে যে, তারা যেন ঘাড়



শ্রেণী বিন্যাস—কথক ও শ্রোতার আসন

না বেঁকিয়ে অতি সহজেই কথককে দেখতে পায়। গল্প শোনার সময় শিশুরা কথকের গা ঘেঁসে বসতে চায়, তাঁর এতটুকু নিকট সান্নিধ্যের জন্যই অনেক সময় তারা কলহ করে। কাজেই ঐ অসুবিধা দূর করবার জন্যে সকলের কাছ থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখতে হবে; এবং এমন ভাবে গল্প বলতে হবে যে, প্রত্যেক শিশুই যেন মনে করতে পারে যে, কথক নিশ্চয় তাকেই গল্প বলছেন।

॥ শ্রেণী-শৃঙ্খলা ॥

শ্রেণী-শৃঙ্খলার জন্যে কথন-ই জোর গলায় কথা বলা ঠিক নয়। গল্প বলার

সময় ছেলেদের মধ্যে এতটুকু বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে, ধমকে তাদের চুপ করালে কোন ফল হয় না ; গল্পের যাদুস্পর্শে তাদের মুগ্ধ করেই শ্রেণী-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। অনেক সময় আবার গল্প বলার মনোভাবের উপর গল্প বলার ভালমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে : যেমন কথকের ইচ্ছে নেই অথচ শিশুরা জিদ ধরেছে গল্প শুনবে, সে ক্ষেত্রে গল্প বলাটা কিছুতেই ভাল হতে পারে না ; কারণ সেখানে গল্প বলার মধ্যে আন্তরিকতার পরিবর্তে আসবে ফাঁকি। এ ছাড়া তথাকথিত মাষ্টার মহাশয়ের গম্ভীর মনোভাব—কোনরূপে দায়িত্ব সারা —যেন কথকের না থাকে। কথক যেখানে নিজেই একাধারে শ্রোতা ও রসবেত্তা—উপলব্ধির ক্ষেত্রে শিশুদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন,—গল্প সেখানে হয়ে উঠেছে পরম উপভোগ্য।

॥ গল্প বলার দোষ ॥

পরিশেষে গল্প বলার ক্রটিবিচ্যুতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। একে ঠিক গল্প বলার দোষ না বলে কথকের ক্রটি বলা যেতে পারে। কাজেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি প্রত্যেক কথকের একটু খেয়াল রাখতে হবে, যথা :—

(ক) কথক যদি তার কথাবার্তায়, আচার-আচরণে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে না পারে, তা হলে কিছুতেই গল্প জমতে পারে না। শ্রোতাদের ভালবাসা না পাওয়াটাও কথকের ক্রটি।

(খ) উচ্চারণ দোষই হচ্ছে কথকের মারাত্মক দোষ। তাছাড়া সুমধুর লালিত্যপূর্ণ ভাষা ও কণ্ঠস্বর গুণেই ছোটদের অন্তর স্পর্শ করা যায় ; কাজেই ও-দুটোর যে কোন একটার অভাবই কথকের ক্রটি বলে গণ্য হবে।

(গ) কথ্য ভাষায় দখল না থাকলে গল্প বলা চলে না।

(ঘ) এক ঘেয়ে সুর, কর্কশ আওয়াজ ও একটানা বিনিয়ে বিনিয়ে বলা কথাটাও কথকের দোষ।

(ঙ) রসহীন বাক্য কারো প্রাণে সাড়া জাগায় না। গুরু-গম্ভীর মাষ্টারী ভাব শ্রোতা ও কথকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। ওটাও একটা ত্রুটি।

(চ) সুশ্রী চেহারা না হলে শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট করা যায় না; রঙ্গ রসিকতার অভাবও কথকের আর একটি ত্রুটি।

(ছ) মুদ্রাদোষ কথকের অন্য একটি ত্রুটি। কথায় কথায় মুদ্রাদোষ দেখা দিলে গল্পের রস দানা বাঁধতে পারে না। কারণ 'বুঝেছ কিনা', 'আচ্ছা', 'বটেত' প্রভৃতি কথায় মাঝে মাঝে কাহিনীর স্রোত ঘুরপাক খায়; অবান্তর কথার ভিড় ঠেলে গল্প এগুতে চায় না। কাজেই মুদ্রাদোষ বর্জনীয়।

গল্প নির্বাচন

গল্প নির্বাচনের সময় প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, শিশু মাত্রই অব্যবহিত বর্তমানের গণ্ডির মধ্যে বাস করে। তবু তার প্রতিদিনের জগৎ কী আশ্চর্য কল্পনা আর রহস্যে ঢাকা! জীবনই যেন তার কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু। প্রত্যক্ষ বাস্তবকে নিয়ে শুরু হয় তার অনুসন্ধান আর পরীক্ষা। কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, শিশু মাত্রই তার চেনা পরিবেশের গল্প শুনতে চাইবে; যা' সে দেখে, শোনে, দুহাতের মধ্যে পায়—সে বিষয়ই সে জানতে চায়; এই জানার মধ্যেই প্রকাশ পায় শিশুর নিজস্ব অভিপ্রায়; তার কারণ এই যে, শিশু মাত্রই অত্যন্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। কাজেই এমন গল্প তাদের বলতে হবে, যা তার চিরপরিচিত পরিবেশের কাহিনী এবং যাকে সে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে। গল্প নির্বাচনের সময় এদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে।

বছর তিনেকের ছোট শিশুরা কিন্তু নিজ অভিজ্ঞতার কথা শুনতে ভালবাসে। কাজেই সেই বয়সের শিশুদের কাছে সেই বয়সের অভিজ্ঞতা আর সংলাপ একান্ত হৃদয়গ্রাহী হবে। তাই দেখা যায় যে, তিন বছরের শিশুরা নিজ অভিব্যক্তির কথা শুনতে পেলে আর কিছু চায় না। শিশু মাত্রই যা করতে

চায়, যা তার ভাল লাগে, অন্য শিশু এমন কি পশুপক্ষীর জবানীতেও শিশুরা তা শুনতে ভালবাসে। তাই গল্পের কুকুর, বিড়ালের মুখে তাদেরই ভাষা শুনলে শিশুরা এতটুকু অবাক হয় না, বরং তাদের মুখের কথায় শিশুরা খুশী হয়। এমনি করে জীবজন্তুর গল্প শুনতে শুনতে রূপকথার প্রতি শিশুদের মোহ জন্মে। তাই বলে যে কোন বয়সের ছেলেদের কাছে রূপকথা বলাটা কি ঠিক? শিশুর মন তৈরী হবার আগেই রূপকথার অবাধ কল্পনায় শিশুদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। কাজেই যাতে অতি ছোট বয়সেই শিশুদের কাছে রূপকথার গল্প বলা না হয়, সে বিষয়ে 'কথক'কে একটু সজাগ হতে হবে। রূপকথার কাহিনী যে তাদের অনুপযোগী হবে তা নয়, রূপকথার আশ্চর্য জগৎ, যাতে তাদের বিভ্রান্ত, চমকিত না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজেই সেই ধরণের কোন গল্প বলার আগে, তাদের মনকে এমন ভাবে তৈরী করে নিতে হবে যে, সহজ স্বাভাবিক কৌতূহলবশেই শিশু যেন প্রবেশ করতে পারে রূপকথার জগতে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কোন্ সময় রূপকথার গল্প বলতে হবে? বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে শিশু যখন অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তখন নিছক কল্পনা তার কাছে নিরর্থক। কাজেই বাস্তব পরিবেষ্টনীর রহস্যানুসন্ধানে শিশু যখন ব্যস্ত, তখন তাকে কল্পনার তেপান্তরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গল্প বলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। বাস্তব-ই শিশু-কল্পনার উৎস—প্রত্যক্ষ সত্যের তোরণদ্বার দিয়েই শিশুরা প্রবেশ করে কল্পনার অনিত্য লোকে। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে কেমন করে শিশুরা কল্পনার রসাস্বাদন করবে? তার উত্তরে একজন শিশুবিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, শিশুদের কাল্পনিক উপলব্ধির ক্ষমতা বাড়াতে হলে, তার পক্ষে যা জীবন্ত সত্য, সেই পরিবেশের সঙ্গেই তার নিবিড় সংযোগ ঘটাতে হবে। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন যে, 'We can best help child to an appreciation of the imaginative by keeping close to what is actual for him.'

এই প্রত্যক্ষ পরিচিতির কথা অবশ্য স্কুলের প্রথম দুটি শ্রেণীর শিশুদের জীবনে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

এখন ছোটদের উপযোগী গল্পের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

॥ শিশু-অভিজ্ঞতার কাহিনী ॥

শিশু-অভিজ্ঞতার কাহিনীই হবে শিশু-গল্পের প্রথম স্তর। একান্ত ছোটদের কাছে তার নিজ অভিজ্ঞতাই সত্য, তার বাইরে শিশুর অন্য কোন কথা জানা নেই। কাজেই সে অজানা কথার প্রতি তার বিশেষ মোহ নেই। তার কারণ এই যে, নিতান্ত ছোট শিশু মাত্রই একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তার চারিপাশে যে স্পষ্ট পরিসর পরিবেশ রয়েছে, তার বাইরে শিশুর দৃষ্টি চলে না। তাই গল্পের মধ্যে সে তার মা বাপ অথবা নিজের কথা শুনতে পেলে খুশী হয়ে উঠে। আর একটু বয়স বাড়লে শিশুরা এমন অভিজ্ঞতার গল্প চায়, যা তারা নিজেরাই করে বা বলে। শুধু কি তাই? বৈচিত্র্যহীন একান্ত পরিচিত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেও শিশু-কল্পনা অনেক সময় মূর্ত হয়ে ওঠে। নিত্য দেখার ফলে যে বস্তুগুলি আমাদের কাছে বিশ্রী একঘেয়ে বলে মনে হয়, সেগুলির মধ্যেও শিশুরা কত না নূতনত্বের সন্ধান পায়। তাই রেলপথ, দোকান-পসার, টেলিগ্রাফের পোষ্ট, টেলিফোন প্রভৃতি অতি সাধারণ বিষয়বস্তুগুলির রহস্য শিশুদের কাছে দৈত্যপুরীর কাহিনীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ ধরণের গল্প আমাদের সাহিত্যে বিশেষ নেই। ফলে হয় কি, আমরা অনেক সময় অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেদের গল্পই ছোট শিশুদের কাছে পরিবেশন করে থাকি। কাজেই সে গল্পে শিশুরা আনন্দ পায় না, অধিকাংশ সময় তাদের মনের ক্ষুধা অতৃপ্ত থেকে যায়। ফলে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে গল্প-বলার উদ্দেশ্য সেখানে ব্যর্থ হয়।

আমেরিকান সাহিত্যে অবশ্য ঐ ধরণের গল্পের অভাব নেই। Hitchell এর রচিত এখন ও এখনকার গল্প (Here and Now Story Book)—জীবন্ত

অভিজ্ঞতার কাহিনী। বয়সের দিকে লক্ষ্য রেখেই সেখানে গল্পের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। সেখানে দুবছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে সাত বছর পর্যন্ত শিশুদের উপযোগী অসংখ্য অভিজ্ঞতার গল্প আছে। বয়সানুসারেই গল্পগুলি পুস্তকটিতে সুন্দর ভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। ছোটদের গল্প-কথা প্রসংগে লেখক সেখানে মন্তব্য করেছেন যে, দু' তিন বছরের শিশুদের গল্প যখন একান্ত তাদের নিজেদেরই কথা, তখন তাদের উদ্দেশ্যেই গল্পগুলি রচিত না হলে সেগুলি বয়সের উপযুক্ত না হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্যে লেখক বলেছেন সে ঐ ধরণের গল্পগুলি হবে শিশু-অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালা type বিশেষ, বর্ণনা বা কল্পনামূলক কাহিনী নয়।

॥ অন্যান্য শিশুদের গল্প ॥

শিশুদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার গল্পের পরেই আসে অন্যান্য শিশুদের কথা। বয়সের সঙ্গে যখন শিশু-অভিজ্ঞতার পরিধি বেড়ে চলে, তখন অন্যান্য শিশুদের কথা জানার জন্যে তাদের মনে কৌতূহল জাগে। শিশুর আত্মকেন্দ্রিক মন তখন নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই সেই বয়সের অন্যান্য শিশুদের জানতে চায়, যাচাই করে দেখতে চায় নিজ অভিজ্ঞতাকে। তাই দেখা যায় যে, অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরা তাদের নিজ অভিপ্রায় বা ইচ্ছাগুলি অপরের কার্যকলাপের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠতে দেখলে খুশী হয়ে উঠে। শুধু তাই নয়, তারা আরো চায় যে, বার বার সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হোক। তিন চার বছরের শিশুর কাছে ঘটনার এই পুনরাবৃত্তিটুকু বিস্ময়ের চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ। তার কারণ এই যে, ছোটরা যেমন কাহিনীর জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় না, গল্পের গতির সঙ্গে ঘটনার পুংখানুপুংখ বিবরণটুকুও তেমনি তারা অনুধাবন করতে পারে না। কাজেই শিশুদের সেই মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার জন্যে গল্পের মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তির আয়োজন। এইজন্যে 'যমুনাবতী সরস্বতী, কাল যমুনার বিয়ে' কিংবা 'নাকের বদলে নরুণ পেলাম টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্' প্রভৃতি গল্প ঐ বয়সের শিশুদের পরম উপভোগ্য হবে।

॥ শিশু-পশু-পক্ষী-ইঞ্জিন-শকট প্রভৃতি চলমান বস্তুর গল্প ॥

তৃতীয় স্তরের গল্প হবে চলমান বস্তুর গল্প। কারণ শিশু মাত্রই নিজ চাঞ্চল্যের প্রতিচ্ছবি দেখতে চায় যে কোন প্রাণী, এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও। তার কারণ শিশুদের এই উপলব্ধিবোধ তাদের জৈবিক চেতনাসঞ্জাত। চার পাঁচ বছরের শিশুরা অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করে। তাদের মননশীলতা আরম্ভ হয় জৈবিক অনুভূতির মাধ্যমে। কাজেই শিশুর চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব মূর্ত হয়ে উঠে তার খেলাধূলার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে। আপন প্রকৃতি অনুসারে শিশু মাত্রই জড় নির্জীব পদার্থের মধ্যেও দেখতে চায় সেই গতি আর অস্থির চাঞ্চল্যকে। কাজেই আমরা যদি কোন নির্জীব পদার্থের গল্প ঐ বয়সের শিশুকে শোনাতে চাই, তা হলে গল্পের মধ্যে তাকে জীবন্ত করে তুলতে হবে,—তবেই শিশুরা তাকে জীবন দিয়ে অনুভব করবে। তা ছাড়া গল্প যদি সহজ ও স্পষ্ট হয়, তবে গল্পের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে শিশু সহজেই নিজেদের সনাক্ত করতে পারবে ; এবং তাদের এই Personification-এর সময় কোন জটিলতার সৃষ্টি হবে না, অথবা বাস্তবের গণ্ডী থেকে তাদের কল্পনার অচেনা জগতে টেনে নিয়ে যেতে হবে না। বাস্তব রহস্যই তাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে রাখবে। কারণ নেকড়ের মুখে মানুষের ভাষা দিলেও, সে যে-নেকড়ে, সেই নেকড়েই থাক্‌বে, এবং ইঞ্জিন ইঞ্জিনই থেকে যাবে।

এই জন্যে দেখা যায় যে, কুকুর-বিড়াল-খরগোস মানুষের পোষাক পরে গল্পের মধ্যে যখন কথা বলে, তা শিশুদের খুব আনন্দ দেয়। তাই গাঁয়ের ইঁদুর আর শহরের ইঁদুরের গল্প, বিড়াল বা নেকড়ের কথা শিশুদের ভাল লাগে।

আধুনিক বিজ্ঞানের কলকব্জার বিস্ময়কর গল্প শব্দমুখর শহরের দৃশ্য বা চিত্র কোন কাহিনীতে পাওয়া দুষ্কর—কাজেই শিশুদের কাছে ঐ ধরণের কোন গল্প পরিবেশন করা সম্ভবপর নয়। তা সম্ভব হলে গল্পগুলি নিশ্চয় শিশুদের

হৃদয়গ্রাহী হতো। কারণ, গল্পের মধ্যে শিশু চায় action, তা সে যে-ধরণের গল্পই হোক না কেন—জীবজন্তু, দৈত্যদানব, পরী অথবা অন্য কিছু।

॥ রূপকথা অথবা রূপক গল্প ॥

অভিজ্ঞতা আর বাস্তবতার পরেই আসে রূপকথার গল্প। মন্তেসরি অবশ্যই বলেছেন যে, রূপকথার গল্প শিশুদের কাছে পরিবেশন করা ঠিক নয়, তথাপি শিশু মাত্রই যে রূপকথা শুনতে ভালবাসে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কারণ কাহিনীর এই কল্পনার মধ্যে শিশু লাভ করে চিত্তবিনোদনের আনন্দ; তার হৃদয়াবেগ লাভ করে মুক্তি, কল্পনা হয়ে ওঠে সক্রিয়। শুধু কি তাই? শিশুদের এই কল্পনাশক্তি সংকুচিত হলে তার ভাবাবেগের পথ এমন-ভাবে রুদ্ধ হয়ে যায় যে, তাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেখা দেয় রসানুভূতির দৈন্য। তাই একজন শিশু-বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, রূপকথার জগৎ থেকে শিশুদের নির্বাসিত করার পরিণাম হচ্ছে, এক কথায় তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের মাধুর্য হরণ করা। কারণ কল্পনার উৎস হ'তে যে রসবোধ উৎসারিত হয়ে আসে, তার ফলেই জীবনে সাহিত্য এবং শিল্পের মাধুর্য আর সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা অনেকগুণে বেড়ে যায়। এমন কি নানা ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও প্রাণধারণের গ্লানিকে সুধা ক্ষরণের খনি করে তোলে। তাই তিনি বলেছেন যে,… …to rob the child of good fairy stories is to take away something which makes all literature more pleasurable, all art more full of meaning and all life more full of fancy. And fancy is one of the recreation of life most worthwhile.

কাজেই শিশুর আগ্রহ এবং চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে রূপকথার ভাণ্ডার থেকে এমন গল্প নির্বাচন করতে হবে, যা শিশুদের চিরন্তন প্রয়োজন মেটাবে।

কিন্তু রূপকথার গল্প কি নিছক কল্পনার গল্পই হবে? না, বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার যোগ রাখতে হবে। কাজেই ছোটদের জন্যে এমন সব গল্প নির্বাচন

করতে হবে—যার মধ্যে কল্পনার অঞ্জন থাকলেও—প্রতিদিনের কাজের সঙ্গে থাকবে তার যোগাযোগ। কারণ শিশুর অভিজ্ঞতা আর ভালবাসার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ; কাজেই সেই পরিচিত বস্তুর মাধ্যমেই তাকে পরিচিত করাতে হবে অজানার সঙ্গে। তাহলে তার আত্মবিশ্বাস জন্মাবে। কাজেই তার চেনা পরিবেশ, ঘরবাড়ীর লোকজন, খাদ্যপরিচ্ছদ, চেনা বিড়াল কুকুর, বাগান, বাড়ীর নিকটের ঝর্ণা, পথঘাট শিশু-কাহিনীর অপরিহার্য বিষয়বস্তু। গল্পের মধ্যে শিশু এ-গুলিকে তার একান্ত নিজের বলে মনে করে।

এ ছাড়া গল্পের মধ্যে থাকবে আরও কয়েকটি দিক। যেমন (ক) হৃদয়-গ্রাহী বিস্ময়ের কাহিনী, যথা—'তিন ভল্লুকের গল্প', (খ) ঘটনা-বহুল, ছন্দময় ও পুনরাবৃত্তির গল্প, যথা—'নাকের বদলে নরুণ পেলাম' অথবা 'সাত ভাই চম্পা জাগ রে, কেন বোন পারুল ডাক রে, প্রভৃতি গল্প, (গ) অনুভূতির গল্প—শিশুর নিত্য অভিজ্ঞতার মধ্যে যে উপলব্ধি রয়েছে—যেমন খাওয়া-দাওয়া, পরিচ্ছদ আর ফুল প্রভৃতির গল্প…এই শেষোক্ত গল্পগুলি কেমন হবে, সে সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, এই গল্পগুলিকে তীব্র অনুভূতিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে। অর্থাৎ এই গল্পের মধ্যে থাকবে একটা strong sense appeal.

॥ এডভেঞ্চার, যাদু ও রোমাঞ্চকর কাহিনী ॥ (ছ' সাত বছরের উর্ধ্বের শিশুদের জন্য)

বিস্ময়ের সুর শিশুকে মুগ্ধ করে। রূপকথার অনেক গল্পের মধ্যে সে খুঁজে পায় এই সুরটিকে। 'দুই চক্ষুর' গল্প 'দুঃসাহসিক রাজপুত্রের কথা' প্রভৃতি পরম বিস্ময়ের কাহিনী শিশুদের ভাল লাগে। অথবা ইংরাজী গল্পের সেই কথাগুলিও 'Little kid, I wish to eat' শিশুদের আনন্দ দেয়।

এ ছাড়া হাসি গল্প, অস্বাভাবিক মানুষ এবং মজাদার বুদ্ধির কাহিনীও শিশুরা পছন্দ করে। যেমন:

(ক) হাস্যরসের গল্প—গোপাল ভাঁড়ের গল্প, 'অবাক জলপান', 'আচ্ছা ফ্যাসাদ', 'আবোল তাবোল' প্রভৃতি হাস্যরসের গল্প ও কবিতা।

(খ) জীবজন্তুর বুদ্ধি ও কৌশলের কাহিনী, যেমন—কাক ও শেয়ালের গল্প, বাঘের মামা ভোম্বল দাসের গল্প, জানোয়ারের চিড়িয়াখানা প্রভৃতি গল্প।

(গ) ক্ষুদ্র জিনিস, প্রাণী ও মানুষের গল্প—

উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, 'বাচ্চা ভালুকের গল্প', 'বামনের দেশে গ্যালিভার', 'ছাগলের ছাঁ', 'ছোট্ট টেবিল', একটি মগ' প্রভৃতি গল্প। রূপকথার গল্পের মধ্যেও অবশ্য ঐ সব উপাদান প্রচুর পাওয়া যায়; শিশুর বয়সের দিকে নজর রেখে সেগুলি নির্বাচন করতে হবে।

এই তো গেল নেহাৎ ছোট ছেলেদের গল্প নির্বাচনের বিষয়। এখন এমন কতকগুলি গল্পের বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করতে হবে, যেগুলি ঠিক শিশু-শ্রেণীর উপযুক্ত নয়; অথচ যেগুলি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী হবে। এই typical গল্পগুলি খুব ভাল না হলেও কয়েকটি বিশেষ কারণে সেগুলি একান্তভাবে নিম্ন বুনিয়াদী শ্রেণীর ছাত্রদেরই উপযুক্ত হবে।

নিম্নলিখিত কাহিনীগুলিই হবে সেই বিশেষ ধরণের গল্প। এ গল্পগুলি সাত থেকে আট বছরের ছেলেদের উপযোগী হবে—

যথা—(i) ডাইনীর গল্প:

অলৌকিক কাহিনীও শিশুরা পছন্দ করে। সম্ভব অসম্ভব সমস্ত কিছুই শিশুর কাছে সমান সত্য। কিন্তু এই ধরণের গল্প শিশুদের কাছে অবতারণা করবার আগে দেখতে হবে, শিশুর কল্পনাশক্তি জাগ্রত হয়েছে কিনা। কল্পনা বিকশিত না হলে শিশুদের মনে কোন আশ্চর্য ধারণাই রেখাপাত করতে পারে না। তাই যে শিশুর মনে কাল্পনিক মূর্তির কোন ধারণা জন্মেনি, তার কাছে ডাইনীর গল্প যেমন ভয়াবহ, তেমনি অপরিচিত। যেমন, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ অথবা ডাইনী বুড়ির গল্প।

(ii) ড্রাগনের (পক্ষবিশিষ্ট সর্পের) গল্প:

এগুলি ভয়াবহ অথচ রোমাঞ্চকর কাহিনী। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের শিশুদের কাছে—এই ধরণের গল্প থ্রিলের যথেষ্ট মূল্য আছে। যেমন রক্তমুখী

ড্রাগনের বিরুদ্ধে রাজপুত্রের বীরত্বের কথা শিশু-কল্পনাকে বীরত্বগর্বে আলোড়িত করে। গ্রীক-শিশু-সাহিত্যে এই গল্প অপ্রতুল নয়।

(iii) অতিমানব বা দৈত্যের গল্প :

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কল্পনা যতই দানা বেঁধে উঠতে আরম্ভ করে, ততই অতিমানব বা দৈত্য-দানবের কথা শিশুদের মনে উদ্দীপনার মশাল জ্বেলে দেয়। তাই একটা বয়সে শিশুরা এই ধরণের গল্পে যথেষ্ট আনন্দ পায়। গ্রীক সাহিত্য এই ধরণের গল্পে পূর্ণ—যেমন একচক্ষু পলিফেমাসের গল্প, ইউলিসিস্-এর গল্প অথবা ইংরাজী সাহিত্যের দৈত্যঘাতক জ্যাকের কথা উল্লেখযোগ্য।

(iv) রূপান্তরের কাহিনী (Transformation) :

বেশ পরিবর্তন অথবা সম্পূর্ণ রূপান্তরের কাহিনী ছোটদের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। মানুষ হঠাৎ বাঘে পরিবর্তিত হবে কিংবা ইঁদুর বাঘ হয়ে উঠবে,—এ দৃশ্য খুব ছোট শিশুরা সহ্য করতে পারে না; তারা এই অভাবনীয় রূপান্তরে ভয় পায়। কারণ, They lose their feeling of security, কাজেই ঐ ধরণের গল্প অতি ছোট ছেলেদের উপযুক্ত না হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী হবে।

॥ আশ্চর্য জীবজন্তুর কাহিনী ॥

আশ্চর্য জীবজন্তুর গল্পও শিশুরা ভালবাসে; অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেদের কাছে এই ধরণের গল্পের আকর্ষণ বড় কম নয়। Tom Tit Tot ঐ ধরণের গল্পের একটি চমৎকার উদাহরণ—হাস্যরসে পরিপূর্ণ অভিনব গল্পই ৭।৮ বছরের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত।

॥ দুঃখের গল্প ॥

দুঃখের কাহিনী ছেলেদের কাছে বলাটা ঠিক নয়। ছোট ছেলেরা দুঃখে শোকে সহজেই অভিভূত হয়; কাজেই দুঃখের গল্প তাদের কাছে বলা উচিত

নয়। কারণ The child of seven or eight has more pose and less impressionability. এইজন্য খামাখা দুঃখের অবতারণা করে, তাদের দুঃখের বোঝা বাড়ানোটা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

॥ খুব বড় গল্প ॥

নিতান্ত ছোট ছেলেরা বেশী কথা মনে রাখতে পারে না। ঘটনা দীর্ঘ হলে চিত্রাংশটুকুও শিশুদের মন থেকে মুছে যায়। কাজেই বড়দের কাছেই বড় গল্প বলা উচিত। বড় গল্প ছোটদের কাছে বলতে হলে, তাকে ছোট করে নিতে হয়; তা না হলে গল্প বলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এ্যাণ্ডারসনের 'কুৎসিত হাঁসের কথা' অথবা 'পুষি ও বুট জুতা' কিংবা 'সাদা বিড়ালের গল্প'—বড় গল্পের পর্যায়ভুক্ত।

॥ জটিল ঘটনা বা মিথ্যা কাহিনী ॥

শিশুদের গল্প—তা সে যে বয়সেরই জন্য হোক না কেন—কখনই খুব জটিল হওয়া উচিত নয়। কাজেই খুব কঠিন ও জটিল ঘটনা শিশু বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গল্পের পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। শেষ কথা এই যে, ছেলেদের কাছে গল্প বলতে হলে কি ধরণের কাহিনী নির্বাচন করতে হবে? তার উত্তরে সি. এইচ. নাউলিম কিন্তু চমৎকার সমাধানের উপায় বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, Choose a story filled with connected action vitalised by conversation expressed in familiar terms and told with a definite purpose. গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে চূড়ান্ত কথা আর কিছু নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

কাজের মাধ্যমে গণিত শিক্ষা

বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা কাজ। যে-কোন হাতের কাজকে অবলম্বন করেই হাতে কলমে আরম্ভ হবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা। কাজের আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে এমন সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে হবে যে, শিশু বুঝতেই পারবে না যে, পরোক্ষভাবে সে শিক্ষা লাভ করছে। খেলাধুলার প্রতি যেমন শিশুর স্বাভাবিক প্রীতি, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারটাকেও শিশুর কাছে তেমনি লোভনীয়, আকর্ষণের বস্তু করে তুলতে হবে; তবেই শিক্ষার প্রতি শিশুর আকর্ষণ জন্মাবে। তা করতে হলেই বেছে বেছে শিশুকে দিতে হবে এমন কাজ, যা হিসাব নিকাশ করে মাথা খাটিয়ে করতে হয়। এমনি করে ভেবেচিন্তে হিসাব করে কাজ করতে করতেই বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে শিশুর একটা নিজস্ব পরিমাণবোধ জন্মাবে এবং হিসাব নিকাশ সম্বন্ধেও সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে। কোন্ জিনিস করতে কি কি পরিমাণে কতখানি জিনিস লাগবে, তা জিজ্ঞাসা করলেই শিশু নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারবে। গণিত-শিক্ষা ব্যাপারে শিশুকে এতখানি সুযোগ সুবিধা দিতে হলে আমদানী করতে হবে প্রজেক্ট পরিকল্পনার। কারণ যে কোন প্রজেক্ট কাজের মাধ্যমেই লিখন, পঠন, সাহিত্য, অঙ্ক সমস্ত কিছুই বেশ ভালভাবে শেখানো যায়। আমরা এখন গণিত-শিক্ষার বিষয় নিয়েই আলোচনা করবো।

প্রথমেই ধরা যাক, টাকা, আনা পয়সার হিসাবের কথা। অনেক উপায়েই সাত আট বৎসরের শিশুদের টাকা আনা পয়সার হিসাব শেখানো যেতে পারে; আর শিক্ষণপদ্ধতিও হয় তো অসংখ্য হতে পারে, কিন্তু তাদের যোগ থাকা চাই বাস্তব জীবনের সঙ্গে; নয় তো সে শেখা হয়তো সত্যিকার শেখাই হবে না। কারণ মন থেকে শিশু তা গ্রহণ করতে পারবে না। ছোট শিশুটি যখন বয়স্কদের সঙ্গে দোকানে যায়, তখন সে অবাক হয়ে দেখে কী আশ্চর্য জিনিস: দোকানদার পয়সার বদলে কত কি ভাল ভাল জিনিস দিয়ে দিচ্ছে।

এতেই তার আকর্ষণ বাড়ে পয়সার উপর, পয়সার শক্তির উপর জন্মে বিশ্বাস। তাই পয়সার জ্ঞান ছেলেদের দিতে হলে দোকান দোকান খেলার প্রবর্তন করলেই বেশ ভাল হয়। কেনাবেচার মাধ্যমে সংখ্যা গণনা বা যোগ বিয়োগ শেখালেই শিশুশিক্ষা নিশ্চয় ফলপ্রসূ হবে। হিসাবনিকাশ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা জন্মাবে শিশুর, আর সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান হবে চিরস্থায়ী। নীচে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

ডাকঘর খেলা : ডাকঘরের প্রজেক্ট অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বাংলা দেশের সর্বত্রই চালু করা সম্ভবপর নয়। কারণ বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, এ খেলাটাকে টাকা আনা পয়সার হিসাব শেখানোর জন্য ব্যবহার করা চলে সেখানেই, যেখানকার ছেলেরা চিঠিপত্র সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল, ও চিঠির অর্থ বোঝে। কিন্তু সুন্দরবনের জনহীন অঞ্চলে অথবা অশিক্ষিত সাঁওতাল পল্লীতে এ ব্যবস্থা একেবারে অচল। তবে যেখানে সভ্যতার আলো কিছুটা প্রবেশ করেছে, সেখানে অবশ্য এ পদ্ধতিতেই টাকা আনা পয়সার হিসাব শেখানো যেতে পারে।

ডাকঘরের জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন, তা ছেলেরাই সংগ্রহ করে প্রস্তুত করবে। তারপর একজন হবে পোষ্টমাষ্টার ; তার কাছে থাকবে কতকগুলি খাম পোষ্টকার্ড—একজন এসে চাইল দু আনার খাম দাও, দু আনার খাম সে পেল ;পরিবর্তে দিল দু' আনা। তার কাছে যদি সিকি বা আধুলি থাকে, তা সে ভাঙ্গিয়ে নিল। পোষ্টমাষ্টার দু আনা নিল, খুচরো দিল ; কাজের শেষে বিক্রির হিসাব লিখে রাখালো। এই উপায়ে টাকা আনা পয়সার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় হবে। অনেক শিশুরই সিকির বেশী ধারণা থাকে না। আমাদের এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে। পোষ্ট অফিসকে এখানে একটি দোকান ধরা হয়েছে। পোষ্ট অফিস ছাড়া মিষ্টির দোকান, কাপড়ের দোকান, বা অন্য যে কোন দোকান হতে পারে। ছবির সাহায্যেও গণনা শেখানো যেতে পারে। কতকগুলি কার্ডে একটি, দুটি, তিনটি করে অনেকগুলি পাখী

বা মানুষের বা জীবজন্তুর ছবি-এঁকে ছেলেদের কাছে বিলি করে দিতে হবে; পরে একজন ছেলে ঐ কার্ডগুলি সংগ্রহ করে এক দুই করে গুণে বলবে কতগুলো কার্ড আছে। ছেলেটি ঠিক বলতে না পারলে, অন্য একটি ছেলেকে গুণতে দিতে হবে। ছেলেটি গণনার সময় জোরে হেঁকে হেঁকে এক, দুই, তিন করে মেঝের উপর রেখে গুণবে। গণনা নির্ভুল হলেও পালাক্রমে অন্য ছেলেদের গণনার সুযোগ দিতে হবে। কখনও বা বোর্ডে তালগাছের ছবি এঁকে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, কটি তালগাছের ছবি আছে? ছেলেরা গণনা করে হয়তো উত্তর দেবে, তিনটি। তখন আরও দুটি তালগাছ এঁকে অন্য একটি ছেলেকে গুণতে দিতে হবে। এই ভাবে ছেলেদের হাতে লাট্টু বা গুলি দিয়েও গণনা শেখানো যেতে পারে। ১ থেকে ১০ বা তার উর্ধ্ব সংখ্যা সম্বন্ধে শিশুর স্পষ্ট ধারণা জন্মালে, তখন তাকে বিয়োগের ধারণা দিতে হবে।

বিদ্যালয় আরম্ভ হওয়ার সময় যখন ছেলেরা সমবেত হবে, তখন একজনকে ডেকে বলতে হবে আজ কজন এসেছে, গুণে দেখ ত। তখন সে ছেলেটিকে অন্য ছেলেদের গায়ে হাত দিয়ে এক, দুই, তিন করে গুণতে শেখালে, বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাস প্রজেক্ট ঃ প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসারে 'বাস' খেলার আমদানী করে আমরা শিশুদের মনে টাকা আনা পয়সার সহজেই ধারণা দিতে পেরেছি বলে মনে হয়। ইতিপূর্বে পয়সা সিকি দু আনির উর্ধ্বে তাদের ধারণা ছিল না। অনেকে আনি দুআনির পার্থক্যও ঠিক বুঝত না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঠের বাস তৈরী হল, রাস্তা করা হল। ছেলেরাই সানন্দে সমস্ত কাজ করল। বনগাঁ থেকে কলকাতা পর্যন্ত বাস চলবে; একজন কন্‌ডাক্‌টার সাজলো, তার থলিতে দেওয়া হলো অনেকগুলি পুরাতন ট্রাম বাসের টিকিট, কার্ড বোর্ডে লেখা স্টেশনের নাম ও আনি দু'আনি সিকির ছবি আঁকা অনেকগুলি মুদ্রার নমুনা। বাসচালক যখন বাসের দড়িতে টান

দিল, তখন ছেলেদের সে কি আনন্দ! ছেলে যাত্রীর দল টিকিট কেনার জন্য চেঁচামেচি শুরু করে দিল; কনডাকটার তাদের জিজ্ঞাসা করে টিকিট দিতে আরম্ভ করল, কোথায় যাবে? কেউ বল্লে, বনগাঁ, কেউ বল্লে, হাবড়া, কেই বল্লে, দত্তপুকুর। দূরত্ব অনুসারে ভাড়া বাড়ে, এ ধারণা তাদের আগেই দেওয়া হয়েছিল এবং বলেই দেওয়া হ'য়েছিল,—কোথাকার টিকিটের কত ভাড়া, সেই অনুসারে কনডাক্‌টর টিকিট বিলি করল; দত্তপুকুরের ভাড়া দেবার সময় ছেলেটি ভুল করল। যাত্রী কনডাকটারকে চার আনা দিয়েছিল;—তিন আনা পয়সা টিকিটের দাম, বাকি এক আনা সে ফেরৎ দেয়নি। তাকে একথা বলতেই সে ভুল বুঝতে পারল, এবং শিখতে পারল যে চার আনা তিন আনার চেয়ে বেশী পয়সা। খেলা শেষ হলে ছেলেটি টিকিট ও পয়সা গুণে হিসাব করল—কত টিকিট ও কত টাকা বা পয়সা তার কাছে আছে। তারপর তাকে মেঝের উপর টিকিটের সংখ্যা ও টাকার হিসাব লিখতে বলা হল। টিকিটের সংখ্যা বা টাকার হিসাব সে লিখতে পারল না। মেঝের উপর লিখে দিলাম, সে দেখে দেখে অনেক কষ্টে লিখল। এর পর বড় একটা কার্ড বোর্ডে আনি দুআনির ছবি আটকে তার নীচে আনি দুআনি লিখে দিয়ে তাদের যখন জিজ্ঞাসা করলাম, অনেকেই বলতে পারলো, কোনটা কি। সপ্তাহ শেষে একটি ছেলের হাতে সত্যিকারের টাকা দিয়ে নিকটের একটি দোকান থেকে দু গজ ছিট কাপড় কিনে আনতে দিলাম। বলে দিলাম, দুগজ কাপড়ের দাম চৌদ্দ আনা লাগবে। কয় আনা ফেরৎ পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করতে সে বলতে পারল না। তাকে বলে দিলাম, দুআনা ফেরৎ পাওয়া যাবে। ঠিক করে গুণে আনতে পারবে তো? সে বল্লে: হ্যাঁ, পারবো। ফিরে এলে দেখি তার হাতে আটটি পয়সা। সে আমার কাছে এক দুই করে পয়সা গুণে দিয়ে বল্লে, এই নিন মাষ্টার মশাই দুআনা পয়সা। বুঝলাম, বাস প্রজেক্টের ফলে টাকা, পয়সা ও আনার ধারণা তাদের কিছুটা হয়েছে।

সুতরাং বলা চলে যে, এই রকম বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে অতি সহজেই

শিশুর মনে টাকা আনা পয়সার স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়। এ বিষয়ে এইটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, যে খেলাই আমরা শিশুদের কাছে উপস্থাপিত করি না কেন, সেগুলি যেন শিশুর চেনা পরিবেশ থেকে নেওয়া হয়; তা হলে প্রয়োগকালে তা সহজেই ফলপ্রসূ হবে—এ আমাদের বিশ্বাস।

শিশু শিক্ষায় কাজ

শিশু-শিক্ষার যতগুলি বৈজ্ঞানিক উপকরণ আছে, তার মধ্যে কাজই অন্যতম। যা হোক একটা কিছু 'করা', 'বলা', 'হওয়া', শিশুর চাই। কিছু একটা না হলে শিশুর চলে না; খেয়ালের খেলায় অকাজের কত না কাজ শিশুকে পেয়ে বসে, অনলস মুহূর্তগুলিকে সে অজস্র সঞ্চয়ে ভরিয়ে তুলতে চায়। এ হেন শিশুকে কাজ থেকে সরিয়ে আনলে নিশ্চয় তার মানসিক অতৃপ্তি বেড়ে উঠবে; কাজেই প্রয়োজনের তাগিদেই যে শিশু কাজ চায়, তাকে যেমন করেই হোক কাজের মাধ্যমেই যা কিছু শিক্ষা দিতে হবে। এইজন্য প্রয়োজনবোধে শিশুদের পাঠ্যক্রম বিভিন্ন এবং বিচিত্র হতে পারে। এক কথায় ছোটদের পাঠ্যক্রম হবে জীবন্ত (dynamic) এবং পরিবর্তনশীল। শিশুর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকেই সেগুলি গজিয়ে উঠবে এবং তাতেই তাদের প্রয়োজন মিটবেই। কেবল বিষয়বস্তু নয়, কাজের উপর জোর দিয়েই রচিত হবে শিশুর পাঠ্যসূচী। তাই বলে যে সর্বত্র একই রকমের কাজ হবে তা নয়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণী এমন কি প্রতিটি দলের চাহিদা অনুসারে কার্যসূচী পৃথক হতে পারে।

একই বিষয়ে উৎসাহী হয়ে যারা যে কাজে উদ্যোগী হবে, তাদের নিয়ে বিভিন্ন দল গঠন করা যেতে পারে। একদল যখন ডাকঘর প্রকল্প (Project) নিয়েছে, অন্য দল তখন পুতুল নাচের মহড়া দিতে পারে। কাজ শিশুরা ভালবাসে বলেই যে, কোন একটা কাজ তার উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে হবে এমন নয়, যে কাজের জন্য শিশুদের কাছ থেকে তাগিদ আসবে, সেই পরিকল্পনার কাজে শিশুদের পরিচালনা করতে হবে এই মাত্র।

তবে কাজ যাই হোক না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রতিটি কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ, কার্যক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ শক্তি, স্বাভাবিক কৌতূহল ও মনোসংযোগ উত্তরোত্তর বাড়ছে কিনা, অথবা নিজ নিজ কাজে তারা অগ্রণী হচ্ছে কিনা। কারণ সেই মনোভাবটিই শিশুশিক্ষার পক্ষে একান্ত অনুকূল। কাজের প্রতি যখন শিশুর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, আত্মনির্ভরতা বাড়ে, তখনই শিশু কিছু গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। সেই অবস্থায় যে কোন শিল্পকে কেন্দ্র করে অতি স্বাভাবিক উপায়ে শিশুদের লিখন, পঠন এবং গণিত শিক্ষা দেওয়া যায়। কারণ আগ্রহ যেখানে দুর্বার, জানার ইচ্ছা যেখানে প্রবল, শিক্ষার অনুশীলন সেখানে একান্ত স্বাভাবিক।

শিশুর আগ্রহ থেকে যে কাজের প্রেরণা আসে, সে কাজে শিশুর আনন্দ এবং কর্মতৎপরতা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। সে আনন্দের সঞ্জীবনী স্পর্শে অতি সহজেই শিশুকে 'লিখন', 'পঠন', শিক্ষা দেওয়া যায়। তাই বলে শিশুর অনুশীলনের উপর অথবা জোর দিয়ে শিশুর যোগ্যতার মান উন্নীত করতে যাওয়াটা ঠিক নয়; তবে এটাও দেখতে হবে যে, শিশুরা সাধ্যানুযায়ী কাজ না করে ফাঁকি দিচ্ছে কি না। এটুকু হলেই শিশুর পরিণাম-পরিমিতি আসবে স্বাভাবিক উপায়ে; তার কাজের হিসাব নিকাশের কোন প্রয়োজন হবে না।

নিত্য নূতন আগ্রহ সৃষ্টির দিকে জোর দিলেই চলবে না। সেই আগ্রহ থেকে শিশুর মনে যাতে জানার কৌতূহল জাগে তাও দেখতে হবে। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিশুর সদ্যোজাত অনুরাগ থেকেই তার কাজের তাগিদ আসছে কিনা। শিশুর প্রত্যেকটি চাহিদাকে, শিশুর আন্তরিক ইচ্ছাকে যাতে কোন না কোন কাজে লাগানো যায়, সেদিকে প্রত্যেক শিক্ষককে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুর কাজের মধ্যে অবশ্য হস্তশিল্পই প্রধান। আবার যে হস্তশিল্প থেকে শিশু তার খেলার উপাদান সংগ্রহ করতে পারে, সেই ধরণের কাজই শিশুরা বেশী পছন্দ করে। যাতে তার খেলা জমে উঠে, সব কিছুর মধ্যেই

শিশুর ঝোঁক সেই দিকে। যাই সে করুক না কেন, খেলার মনোভাব আছে তার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের মধ্যে।

সাংস্কৃতিক কাজেও শিশুর প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। নানা উৎসব অনুষ্ঠানের কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর সে ইচ্ছাকে অতি সহজেই রূপায়িত করে তোলা যায়। কিছু একটা করতে পেলে শিশুরা বর্তে যায়। কাজের হুজুগে, অনুষ্ঠানের আয়োজনের আনন্দে শিশুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কত না কাজ করে। বিদ্যালয়ে ঋতু উৎসবে বা সরস্বতী পূজোয় ছেলের সহযোগিতা পাওয়া যায় অকুণ্ঠভাবে। তাই অনেকে বলেছেন যে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেন শিশুর প্রাণের উৎসব, তার দেহ-মন এ কাজে মাতোয়ারা হয়ে উঠে।

কাজ করার স্পৃহাটাই সবল স্বাভাবিক শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কর্ম-ব্যস্ততা, অদম্য অস্থিরতাই তো সুস্থ শিশুর প্রাণের লক্ষণ। শিশু যতক্ষণ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, খেলছে, ছুটছে বা কিছু করছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে শিশুটির মধ্যে অসুস্থতার কোন উপসর্গই নেই। কিন্তু যেই দেখা গেল যে, খেলার সাথীদের অনুরোধ এড়িয়ে একটি শিশু বিমর্ষ হয়ে ঘরের এক কোণে চুপটি করে বসে আছে, তখনই বুঝতে হবে যে, শারীরিক অথবা মানসিক উপসর্গের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে ছেলেটির মধ্যে। নইলে হঠাৎ কাজের প্রতি তার এ ঔদাসীন্য কেন? আর খেলার সাথীদের সঙ্গই বা কেন সে পছন্দ করছে না? অনুসন্ধান করলেই টের পাওয়া যাবে যে তার সে অসহযোগিতার পিছনে রয়েছে শারীরিক অসুস্থতা বা মানসিক দুঃখ, ভয় বা আর কিছু! শিশু-মনস্তাত্ত্বিকেরা গবেষণা করে বলেছেন, কাজ করা না করার আগ্রহ থেকে বুঝা যাবে যে, ছেলেটি উপস্থিত কেমন আছে।

বাড়ীতে অবশ্য শিশুর সে ইচ্ছাটা তার খেলার প্রবৃত্তির মধ্যেই প্রকাশ পায়। কিছু করার তাগিদটাই শিশুর ক্রমবর্ধমান দেহ ও মনের ক্ষুধা। শিশু যে বেড়ে উঠেছে, সেটা তার কাজ বা খেলার সামগ্রী নির্বাচন থেকেই আবিষ্কার করা যাবে। যে শিশুর মধ্যে যত অদম্য কর্মস্পৃহা রয়েছে, যে শিশুর মাথায় যত

পরিকল্পনা ঘুরছে, ততই বুঝতে হবে সে শিশুটি কিছু শেখার জন্যে তৈরী হয়েছে। এই জন্য মনোবৈজ্ঞানিকরা শিশু-পরিকল্পনার উদ্দেশমূলক কাজগুলিকেই শিশু-শিক্ষার জপমন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন।

কাজেই শিশুর কাজের জন্য এমন উপকরণ যোগাতে হবে, যেগুলির মধ্যে শিশু লাভ করবে কর্মপ্রেরণা এবং বুদ্ধি-বিকাশের সুযোগ। কাজের সহযোগিতার মধ্যে শিশুর মনে যে দলীয় মনোভাব গড়ে উঠবে তাতে শিশুর উত্তর জীবন হয়ে উঠবে সহজ স্বাভাবিক। এইজন্য শিশুর সমস্ত কর্মপন্থা এবং আগ্রহকে এমন ভাবে পরিচালিত করতে হবে, যাতে হাতে কলমে কাজ করে শিশু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে। কাজের মাধ্যমে শিশু যে কি শিখতে পারে তার হিসাব দাখিল করতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন যে, শিশু শুধু কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক গুণার্জন করে না, সে এতে ভবিষ্যতের সহজ সুন্দর জীবনের সন্ধান পায়।

এইজন্য দেখতে হবে, যে-কাজের মধ্যে শিশুর ভবিষ্যৎ উন্নতির বিবিধ সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, সে কাজগুলি অবশ্যই সুনির্বাচিত হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, কাজের সামগ্রীগুলি এমন হবে, যা থেকে আসবে বিচিত্র কর্মোদ্দীপনা, এবং এমন প্রেরণা যা পরোক্ষভাবে শিশুর বুদ্ধি-বিকাশের সহায়তা করবে। কাজের উপকরণগুলি এমন হবে যে, যেগুলিকে শিশু তার ইচ্ছামত খেলাধূলা, শারীরিক নানা পরিকল্পনা ও সংগঠনের কাজে লাগাতে পারবে।

শিশুর অধিকাংশ কাজের মধ্যেই চারিটি দিক আছে,—যথা, শারীরিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক এবং সৃজনাত্মক বা সংগঠনী। কাজের মধ্যে অবশ্য ওগুলির তারতম্য ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিশু যখন তার খেলনা মোটর গাড়ীটা চালাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে শিশুর শারীরিক ও বৌদ্ধিক অভিপ্রায়। ক্রমে শিশু যখন মোটর চালনায় নৈপুণ্য লাভ করে, সে তখন মোটরটাকে তার নাট্যাভিনয়ের কাজে লাগাবার চেষ্টা করে, যখন কাজে হাত দেয়, তখন কিন্তু

শিশুর সে কাজটা হয়ে ওঠে সামাজিক। আবার মোটরখানার জন্য শিশু যখন গ্যারেজ তৈরী করার কাজে হাত দেয় তখন তার সংগঠনী শক্তি কাজ করে। কাজে নামবার আগে শিশু যখন মাথা খাটিয়ে গ্যারেজের জন্য রচনা করে একটা পরিকল্পনা, তখন সে তার বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

এই কাজের উপকরণগুলির প্রতি শিশুর যে কি মনোভাব, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই শিক্ষককে শিশুর চাহিদা মেটাতে হবে। কোন একটা কাজে যখন শিশুর অবসাদ আসে, বহু সাধের রং তুলি নেড়েচেড়েও সে যখন আর আনন্দ পায় না, তখন তার জন্য অন্য কোন কাজের উপাদান যোগাতে হবে।

শিশুর সংগঠনী শক্তি যতই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, শিশু ততই সামাজিক হয়ে ওঠে। একা কিছু না করে দলগত ভাবে করতে করতে শিশুর আচার আচরণ আপনা থেকেই পরিমার্জিত হয়ে ওঠে, সাথীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে শিশু সামাজিক হয়ে ওঠে। এইজন্য একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন, বইয়ের বুলি আউড়ে শিশুদের সামাজিক শিক্ষা দিয়ে কোন লাভ নেই, সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে তাকে সামাজিক করে তোলো।

কাজের মধ্য দিয়েই শিশুর মনে পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্যবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে। যে ধরণের কাজই হোক না কেন, তার মধ্য দিয়ে নিজের মনে যাতে গোছালো মনোভাব জাগে, সে যাতে নিয়মনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে, সেদিকে শিক্ষককে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। শিশু যাতে কাজের শেষে জিনিস পত্তরগুলো এলোমেলো ভাবে ফেলে না যায়, কোন নির্দিষ্ট স্থানে জিনিসগুলো ভাল ভাবে সে গুছিয়ে রাখে, সেদিকে শিক্ষক মহাশয় অবশ্যই নজর রাখবেন। কাদামাটি নিয়ে কাজ করতে করতে হাত ময়লা হলে, ঘর নোংরা করলে, কাজের শেষে শিশুরা যে শুধু নিজ নিজ হাত ধুয়েই নিষ্কৃতি পেতে পারে তা' নয়, তাদের দিয়ে শ্রেণী-কক্ষটিও পরিষ্কার করিয়ে নিতে হবে। এই ধরণের কর্তব্য সম্বন্ধে একাধিকবার শিশুদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে কাজগুলো করিয়ে নিতে পারলে, একদিন তা তাদের সুঅভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। সমস্ত কিছুই

যাতে তারা সুচারুভাবে করতে শেখে, সে দিকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখতে হবে। ছবি আঁকার পর ভাল ভাবে তুলি ধুয়ে ছেলেরা রং তুলিগুলো যথাস্থানে রাখছে কিনা দেখতে হবে। যে জিনিসটি যেখান থেকে এনেছে, সেগুলি যথাযথ ভাবে রেখে দেওয়া ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজগুলিকে শিশুর অভ্যাসে দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে ভবিষ্যৎ জীবনে তার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হবে না।

এখানেই শিক্ষকের কর্তব্য শেষ হবে না। বাড়ীতে শিশুদের যে কি অভ্যাস গড়ে উঠেছে, পর্যবেক্ষণ এবং জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা শিশুদের সে আচরণগুলি আবিষ্কার করতে হবে। একবার শিশুর অন্তর্নিহিত মনোভাবটি টের পেলে শিক্ষক মহাশয় সেগুলিকে শিশুর জীবন-নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগাতে পারবেন। তার ভাল আচরণগুলি উৎসাহ দিয়ে বাড়িয়ে তুলতে হবে; আর যেগুলি তার ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়, সেগুলিকে পরিমার্জিত করে তুলতে হবে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, এই ভাল মন্দের মাঝে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শিশুর ভবিষ্যৎ; কাজেই কোনরূপে তার সেই স্বাভাবিক বিকাশটুকু ক্ষুণ্ণ হলে শিশুর ভাবী জীবন মাটি হয়ে যেতে পারে।

শিশু মাত্রই এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে, তার প্রথম বিদ্যালয়-জীবনের অভিজ্ঞতার সব চেয়ে বড় সমস্যা যে, কেমন করে সে তার শিশু সমাজের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে। কাজের মধ্য দিয়েই তার সে অসুবিধাকে সহজ স্বাভাবিক উপায়ে দূর করা যায়। পালাক্রমে নিজ নিজ কাজ করতে করতে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক শিশুও বহির্মুখী হয়ে ওঠে। আপনা থেকেই তার স্বার্থপরতা কোথায় দূর হয়ে যায়। কাজের আনন্দে মশগুল হয়ে শিশু আত্ম-পরের ভেদাভেদটুকু ভুলে যায়। তা হলেও কোন অসামাজিক আচরণ যাতে শিশুর অভ্যাসে না দাঁড়ায় সেদিকে শিক্ষক মহাশয়ের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এবংবিধ বৈজ্ঞানিক কারণের জন্যই মনস্তাত্ত্বিকরা কাজকেই শিশু-শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে সুপারিশ করেছেন, এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাই শিশু-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা রূপে জগতে স্বীকৃত হয়েছে।
